উপহার

যাঁহার করে

"গৃহস্থ-জীবন" প্রথমভাগ

অর্পিত হইয়াছিল,

সেই স্বদেশবৎসলা

শ্রীমতি মহারাণী স্বর্ণময়ী

মহোদয়ার

সুকোমল করকমলে

"গৃহস্থ-জীবন" দ্বিতীয় ভাগ

সাদরে অর্পিত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

"গৃহস্থ-জীবন" সাধারনের যে এত আদরের সামগ্রী হইবে একথা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। যদিও আমাদের মনে এরূপ গ্রন্থের আবশ্যকীয়তা অনুভূত হইয়াছিল, কিন্তু পাঠকদিগের যে ইহার প্রকৃত অভাব ছিল তাহা জানিতাম না। এজন্য প্রথম বার মুদ্রন কালে কেবল মাত্র একসহস্র মুদ্রিত করি। সৌভাগ্যের বিষয় একমাস মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যক হয়। গত পৌষমাসে "গৃহস্থ-জীবনের" প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। আজি আষাঢ় মাস, এই ছয় মাস মধ্যে প্রথম খণ্ডের পাঁচ সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে। আমাদের দেখা দেখি অনেকে ইহার অনুকরণে নানা প্রকার নাম দিয়া নানা পুস্তক বাহির করিলেন, কিন্তু আসলের নিকট নকলের আদর অতি অল্পই হইয়া থাকে। সাধারণ পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞাপনের ছটায় ভুলিয়া নকল ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারই ঠকিয়াছেন সন্দেহ নাই, কেননা আমার স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, "গৃহস্থ জীবনে" যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অসারতা পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ নহে। দুই চারি পাতার মধ্যে কোন বিষয় শেষ করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সেই বিষয়ের অস্তিত্ব সপ্রমান করিবার উদ্দেশে ইহাতে কোন বিষয় স্থান পায় নাই। এজন্য রাশি রাশি নকল বাহির হইলেও আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সুবিজ্ঞ এবং প্রকৃত গুণাগ্রহী পাঠকদিগের নিকট "গৃহস্থ-জীবনের" আদর

কমিবে না। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা "গৃহস্থ-জীবনের" দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছি। প্রথম খণ্ডে গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয় নাই, সেই গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া "গৃহস্থ-জীবনকে" পূর্ণাবয়ব করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পুস্তকের আকার বৃদ্ধির জন্য অসার ও অনাবশ্যক বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। অথবা কোন বিষয় ভিন্ন নামে দুই বার লিখিত হয় নাই।

এক্ষণে ভরসা করি "গৃহস্থ-জীবন" প্রথমভাগের গ্রাহকগণ এবং অপর সাধারণ পাঠকগণ দ্বিতীয়ভাগ খানিকে পূর্ব্ববৎ আদরের চক্ষে দেখিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
১৫ই আষাঢ় ১২৯৪।

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

গ্রন্থকারের উক্তি।

"গৃহস্থ-জীবন" প্রথমভাগের ন্যায় "গৃহস্থ-জীবন" দ্বিতীয় ভাগেরও সমস্ত স্বত্ব কলিকাতা, ১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদ কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিলাম। আমি বা আমার উত্তরাধিকারী কেহ কখন ইহাতে কোন প্রকার দাবী করিতে পারিবে না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য।

ভাঙ্গামোড়া।
১৪ ই আষাঢ় ১২৯৪ বঙ্গাব্দ। } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সূচীপত্র।

গৃহস্থ-জীবন।



দ্বিতীয় ভাগ

সূচনা অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপন্যাসাংশ।

বিন্দুবাসিনীর দ্বিরাগমনের দিন নিকট হইল, পুত্রের মাতা যেমন পুত্রের সহিত বধূকে দেখিলে অপার আনন্দলাভ করেন, কন্যার মাতাও জামাতাকে কন্যার সহিত একত্র দেখিয়া তেমনি নয়ন সার্থক জ্ঞান করিয়া থাকেন। জননীদিগের এই ইচ্ছাটী স্বাভাবিকী এবং যার পর নাই বলবতী। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যা লাভ করা যায় এবং কন্যার বিবাহ দিয়া পুত্র লাভ হইয়া থাকে। বাস্তবিক শ্বশ্রূদিগের জামাতা এবং পুত্র-বধূর প্রতি অপত্যবৎ স্নেহ অতি প্রশংসনীয়। তাহা না হইলে

সংসার সুখের হইতে পারে না। যাঁহারা এরূপ শ্বশ্রূর প্রতি অসদাচরণ করেন তাঁহারা অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন। বিন্দুবাসিনীর মাতার ইচ্ছা হইল যে জামাতা হেমচন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিয়া বিন্দুবাসিনীকে লইয়া যান। জামাতা না আসিলে কন্যাকে পাঠইবেন না এমন জেদ করিয়া বিন্দুবাসিনীর পিতা বৈবাহিককে লিখিয়া পাঠাইলেন "বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের ইচ্ছা জামাই বাবু একবার এবাটীতে না আসিলে তাহারা অতিশয় দুঃখিত হইবে, অতএব যাহাতে তাঁহার আসা হয় আপনি সে বিষয়ে মনযোগী হইবেন।"

হেমচন্দ্রের পিতা সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই সময়ে হেমচন্দ্র বিদায় লইয়া বাড়ীতে আসিয়া ছিলেন, শ্বশুরলায়ে আসিতে তাঁহার কোন আপত্তি হইল না। নির্দ্দিষ্টদিনে বিন্দুবাসিনীর মাতা জামাতার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া স্বর্গহাতে পাইলেন, তাঁহার মন আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি সকল কাজ ভুলিয়া জামাতার আহারের আয়োজনে ব্যস্ত সমস্তা হইলেন, আহারের যত আয়োজন করিতেছেন কিছুতেই তাঁহার মন উঠিতেছে না যেন আরও কিছু হইলে হয়।

আকাঙ্ক্ষার এমনি আধিক্য যেন তিনি উচিতাধিক আয়োজনেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। একা জামাই কিন্তু আড়ম্বর বহুলোকের ন্যায় হইতেছে; বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে দুই চারি দিন বড় ধুমধাম চলিল। তাহার পরে ধার্য্য দিনে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী অন্ধকার করিয়া আপানার সহধর্ম্মিনীকে লইয়া গেলেন।

এস্থলে পাঠক পাঠিকাদিগকে হেমচন্দ্রের বাসভূমি ও সংসার-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

হুগলী জেলার গঙ্গাতীরস্থ কোন গণ্ডগ্রামে হেমচন্দ্রের নিবাস; আমাদের গণ্ডগ্রামে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, হেমচন্দ্রের বাসগ্রামে তাহার কিছুরই অভাব ছিলনা। ফলকথা একটী বাজার, স্কুল, পোষ্টাপিশ, মিউনিসিপালিটী, হিতৈষিনী সভা, পুলিশ এবং গ্রামের উপর দিয়া রেলপথ থাকায় একটী রেলওয়েষ্টেশন ছিল। গঙ্গার অনতিদূরে একটী সদর রাস্তার ধারে হেমচন্দ্রের বাটী, তাহার সম্মুখে ছোট ঢেউখেলান প্রাচীরের ভিতর নানা জাতীয় ফুলের বাগান, বাগানের উপর দিয়া সুরকিফেলা একটী রাস্তা, সেটী যেখানে শেষ হইয়াছে সেই খানেই বাড়ীর সদর দরজা; তাহার বামে দক্ষিণে দুইটী পাকা একতোলা কুটরী বৈঠকখানার কাজ করে, ভিতরে একটী ছোট তিন ফুকুরে দালান। তাহার একপাশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পথ। বাড়ীর ভিতরে দুইটী দুতোলা কুটরী। প্রাঙ্গনের একপার্শ্বে পাক ও অপর পার্শ্বে গোশালা; বাড়ীটী ছোট খাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খিড়কীতে চারিদিকে প্রাচীরে বেষ্টন করা একটী পুষ্করিণী, তাহার চারিধারে অনেক ফলকর গাছ। বাড়ী দেখিলে তাহার কর্ত্তাকে আড়ম্বরশূন্য সৌখিন লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। হেমচন্দ্রের পিতা রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বাড়ী ঘর দ্বার পুষ্করণী বাগান সমস্তই স্বকৃত। মাতামহাশ্রয়ে এই গ্রামে তাঁহার বাস, মাতামহ কেবল মাত্র ভদ্রাসন ও দুই চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তর দিয়া দৌহিত্রকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাঁহার পর মুখো-

পাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার কোন গবর্ণমেণ্ট আপিশে চাকরী করিয়া এক্ষণে পেন্সন পাইতেছেন। চাকরীতেই তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী। অপত্যের মধ্যে হেমচন্দ্র ও আর একটী কন্যা—কন্যার নাম সুরবালা। সুরবালা সধবা, বাপ মার বড় আদরের, এজন্য তিনি প্রায় পিত্রালয়েই অবস্থিতি করেন। তাঁহার শ্বশুর শ্বশ্রূ কেহই নাই, এজন্য শ্বশুরালয়ে ততটা নির্ভর নাই। স্বামী কলিকাতায় চাকরী করেন, প্রতি শনিবারে যাতায়াত করিয়া থাকেন; কখন বা তিনি ডেলী প্যাসেঞ্জার হইয়া শ্বশুরালয় হইতেই আপিশ করেন। রামেশ্বরের ক্ষুদ্র পরিবারটী বেশ সুখী।

বিন্দুবাসিনী শ্বশুরালয়ে আসিয়া তাঁহার শ্বশুরের সুখের সংসারের অংশভাগিনী হইলেন। সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুশিক্ষিতা কন্যা অল্পদিনেই সুধীর সচ্চরিত্রা বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার শ্বশুর শ্বশ্রূ তাঁহাকে যার পর নাই ভাল বাসিতে লাগিলেন। সুখের সংসারে সুখের মিলন আরও সুখের হয়। অনেক ধনবান গৃহস্থ রামেশ্বরের প্রতিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সংসারে এরূপ শান্তি ছিলনা, এজন্য তাঁহারা যখনই সংসারিক জ্বালায় অস্থির হইতেন তখনই রামেশ্বরের সংসারকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন।

রামেশ্বর ইংরাজী জানিলেও সেকেলে ধরণের লোক, হিন্দুধর্ম্মে বিলক্ষণ আস্থাবান এবং পুত্রটীকেও তদ্রূপে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সদাচার সদনুষ্ঠান তাঁহার সংসারে সকলই ছিল। বারব্রত, যাগযজ্ঞ, পূজার্চ্চনা যে দিনের যা

সকলই তাঁহার বাড়ীতে হইত। এজন্য তাঁহার ধন অপেক্ষা গ্রামমধ্যে মান সম্ভ্রম অনেক অধিক ছিল।

গোপালন অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোপালন।

হেমচন্দ্রের পিতা চাকরী করিয়া মাসে মাসে যে টাকা পাইতেন, পরিবারের ভরণপোষণ বাদে সেই টাকা সঞ্চিত হইবার সম্ভবনা ছিল না। শেষাবস্থায় তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে দশটাকা সংস্থান হইত বটে, কিন্তু যখন তিনি চাকরী করিতে আরম্ভ করেন তখন বেতন অতি অল্পই ছিল; কিন্তু এঅবস্থাতেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় অর্থ বাঁচাইতেন, তিনি বিলক্ষণ মিতব্যায়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁহার প্রতিবাসী অনেকেই তাঁহার তুল্য বেতন পাইতেন, তাঁহাদের "হাহা" ঘুচিত না, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারের সুপ্রতুলতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। তিনি এক মুহূর্ত্ত কাজ ছাড়া থাকিতেন না, প্রাতঃকালে উঠিতেন, মুখ হাত ধুইয়া গবাদি পশুগুলির সেবা করিতেন, বাগানের গাছ পালা গুলি মালীর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, স্বয়ং তাহা-

দের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, আপিশ হইতে আসিয়া যতক্ষণ নিদ্রা না যান সংসারিক একটী না একটী কাজ করিতেন, কখন নিষ্কর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। তিনি যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া অতি অল্প আয়েও সংসারে একদিনের জন্য কোন বিষয়ের অভাব করেন নাই, সেই সেই বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিলে বোধ হয় আমাদের "গৃহস্থ-জীবনের" পাঠকগণের অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে এবং তদনুসারে চলিতে পারিলে তাঁহারা যে সংসারে নিশ্চয় সুখী ও সচ্ছন্দ থাকিতে পারিবেন সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইবার পর তাঁহার প্রথম কাজ গোরু বাছুর গুলির সেবাকরা। আমাদিগের দেশে প্রাচীন কাল হইতে সংসারের যাবতীয় গৃহপালিত মধ্যে গোরুর যে এত যত্ন কেন, ঋষিরা গোরুকে মানবের অত্যাবশ্যকীয় জানিয়া কেন যে একটী মূল্যবান সম্পত্তি জ্ঞান করিতেন, সকল অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট গোধনের কেন যে সমাদর ছিল, গাভীকে কেন যে ভগবতীর ন্যায় আরধ্য করিয়া তুলিয়া ছিলেন, সকল পাপ অপেক্ষা গোহত্যা পাপের কেন যে গুরুত্ব স্বীকার করিতেন, সে সকল কথা তিনি ভালরূপে বুঝিতেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেন। গোদুগ্ধ মনুষ্য দেহে মহা উপকারী, এজন্য আমরা তাহা পান করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করি, গোবিষ্ঠা দগ্ধ করিয়া খাদ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকি, শস্যক্ষেত্রে গোময়ের সার দিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করি, বলদ গুলিকে দিয়া ভূমি কর্ষণ করাইয়া লই, তাহাদিগকে দিয়া ভারবহণ করাই, গাড়ী টানাই, আপনারা তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথশ্রমের হাত হইতে

আপনাদের দেহ রক্ষা করি, ভাবিয়া দেখিলে গৃহস্থঘরে এমন উপকারী জীব আর নাই। কতদেশে কত রকমে যে গোরু সংসারের উপকার সাধন করে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। এরূপ পরম উপকারী জীবের সেবা শুশ্রূষা করা যে গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। এইজন্যই আমাদের দেশের ব্যবস্থাপকগণ গোরুর অপালন মহাপাপ মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে গোরুকে সুস্থ ও সবল রাখা যায় অগ্রে সেই গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের রোগ হইলে কিরূপে তাহার প্রতিকার করা যায় তাহাই বিবৃত করা যাইবে। হেমচন্দ্রের পিতা এই সকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহারই অবলম্বিত পদ্ধতিক্রমে অমরা এই গ্রন্থে গোপালন ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গোরু গৃহস্থের যত উপকারে আইসে, গোরুকে দিয়া আমরা যে সকল কাজ করাইয়া লই, গোরুর যে দুগ্ধপান করিয়া থাকি, তাহার মূল্য অবধারণ করিয়া সেই টাকার কিয়দংশও যদি আমরা তাহার বাসগৃহ ও আহারীয়ের জন্য ব্যয় করি, তাহা হইলে কোন ভাবনা থাকে না, গোরুকে বেশ সুস্থ সচ্ছন্দ রাখিতে পারি। আমাদের দেশে গোরুর ঘর যে অতি কদর্য্য অবস্থায় নির্ম্মান ও রক্ষা করা হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যদি আমাদের কোন বাসগৃহ একটু মন্দ হয় তাহা হইলে আমার বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়া থাকি "ঘরটা যেন গোহাল"। এই প্রচলিত বিদ্রূপাত্মক কথাটীতেই বুঝা যাইতেছে যে গোগৃহ হইলেই যেন তাহাতে উপযুক্ত জানালা থাকিবে না, তাহার

চাল ছাওয়া হইবে না, দেওয়াল ভাল রাখা হইবেনা, মেজেটী শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার দরকার নাই। আপনারা ভাল খাইব, ভাল পরিব, সুন্দর ঘরে থাকিব, যত উপদ্রব নিরীহ পশুর উপর। ধর্ম্ম ভাবিয়াও যদি না হউক এমনও মনে জানা উচিত যে, তাহাদিগকে সুস্থ সচ্ছন্দ রাখিলে তাহাদের হইতে অধিক কাজ পাওয়া যাইবে, এই উপকারিতার বিষয় চিন্তা করিয়াও তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া বুদ্ধিমান ও বিবেচকের কার্য্য।

উপযুক্ত পালনাভাবে আমাদের দেশের গোজাতির অতিশয় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা কৃশ ও ক্ষুদ্রকায় হইয়া মেষাদির আকার ধারণ করিতেছে। আমাদের দেশে গোরুর এরূপ দুর্দ্দশা কখন ছিলনা। ইংলণ্ডের এক একটী গাভী যেন হস্তিনী, যেমন স্থূলাকার তেমনি বলিষ্ঠা এবং দুগ্ধবতী।

কিয়দ্দিন হইল একটী ইংলণ্ডীয় মহিলা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সেই সর্ব্ব প্রথম কলিকাতার গড়ের মাঠে কতকগুলি গাভীকে চরিতে দেখিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী কোন ব্যক্তিকে আশ্চর্য্য ভাবে বলেন "এ দেশের মেষ এত বড় না জানি গোরু কেমন!" তাঁহার সঙ্গী অনেকদিন হইতে এ দেশে ছিলেন, তিনি আমাদের দেশের গোজাতির দুরবস্থা অবগত ছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন "এগুলি মেষ নহে, গোরু।" এই কথায় ইংরেজ ললনা বিশেষ দুঃখিতা হইলেন; তিনি দেশে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ছিলেন।—

"সুখান্তে দুঃখিতা গাভী
দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিতঃ

মানান্তে প্রবলা ভার্য্যা
কুলান্তে ব্রাহ্মণো রিপুঃ।”

এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন দূরদর্শী পণ্ডিতদিগের কথা মিথ্যা হইবার নহে। ভারতের যে সুখের দিন নহে তাহা এদেশের গাভীই তাহা সূচিত করিতেছে। একথার একটুকুও মিথ্যা নহে। ভারতের গোরুর অবস্থাসম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা কথিত হইল তাহাতে পাঠক কি মনে করিতে পারেন? বাস্তবিকই আমরা আমাদের পশুগুলির উপর বড়ই অত্যাচার করিয়া থাকি, পীড়ন করিয়া ক্ষুদ্রকায় বৎসগুলির মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই, তাহাদের জননীগণ যে দুগ্ধ দান করিয়া থাকে তাহাতে তাহাদেরই পর্য্যাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহারা শুষ্ক শীর্ণকায় ছাগ মেষাদির অবস্থায় অবনত হইতেছে। সে যাহা হউক এক্ষণে পশু পালন সম্বন্ধে নিম্নে যে সকল বিষয় লিখিত হইল সে গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া গো-পালন করিলে আমাদিগকে আর এ ঘোর নরক যন্ত্রণার উপযুক্ত পাপ ভোগ করিতে হইবে না।

গোয়ালঘরের মধ্যস্থানটী চারিদিক অপেক্ষা উচ্চ হওয়া আবশ্যক, কেননা গোরুরা যে মূত্র পরিত্যাগ করে তাহা জমিয়া সে স্থান সিক্ত করিতে পারে না, গড়াইয়া এক পাশে চলিয়া যায়, আর এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে সেই মূত্র ঘরের কোন স্থানে জমিয়া না থাকিতে পারে. এজন্য ঘরের মধ্যে একটী নালা ও জল নির্গমনের দ্বার রাখা কর্ত্তব্য। গোরুর গায়ে রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিতে না পারে এজন্য ঘরের চাল দিয়া যাহাতে জল না পড়ে, রৌদ্র না প্রবেশ করিতে পারে তাহার উপায়

করিতে হইবে। রাত্রিকালের শীতল বাতাস গরুর পক্ষে বড় অপকারী। গৃহমধ্যে যাহাতে সুবাতাস আইসে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে তেমনি তাহার ভিতর যাহাতে আলোক প্রবিষ্ট হইতে পায় তাহার উপায় করা চাই। গৃহমধ্যে গোময় বা গোমূত্র সঞ্চিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। ভিজা ও দুর্গন্ধময় ঘর স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টদায়ক। শীতকালে যাহাতে গোয়া-লের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিয়া গরুকে কোন মতে শীতার্ত্ত না করে এমন উপায় দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গরুকে মাঠে ছাড়িয়া দিবার যে পদ্ধতি আছে তাহা অতীব দূষণীয়। রৌদ্র বৃষ্টিতে অনাবৃত থাকিলে গরুর পীড়া জন্মিয়া থাকে। রাখালেরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় গরু সকলকে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপনারা বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া খেলা করে. বর্ষাকালেও তদ্রূপে তাহাদিগকে বৃষ্টিতে ভিজান হইয়া থাকে। কখন কখন এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে বন্যা-মগ্ন স্থানের জল শুকাইলে সেই সকল জমির উপর গরু বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহাও নিতান্ত মন্দ। বর্ষাকালে সর্ব্বত্র প্রচুর তৃণ জন্মিয়া থাকে সত্য বটে কিন্তু সকল ঘাস গরুর পক্ষে সুখাদ্য নহে। এমন অনেক প্রকার ঘাস আছে যে তাহা খাইলে গরু পীড়িত হয়। এক প্রকার ঘাস আছে তাহাতে রশুনের গন্ধ থাকে, সেই ঘাস খাইতে দিলে গরুর দুগ্ধে ও গাত্র হইতে রশুনের বিকৃত গন্ধ বাহির হয়।

গরুকে উপযুক্ত মতে খাবার দিলে ও ভাল জায়গায়, ভাল

ঘরে রাখিলে কখন তাহাদের পীড়া হয় না। একটী পূর্ণ বয়স্ক গরুর পক্ষে পাঁচ গণ্ডা বিচালি ও একসের খইল প্রচুর খাদ্য, এতদ্ব্যতীত এক ঝুড়ি ঘাস ও দুই সের ভূষি হইলেই একদিনের আব পর্য্যাপ্ত হয়। খইল অধিক খাওয়াইলে গরুর অজীর্ণ হইয়া থাকে। ভাতের মণ্ড পুষ্টিকারক ও গাভীর দুগ্ধবর্দ্ধক। গোরুর আহারীয়ের বিষয়ে যেমন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক পানীর পক্ষে তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের দেশের কেমন মন্দ পদ্ধতি যে গোরুকে প্রায়ই কদর্য্য জল পান করিতে দেওয়া হয়! তাহা বড় অন্যায়। বিশুদ্ধ জল মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেরই সমান উপকারী, ও দুর্গন্ধময় জল কাহারও পান করা ভাল নয়। রৌদ্রের সময় গোরুকে জল পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে, তাহাতে প্রায়ই সর্দ্দি-গরমি ও অপরাপর পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মকালে যখন বেলা শেষ হইবে সেই সময় জল পান করিতে দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। এই ঋতুতে সাত আটদিন অন্তর তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শীতকালে গোরুর গা ধুইয়া দেওয়া ভাল নহে। তবে যাহাতে তাহাদের গায়ে ময়লা জন্মিতে না পারে তদর্থে প্রতি দিন এক এক বার খটরা ও ব্রস দিয়া গাত্র মার্জনা করিয়া দিলে তদ্দারা সমস্ত ময়লা নষ্ট হইয়া যায়, বড় বড় লোমগুলি উঠিয়া তাহাদের গাত্র বেশ পরিষ্কার ও মসৃণ হয় এবং গায়ে যে এক প্রকার কীট জন্মে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কীট বড় পীড়াদায়ক। মাথা অপরিষ্কার রাখিলে আমাদের যেমন উকুন জন্মে, গোরুর গা পরিষ্কার না রাখিলে তাহাদেরও উক্তবিধ কীট জন্মিয়া থাকে

গাভীকে নিম্নোক্ত প্রকারে খাদ্য প্রদান করিলে তাহার দুগ্ধ অধিক হয়। কিন্তু এই সকল প্রসব হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খাইতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে "গাই গোরুর মুখে দুধ।" সেকথা কোনমতে অসত্য নহে। গাভী যত অধিক এবং উত্তম খাবার খাইতে পাইবে, সে তত অধিক দুগ্ধ দিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, যে পরিমাণে খাদ্য দেওয়া যাইবে তাহা সে উত্তমরূপ জীর্ণ করিতে পারে কিনা অগ্রে তাহা দেখিতে হইবে। গোজাতির ক্ষুধা অধিক, সহজে তাহাদের অজীর্ণ হয় না এবং তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধিক খাদ্য গ্রহণ করেনা, এটী তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান। সে যাহা হউক ক্রমে ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন অসুখ হয় না। যদি দৈবাৎ অধিক খাদ্য প্রদত্ত হয়, তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পরে পুনরায় খাইতে দেওয়া উচিত। ফলতঃ অনিচ্ছাস্বত্ত্বে তাহাদিগকে অপরিমিত খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা কোনমতে শ্রেয় নহে।

প্রসবের এক দিন পরে তেঁতুল গাছের আঠা অর্দ্ধতোলা কলাপাতার ভিতরে রাখিয়া গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

প্রসবের পাঁচদিন পর হইতে তুণ্ডুল কনিকার সহিত অলাবু সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে,কোন কারণ নাই পয়স্বিনী গাভী সময়ে সময়ে অত্যল্প দুগ্ধ দেয়, কখন কখন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে তাহার বাঁট দিয়া রক্তধারা পতিত হইয়া থাকে। যে কারণেই

হউক তাহা অবধারিত করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রতিকার এই যে, প্রসব হইবা মাত্র গাভীর একশৃঙ্গে চূণ ও অপর শৃঙ্গে কালী লাগাইয়া দিলে কোন মতে উক্তরূপ অভ্যাপাত ঘটিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বাঙ্গিক পীড়া ও তাহার চিকিৎসা।

আমাদের দেশে গবাদির যে সকল পীড়া জন্মিয়া তাহাদের জীবন নষ্ট করিতে থাকে, এক্ষণে সেই সেই রোগের প্রতিকার লিখিত হইতেছে। চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে রোগ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে গো-স্বামীরা অনায়াসেই আপনাপন জন্তুকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। এই সকল ঔষধ বিশেষরূপে পরিক্ষীত ও ফলপ্রদ।

সর্ব্বাগ্রে বসন্ত রোগের কথা বলা যাইতেছে। এই রোগ বিলক্ষণ সংক্রামক। বসন্ত ভিন্ন পার্শ্বদেশের নালি ঘা, দকদকে ঘাযুক্ত শোথ জর ও প্লীহা, এঁসো ঘা, ফুসকুসের প্রদাহ রোগও বড় সংক্রামক। এই সকল রোগ একটী গরুর হইলে তাহার ঘরে বা পালে যতগুলি গোরু থাকে সকলকেই আক্রমণ করে, এজন্য যখনই কোন গরুর এই সকলের মধ্যে কোন একটী পীড়া হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্যান্য গোরু হইতে পৃথক রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে; এই সকল ছোঁয়াটিয়া রোগে সময়ে সময়ে বহুসংখক গো নষ্ট হইয়া যায়। অতএব

একটীর রোগ হইলে যাহাতে অন্যান্য সকলকে আক্রমণ করিতে না পারে তাহার বিহিত করিতে হইবে।

এক প্রকার বিষ হইতে বসন্ত রোগের উৎপত্তি হয়, সেই বিষ যে কি প্রকারে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এ পর্য্যন্ত তাহা সুনিশ্চিত হয় নাই। সম্ভবত বায়ুর সহযোগেই এই বিষম অনিষ্ট জনক পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে। শুধু বসন্ত কেন যাবতীয় সংক্রামক রোগই বায়ুর সংশ্রবে শরীর হইতে শরীরান্তরে প্রবেশ করে। স্পর্শদোষ ঘটিলে তৎক্ষণাতই যে রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এমন নহে, সচরাচর দুই তিন দিন লাগে, কখন কখন চব্বিশ ঘণ্টায় মধ্যেই প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে। রোগ প্রকাশ হইবার সময়ে যে যে লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহা দ্বারা তিনটী অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে। যথা ঃ—

প্রথমাবস্থা—আলস্য, কম্প, গা শিহরিয়া উঠা, মুখ গরম শ্লেষ্মক ঝিল্লিতে রক্ত সংস্থান, খুস খুস করিয়া কাশি, কাণ লুটিয়া পড়া, পেট আঁটিয়া ধরা, বিষ্ঠা যেন শ্লেষ্মাতে লেপ দেওয়া, ক্ষুধা মান্দ, অধিকাংশ স্থলে পিপাসা, শরীরের মাংসপেশী সমস্ত খেঁচিয়া ধরা, পৃষ্ঠ কুব্জ হওয়া, পা চারিটী জড় হওয়া, অনিয়মিত রূপে ও ধীরে ধীরে জাবরকাটা, দাঁত কড়কড় করা, হাই তুলা, নাড়ী বেগবতী ও পৃষ্ঠে হাত দিলে অসহ্য জ্ঞান হওয়া।

দ্বিতীয়াবস্থা—মুখ, শৃঙ্গ, কান, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ কখন শীতল, কখন গরম হয়, অর্থাৎ ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত, ঘন ঘন শ্বাস, ক্ষুধামান্দ রোমন্থনে নিবৃত্তি, চক্ষে পিঁচুটী পড়া, মেরুদণ্ডের বেদনা বৃদ্ধি, কোঁকে মাথা গুজিয়া পড়িয়া থাকা, প্রবল জ্বর, পিপসাবৃদ্ধি, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট, মাাংসপেশীর

খেঁ চুনীর আধিক্য, নাড়ী ঠিক না চলা—কখন অধিক কখন অল্প, নড়ন চড়নে কষ্ট, দাঁতের মাড়ী ও গালের ঝিল্লি অতিশয় লাল বর্ণ হওয়া, জিহ্বায় কাঁটা হওয়া, পেট আঁটিয়া ধরা, বিষ্টায় শ্লেষ্মা ও রক্তের লেপ থাকা, মল ও মূত্রদ্বারের ঝিল্লি রাঙ্গা ও শুষ্ক হওয়া, মলত্যাগের সময় অধিক বেগ, কোন কোন স্থলে মল-মূত্রের দ্বার ঝুলিয়া পড়া।

তৃতীয়াবস্থা—মুখ, চোখ, নাক দিয়া অনবরত আটার মত শ্লেষ্মা বাহির হয়, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, টাকরা, মুখের নিম্নভাগ, জিহ্বা, কখন কখন নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল উঠিয়া যায়, অল্প বা অধিক পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণ ফুস্কুড়ীতে আবৃত থাকে, সম্মুখের দাঁত নড়ে। এই সময় উদরাময় জন্মে, মলের সহিত রক্ত থাকে, শেষে জলবৎ ও দুর্গন্ধময় ভেদ হয়, গোরু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, পিপাসা থাকে, কিন্তু ঢোক গিলিতে বড়ই কষ্ট হইতে থাকে, গায়ের চামড়া, শিং, কাণ, পা ও মুখ শীতল হইয়া উঠে, তখন আর উঠিবার শক্তি থাকে না, গোঁগোঁ করে, নাড়ী টের পাওয়া যায় না, পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়।

এই রোগ ২৪ ঘণ্টা হইতে ১২ কি ১৬ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে কিন্তু সচরাচর তিন হইতে নয় দিন পর্য্যন্ত থাকে।

রোগপ্রতিকার—যে বিষ হইতে এই রোগের উৎপত্তি, সেই বিষ নষ্ট না হইলে পশু কোন মতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। যদি এই রোগে গোরুর গায়ে ফুস্কুড়ী বাহির হয় তবে তাহা সুলক্ষণ জানিতে হইবে। ফুস্কুড়ী যত অধিক পরি-মাণে বাহির হয়, রোগও তত শীঘ্র আরাম হওয়ার সম্ভাবনা। ফুস্কুড়ী বাহির না হইয়া যদি রক্তামাশয়ের মত মল নির্গত হইতে

থাকে তবে তাহা কোন মতে শুভ লক্ষণ নহে। যাহাতে পশুর শরীর হইতে উপরোক্ত দূষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে তাহার বিহিত চেষ্টা করা আবশ্যক। তজ্জন্য রোগের প্রারম্ভে যে কোষ্ঠ বদ্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ হয় তাহার জন্য প্রতিদিন এক বা দুইবার তিন কাঁচ্চা হইতে ছয় কাঁচ্চা পর্যান্ত লবণ অথবা এপ্‌সম সল্ট প্রভৃতি লবণাক্ত বিরেচক প্রদান করিতে হয়। প্রতিদিন ২। ৩ বার গরম জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পিচকারীও দেওয়া গিয়া থাকে। অতিরিক্ত দাস্ত হইলে পশু দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা এজন্য কোন মতে উগ্র জোলাপ দিবেনা।

বিরেচন দ্বারা রোগোৎপাদক বিষ সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু অধিক দাস্ত হইয়া গোরুকে অবসন্ন করিলে তাহাও কোন মতে সুবিধাজনক নহে।

মল রক্ত ও শ্লেষ্মা ২৪ ঘণ্টার অধিক বাহির হইতে থাকিলে তাহা নিবারণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ দুইটীর কোনটী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চাখড়ির গুঁড়া ৩৸৹ তোলা, পলাশ গঁদ ৸৹ তোলা, আফিম ।৶৹ আনা, চিরাতার গুঁড়া ।৹ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া এক ছটাক মদের সহিত মাখিয়া একসের ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিবে। এই ঔষধ ধারক ও অম্ল-নাশক।

কর্পূর ৸৹ আনা, সোরা ৸৹ আনা, ধুতূরাবীজ ।৴৹ আনা, চিরতা ৸৹ আনা, মদ্য ২ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

সেশোক্ত ঔষধটী রোগের প্রথমাবস্থায় দেওয়া গিয়া থাকে। রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যদি ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পর্য্যন্ত পাতলা মল বাহির হইতে থাকে তবে ৵০ আনা ওজনে মাজুফলের গুঁড়া উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যতক্ষণ দাস্ত বন্ধ না হয় ১২ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

পথ্যের মধ্যে কেবল চাউল ও কলাই উত্তম রূপ সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘন মাড় খাইতে দিবে।

রোগের প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ না দাস্ত হয় ততক্ষণ জল দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দাস্ত হইতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প মাত্রায় জল দেওয়া বিধি, কিন্তু একেবারে না দেওয়াই ভাল। এসময় অতি অল্প পরিমাণে মাড় খাইতে দিবে। কেন না কখন কখন দাস্ত হইলে অত্যন্ত পিপসা হয় ও গোরু জল খাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু এঅবস্থায় জল দিলে অধিক দাস্ত হইয়া গোরুকে অধিকতর দুর্ব্বল করে এবং তাহাতেই শীঘ্র মরিয়া যায়।

রেচন বন্ধ হইলে আর ঔষধ দিতে হইবে না। তখন সাবধানে শুশ্রূষা করিতে হয়। এই অবস্থায় পথ্য কেবল মাড়, টাট্‌কা ঘাস, ও কচি কচি লতা পাতা। মাড়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণে লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগের উপশম হইলে কোন মতে শক্ত শুষ্ক ও আশাঁল দ্রব্য গোরুকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে পুনরায় অজীর্ণ রোগ অথবা বসন্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

মেষ ও ছাগলেরও বসন্ত রোগ হইতে পারে; কিন্তু শূগ্ল

পশুকে স্পর্শ করিলে গবাদির যেমন ঐ রোগ হইয়া থাকে ইহাদের তেমন হয় না। তাহাদের রোগ না হইলেও তাহাদের দ্বারা গবাদির এক পাল হইতে অন্য পালে উক্ত পীড়ার সঞ্চার হইতে পারে ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত ঔষধ গুলি বসন্ত রোগাক্রান্ত ছাগ ও মেষকেও দেওয়া গিয়া থাকে, কিন্তু ঔষধের পরিমাণ ছয়ভাগের এক ভাগ জানিতে হইবে।

এঁসো ঘা এক প্রকার সংক্রামক জ্বর। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে, পায়ে ও পার্শ্ব দেশে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। এই ফুস্কুড়ী কোন কোন পশুর মুখে, কোন পশুর পায়ে, কোন কোন পশুর প্রথমে পায়ে শেষে মুখে হইয়া থাকে।

গো, মেষ, ছাগ, শূকর ও মুরগীরও এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি এই রোগাক্রান্ত গরুর দুগ্ধ পান করিয়া মনুষ্যেরও এই রোগ হইয়া থাকে।

অধিকাংশ স্থলে সংক্রামকরূপে এই রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন আপনাহইতেও এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে বলেন গরুকে যেখানে সর্ব্বদা রাখা হয় সেই স্থানের মাটী ময়লা থাকাই ইহার প্রধান কারণ। ফলতঃ ইহা অবধারিত হইয়াছে যে, গরুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে ও অন্য পশুর সহিত চরিতে না দিলে এই রোগ জন্মিতে পারে না।

লক্ষণ—কম্প দিয়া জ্বর হয়, মুখ শিং ও পা সকল গরম হইয়া উঠে, মুখ দিয়া লাল পড়ে, পরে মুখে ও পায়ে ফুস্কুড়ী দেখা যায়। গাভীর এই রোগ হইলে পার্শ্বে ও বাঁটে ফুস্কুড়ী

হইয়া থাকে। ঐ ফুস্কুড়ী সীমের বীজের আকারে ফোস্কার মত হয়। কখন কখন নাকের ঝিল্লিতে হইতে দেখা যায়। ফুস্কুড়ী বাহির হইবার ১৮ কিম্বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুস্কুড়ী ফাটিয়া ঘা দেখা দেয়। উহা শীঘ্র ভাল না হইলে নালী হয়।

মুখের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রায়ই জিহ্বাতে ঐরূপ ফুস্কুড়ী হইয়া থাকে। কখন কখন দাঁতের গোড়ায়, টাকরায় ও গালের ভিতর হয়।

পায়ে ফুস্কুড়ি হইলে খুরের সঙ্গে যে স্থানের চর্ম্মের যোগ থাকে সেখানে ও খুরের জোড়ের মধ্যে হইয়া থাকে।

মুখের বেদনা ও জ্বর থাকাতে পশুটী খায় না ও যে পায়ে ঘা সেই পা খোঁড়াইয়া চলে।

বলদ হইলে তাহাকে যদি খাটান যায় তবে আরও কঠিনতর হইয়া উঠে। পা ফুলিয়া যায়, অনেক স্থলে খুর খসিয়া পড়ে, কখন কখন পায়ে ফোড়া হয়।

পালান ও বাঁটে ফুস্কুড়ী হইলে তাহা ফুলিয়া উঠে ও স্পর্শ করিবামাত্র বেদনা বোধ করে। বাছুর ঐ গাভীর দুগ্ধ চুসিয়া খাইলে তাহারও এই রোগ হয়।

পয়স্বিনী গাভীর এই রোগ হইলে দোহন করিবার সময় দোয়ালের হাত ফোস্কায় লাগিয়া অধিক টাটাইয়া উঠে। না দুহিলে পালান ফুলিয়া যায় ও তাহাতে দাহ জন্মে।

গোয়ালেরা রুগ্ন গরু দুহিয়া যদি ভাল করিয়া হাত না ধোয়, তবে সুস্থ গরুর পালান স্পর্শ করিলে তাহারও এই রোগ হয়।

কখন কখন ভ্রমক্রমে এই রোগ বসন্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে উদরাময় এই রোগের লক্ষণের

মধ্যে নহে। বসন্ত হইলেই উদরাময় ও রক্তামাশায় হইয়া থাকে। অধিকন্তু বসন্ত হইলে পায়ের রোগ হয় না।

রুগ্ন জন্তুর উপযুক্ত যত্ন লইলে তিন চারিদিনে জ্বরের সকল লক্ষণ লোপ পায় ও অধিক ক্লেশ না হইয়া দশ পনর দিন মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু যত্নের ক্রুটী হইলে বা রোগ স্বত্বে গরুকে খাটাইলে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধা মান্দ্য হয়, এবং খুর ও পায়ের মধ্যে যে ঘা থাকে তাহাতে খুর খসিয়া পড়িতে পারে। পা অধিক ফুলিয়া উঠে, তাহাতে ফোড়া হয় ও দশ বার দিন মধ্যে গরু মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—রুগ্ন গরুকে ঘরের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হইবে। সেই ঘরের মধ্যে যেন উত্তমরূপে বায়ুর গতি বিধি থাকে ও ময়লা শূন্য হয়।

প্রতিদিন দুই তিনবার গরম জল ॥০ সের ও ফট্‌কিরি ১ তোলা একত্র মিশাইয়া সেই জলে মুখ ধুইয়া দিবে।

সকাল সন্ধ্যায় গরম জল দিয়া পা ধুইয়া সমস্ত ময়লা, বিশেষতঃ খুরের মাঝে খাঁজের ময়লা বাহির করিয়া সেক দিতে হইবে। তাহার পর কর্পূর এক ভাগ, তার্পিণ তৈল সিকি ভাগ, মষিণার তৈল ৪ ভাগ উত্তমরূপে মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইয়া দিবে। মাস বৃদ্ধি হইলে ঐ ঔষধে তুঁতের গুঁড়া মিশ্রিত করিবে।

পালান, বাঁট প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঘা হয় সেই সকল স্থান পরিষ্কার রাখা ও বারম্বার ঐ ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে মক্ষিকায় কোন উপদ্রব করিতে পারে না।

অধিক জ্বর হইলে কর্পূর ৵০ আনা, সোরা ১ তোলা, মদ্য আধ ছটাক ১ সের শীতল জলের সহিত খাওয়াইবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় অগ্রে মদের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তবে তাহার সহিত জল মিশাইতে হইবে, নতুবা কর্পূর জলে ভাসিয়া বেড়াইবে।

অথবা সোরা ১।০ তোলা, লবণ ২॥০ তোলা, চিরাতার গুঁড়া ২॥০ তোলা, গুড় দেড় ছটাক আধসের জলের সহিত খাওয়াইতে হইবে।

পথ্য—দুর্ব্বাঘাস কিম্বা মটরের ডগি ও অন্যান্য নরম টাট্‌কা দ্রব্য।

চাউল ৵০ পোয়া, জল ৫ সের দেড় ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিবে, তাহার পরে যখন দেখিবে ঠাণ্ডা হইয়াছে তখন তাহাতে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া দিবে।

শোথজ্বর—ইহাও সংক্রামক রোগ, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে নহে। ইহাতে চর্ম্মের নীচে কোন কোন স্থান বিশেষতঃ দাবনা ও পার্শ্ব, গলা ও জিহ্বা স্ফীত হয়। ফুলা স্থানটী বায়ু পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় ও টিপিলে চড় চড় করে। রুগ্ন জন্তুকে অন্য জন্তু স্পর্শ করিলে তাহারও এই পীড়া হইতে পারে। মানুষে স্পর্শ করিলে সাংঘাতিক কুষ্কুড়ী জন্মে।

গরু অনেক দিন অপকৃষ্ট বা ঘাসশূন্য জমিতে চরিলে তাহার পর চরিবার উত্তম স্থান পাইলে সচরাচর এই রোগ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবা পশুর রক্ত শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, এজন্য অল্প বয়স্ক গরুর এই রোগ অধিক হয়। রক্ত হঠাৎ গাঢ় হইলে দূষিত হইবার সম্ভাবনা, এবং শরীরের কোমল

মাংস শিথিল থাকে, এজন্য সেই স্থানের শিরা হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়। যদি কোন গরু কৃশ অবস্থা হইতে হঠাৎ পুষ্ট হইতে থাকে, তবে সেই গরুর এই রোগ প্রায়ই হইতে দেখা যায়। বৎসরের যে সময়ে দিবাভাগে গ্রীষ্ম এবং রাত্রিকালে শীত হয়, সে সময় গরুকে ফাঁকে রাখিলে এই পীড়া হইতে পারে। আমাদের দেশের জলা ভূমিতে চরিলেও গরুর এই রোগ জন্মে। পালের মধ্যে একটী গরুর এই জ্বর হইলে অন্য সকলেরও হইবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব ইহা সংক্রামক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

লক্ষণ—সচরাচর হঠাৎ এই রোগের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশিত হয়। যে গরুকে সুস্থ সচ্ছন্দ দেখা যায়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ম্লান ও আড়ষ্ট হইয়া পা নাড়িতে কষ্ট বোধ করে। কিছুক্ষণ পরে শরীরের কোন অঙ্গে যথা দাবনা, পার্শ্ব, গলা ও জিহ্বার নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে, কখন কখন বুকে, পেটে এবং মজ্জাতেও এই রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্মের নীচে ফুলা স্থান টিপিয়া ধরিলে বুজ বুজ করে ও তাহা বায়ুপূর্ণ বোধ হয়, এবং তাহাতে এক প্রকার তাপ জন্মে। গলায় ও ফুসফুসে পীড়া হইলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে। মজ্জাতে হইলে গরু অচেতন থাকে, পেট ও প্লীহাতে হইলে সেই সেই স্থানে বেদনার লক্ষণ দেখা যায়। পায়ের কোন স্থানে এই রোগ হইলে গরু প্রায় পা তুলিয়া চলিতে পারে না, অবশেষে নিশ্চল ভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। আক্রমণকালের অব্যবহিত পরেই রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে, এবং ফুলা স্থান সত্বর আরও অধিক ফুলিতে থাকে ও অল্পকাল মধ্যেই

পশুকে চলিতে অশক্ত করে। তখন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস হয়, কোঁত পাড়িতে থাকে, নাড়ী বেগে চলে, শীঘ্র বল হ্রাস হইয়া আইসে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর প্রাণ সংহার করে। এই রোগ দুই ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে।

চিকিৎসা—ফুলা অধিক হইলে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হওয়ায় ফুসফুস রক্তপূর্ণ জানা গেলে চিকিৎসায় ফল হয় না। শরীরের কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে গরুর এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারা যায়, তৎক্ষণাৎ মষিনার তৈল ১ পোয়া, গন্ধকের গুঁড়া আধ পোয়া, শুঁঠের গুঁড়া ১৷০ পোয়া আধ সের তপ্ত মাড়ের সঙ্গে গরুকে খাওয়াইয়া দিবে। অথবা লবণ দেড় ছটাক, মুসব্বর ১৷০ তোলা, গন্ধকের গুঁড়া ৫ তোলা খাওয়াইবে।

শুঁঠের গুঁড়া ২॥০ তোলা, গুড় আধ পোয়া, তপ্তজল ১ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। যতক্ষণ দাস্ত হইতে আরম্ভ হয় ততক্ষণ ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ দিতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত মদ্য ১ ছটাক, কর্পূর ৮০ আনা, এক পোয়া ভাতের মণ্ডের সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর এক একবার খাইতে দিবে।

কেহ কেহ এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সর্ব্বত্র সমান ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাতে রক্ত অতি শীঘ্র দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ও চট্‌চটে হইয়া যায়, শিরা কাটিলেও বাহির হয় না, এজন্য রোগের অতি প্রথমাবস্থায় রক্তমোক্ষণ না করিলে পরে করা যাইতে পারে না।

পশুটীকে ঘরের ভিতর রাখিয়া সামান্য লবণের সহিত উত্তম পরিষ্কার জল খাইতে দিবে।

পালের একটী গোরুর রোগ হইলে অপর সকলের হইবার সম্ভাবনা, অতএব তাহাদিগকে যাহাতে আক্রমর্ণ করিতে না পারে তজ্জন্য অন্যান্য গোরুকে লবণ আধ পোয়া, গন্ধকের গুঁড়া দেড় ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১।০ তোলা, গুড় দেড় ছটাক, গরম জল ২ সের ভাল করিয়া মিশাইবে, তাহার পর সেই জল শীতল হইলে একটু সোরা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। পালের সুস্থ গোরুগুলিকে কেবল ঘাস দিবে এবং সর্ব্বদা যাহাতে রক্ত চলাচল হয় এজন্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে হইবে। রুগ্ন পশুর চিকিৎসা করা অপেক্ষা ঐ রোগ যাহাতে না হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে বা যে গোরুর এই পীড়া হয় সেই স্থান বা সেই গোরুর নিকট হইতে সুস্থ গোরুগুলিকে দূরে রাখা যুক্তিযুক্ত।

মেষেরও এই রোগ হইয়া থাকে। তাহার চিকিৎসাপ্রণালী একই প্রকার, কেবল মাত্র মাত্রার পরিমাণ অল্প দিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্থানিক পীড়া।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহ—এই রোগ ফুস্‌ফুস ও বক্ষাবরক ঝিল্লিতে হইয়া থাকে এবং সংক্রামক মধ্যে পরিগণিত। সঙ্কারের প:

একমাস অবধি চারি মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সংক্রামণ কর্ত্তৃই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ—গোচিকিৎসকেরা ফুসফুসের উপর কাণ রাখিয়া ও টোকা মারিয়া রোগের লক্ষণ জানিতে পারেন। তদ্ভিন্ন পশুটী স্বভাবিক অপেক্ষা সুস্থ এবং কখন কখন পুষ্ট দেখায়, তাহার কিয়দ্দিন পরে গোরু কাঁপিতে থাকে, নাড়ী বেগবতী, মুখ গরম, ওষ্ঠ শুষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; শুষ্ক কাশি, অরুচি এবং দুগ্ধ-বতী গাভীর এই পীড়া হইলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। জ্বরের লক্ষণ দেখা যায়, গা শিহরিয়া উঠে, শ্লেষ্মক ঝিল্লি কুঞ্চিত হয়, শ্বাসে গন্ধ বাহির হয়, কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, নাড়ী প্রতি মিনিটে ৮০ হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, পরে অতি ক্ষীণ হয়, নাকের ছিদ্র বড় ফাঁক হয়, দাঁড়াইবার সময় হাঁটু বাঁকিয়া যায়, শয়ন করিবার সময় চিৎভাবে থাকিবার চেষ্টা করে, যে দিকের ফুসফুসে পীড়ার আক্রমণ হয় তাহার অপর দিক চাপিয়া শয়ন করে। কখন কখন চক্ষু ও নাসিকায় অল্পে অল্পে পিঁচুটী পড়ে, পা, শিং ও চর্ম্ম শীতল হইয়া উঠে, পরে আস্তে আস্তে ঘন ঘন কাশিতে থাকে, চর্ম্ম অতিশয় শুষ্ক হয় এবং ক্রমে তাহার অস্থি চর্ম্ম মাত্র সার হইয়া পড়ে।

পাঁজরের হাড়ের মধ্যস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে লাগে, গোরু গোঁ গোঁ করে ও কোঁত পাড়ে। রোগের শেষাবস্থায় উদরাময় হয়। এই রোগে সর্ব্বদাই অল্প বা অধিক জ্বর থাকে, জ্বর কমিয়া গেলে ক্ষুধা বাড়ে, কিন্তু আহার করিলে অজীর্ণ হইয়া কাশি বৃদ্ধি করে। ক্রমে বুক ভার হইতে থাকে, ও পরিশেষে শ্বাস ফেলিতে অসমর্থ হইয়া মারা যায়। আরম্ভা-

বধি ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত এই রোগ থাকিতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা—গোরু রুগ্ন হইলে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক ঘরে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে হইবে। সেই ঘরে যাহাতে অধিক নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করে তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিতে হইবে। পথ্যের মধ্যে টাট্‌কা ঘাস, কোমল ও রেচক দ্রব্য, ভাতের মাড় ও পরিষ্কার জল খাইতে দেওয়া উচিত। বিচালি বা অন্য প্রকার শুষ্ক ঘাস দেওয়া বিধি নহে।

জ্বর হইয়া নাড়ী বেগবতী হইলে কর্পূর ৵০ আনা, সোরা ৵০ আনা, ধুতূরার বীজ চূর্ণ ।৵০ আনা ও মদ্য আধ ছটাক ভাতের পাতলা মাড় আধসেরের সহিত খাওয়াইতে হইবে।

পেট আঁটিয়া গেলে হীরাকসের গুঁড়া ।৵০ আনা, চিরাতার গুঁড়া ১।০ তোলা আধ সের ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে।

শ্বাস ফেলিতে অধিক কষ্ট হইলে তপ্ত জলে ফ্ল্যানেল কিম্বা কম্বল ভিজাইয়া ১৫ মিনিটের অধিক ও ৩০ মিনিটের অনধিক কাল সেক দিবে। কিন্তু যে স্থানে সেক দিবে সেই স্থানে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে এরূপ সাবধানতা লইবে। সেক দিবার পর শুকান বস্ত্র দ্বারা সেই স্থান ভাল করিয়া মুছিয়া সরিষার তৈল ৪ ভাগ, তার্পিন তৈল ২ ভাগ উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে।

পেট আঁটিবার লক্ষণ দেখিলে মষিণা দেড় পোয়া, জল ৪ সের এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া জুড়াইলে কাপড়ে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইবে এবং তাহাতে এক ছটাক গুড় ও এক ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২ বার খাওয়াইবে।

পশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে ভাতের মাড় এক সেরের

সহিত এক ছটাক মদ্য মিশ্রিত করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দিবে।

এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। কদাচিৎ দেখিতে সুস্থবোধ হইলেও শরীর গতিক চির-কাল দুর্ব্বল থাকিবে।

গলা ফুলা ও গলার ঘা—এ রোগটী বড়ই সংঘাতিক এবং সংক্রামক। এক প্রকার বিষ হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

লক্ষণ—জ্বর, কণ্ঠ ও কানের নিম্নভাগ ও চোয়ালের মধ্যে যে গ্রন্থি থাকে তাহা ফুলিয়া উঠে, মুখ হইতে লাল পড়ে। জিহ্বা ও মুখের পশ্চাদ্ভাগ ফুলিয়া উঠে, ঢোঁক গিলিতে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। নাকের ছিদ্র ও চক্ষের পাতার পরদা লাল হইয়া উঠে। ক্রমে ঐ সকল উপসর্গই বৃদ্ধি পায়। গলা ঘড় ঘড় করে, শ্বাসে বড় দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বা মুখের বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে ও কাল ক্ষত যুক্ত হয়, স্থানে স্থানে পুঁজ ও বাহির হয়, এই-রূপে অধিকক্ষণ থাকিতে হয় না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। এই রোগ উর্দ্ধ সংখ্যা তিন দিন থাকে। শতকরা ২০টী গোরু এই রোগে বাঁচে কিনা সন্দেহ।

চিকিৎসা—এই রোগ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, এজন্য সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন গোরুর আহার গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট হয় দেখিবে, সেই সময় পূর্ব্বাধ্যায়ে যে জোলাপের কথা বলা হইয়াছে সেই জোলাপ দিবে। পরে কণ্ঠের রোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তজ্জন্য কণ্ঠার চারিদিকে এক কানের মূল হইতে অন্য কানের মূল পর্য্যন্ত

কণ্ঠনলীর উপরিভাগে দুই তিন ইঞ্চ স্থান ব্যাপিয়া তিন, চারি বার লাল করিয়া লৌহ পোড়াইয়া দাগ দিবে এবং চোয়ালের নীচে ও মধ্য স্থানে এক কানের মূল হইতে অন্য কানের মূল পর্য্যন্ত ঐরূপে দাগ দিতে হইবে। তাহার পর তেলা-পোকা ১ ভাগ, মষিণার তৈল ৬ ভাগ, মোম ৬ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া মালিশ করিবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় অগ্রে মোম গালিয়া তাহাতে মষিণার তৈল মিশাইবে পরে তেলাপোকা বাটিয়া তাহাতে দিবে।

অথবা জয়পালের তৈল ১।০ তোলা, সরিষার তৈল আধ পোয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে।

এই দুই ঔষধে ব্লিষ্টারের কাজ করে। উহাদের প্রয়োগে যদি বিশেষ ফল পাওয়া যায় তবে সুলক্ষণ জানিতে হইবে।

তদনন্তর ফট্‌কিরি ৮০ আনা, গুড় আধ পোয়া, জল আধ সের একত্র করিয়া মুখ ধুইয়া দিবে।

পশ্চাৎ ধুতূবার বীজ চূর্ণ ।৶০ আনা, কর্পূর ৮০ আনা, মদ্য আধপোয়া ভাতের তপ্ত মাড় এক সেরের সহিত খাওয়াইবে।

ঔষধ খাওয়াইবার সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যেন ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে গলায় না লাগে, কেন না বেদনা স্বত্ত্বে গলায় ঔষধ আটকাইলে গোরুর বিলক্ষণ কষ্টের সম্ভাবনা, এমন কি তাহাতে গোরু মরিয়া যাইতে পারে।

শ্বাস বন্ধ হইবার সম্বাবনা হইলে কোন কোন চিকিৎ-

এক কণ্ঠার মধ্যস্থলে গলার নলী চিরিয়া ফাঁক করিয়া দেন, সেই ছিদ্র দিয়া গোরু শ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে পারে। চিরিয়া দিবার পর ক্ষত স্থানে কর্পূর ১ ভাগ, তারপিন তৈল সিকি ভাগ, মষিণার তৈল ৪ ভাগ মিশাইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

কণ্ঠরোধ—এই রোগে আহারীয় গিলিতে কষ্ট বোধ করে, কিম্বা একবারেই গিলিতে পারে না।

কারণ—আহারকালে খাদ্য দ্রব্য গলার যে নলী দিয়া পাকস্থলীতে যায়, তাহার পশ্চাৎ বা মধ্যভাগে কোন দ্রব্য আটকাইয়া গেলে এই রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—ইহাতে গোরু কাশিতে থাকে, মুখ দিয়া লাল পড়ে, জল খাইলে সেই জল নাক দিয়া বাহির হয়। গোরু অতি অস্থির হয়, মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পায়, ঘাড়ের মাংসপেশী খেঁচিতে ও খিল ধরিতে থাকে, ত্বরায় আরোগ্য লাভ না করিলে পেট ফুলিয়া উঠে।

চিকিৎসা—তিসির তৈল আধ পোয়া গরম করিয়া এক ছটাক মদ্য মিশাইবে, তাহার পর অতি সাবধানে সেই মিশ্রিত দ্রব্য খাইতে দিবে।

ইহাতে গলার নলী ও গলায় আটকান ভুক্তদ্রব্য পিচ্ছিল হইয়া উদরস্থ হইবে।

আটকান দ্রব্য কণ্ঠার পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে হাত দিয়া সরাইয়া দিতে হইবে। গলার নলীতে আটকাইয়া থাকিলে উপরোক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া বাহিরে যে স্থান ফুলিয়া থাকিবে সেই স্থানটীর চারিধার অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে টিপিয়া

দিতে হইবে। তাহাতে ঐ আটকান দ্রব্য সম্পূর্ণ সরিয়া না গেলে আবার একটু মদ্য ও তৈল উপরিউক্ত পরিমাণে সেবন করাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিবে।

সিমলা—ইহার অপর নাম পশ্চিমা। পাকস্থলী বাষ্প বা বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠিলে এই রোগ জন্মে।

কারণ—অনিয়মিত আহার জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বে যে দ্রব্য না খায় এমন দ্রব্য খাইলে এই রোগ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে তৃণাভাবে ও তাহার পর বর্ষাকালে নরম ঘাস ও বৃক্ষপল্লব ভক্ষণ করিলেও এই রোগ জন্মিতে পারে। পালের মধ্যে একটী গোরুর এই পীড়া হইলে অবশিষ্টগুলিরও হইতে পারে। কখন কখন কণ্ঠরোধ পীড়ার ন্যায় পশ্চিমা বা সিমলা রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণ—পেটের বাম দিকের পশ্চাদ্ভাগ ফুলিয়া উঠে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপর টোকা মারিলে পাকস্থলীতে বায়ু জমিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, মাথা সোজা করিয়া রাখে, গোঁ গোঁ শব্দ করে, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়—বোধ হয় যেন আর নড়িতে চড়িতে পারিবে না। শীঘ্র পেট আরও অধিক ফুলিতে থাকে, অন্যান্য লক্ষণ ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর হইয়া দেখা দেয়। পাকস্থলীতে যে বায়ু জমিয়া থাকে তাহা বাহির করিয়া না দিলে পেট অতিশয় ফুলিয়া গোরুকে বড় কষ্ট দেয় এবং পশু আর দাঁড়াইতে পারে না, পড়িয়া যায় ও শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মারা পড়ে।

অনেক সময়ে এই রোগ ভ্রমক্রমে অন্য রোগের ন্যায় বোধ হয়। কখন কখন বিষ খাওয়ান বলিয়া সন্দেহ হইতে

পারে ; রোগ কঠিন হইলে গোরু এক হইতে তিন ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকে।

চিকিৎসা—মদ্য আধ পোয়া, শুঁঠের গুঁড়া ১ ছাটক, গোল মরিচের গুঁড়া ১।০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া আধ সের গরম জলের সহিত খাওইয়া দিবে। গোবৎসের এই পীড়া হইলে এই ঔষধ অর্দ্ধ মাত্রায় দিতে হইবে।

ঔষধে ফললাভ হইলে পশু অল্পকাল মধ্যেই ঢেঁকুর তুলিতে আরম্ভ করিবে। যত ঢেঁকুর তুলিবে পেট ফাঁপা ও শ্বাস ফেলিবার কষ্ট তত কমিয়া যাইবে।

যদি ঔষধে উপকার না দর্শে এবং শ্বাসের লক্ষণ দেখা যায় তবে গরুটীকে হাঁ করাইয়া আন্দাজ দুই হাত লম্বা একটা নল গলার নলীর ভিতর দিয়া পাকস্থলী পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিবে, এরূপ করিলে উদরের দূষিত লাল নলের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। নলটী এরূপ দ্রব্যে প্রস্তুত হইবে যেন ইচ্ছা মত বাঁকান যাইতে পারে। এমত স্থলে রবারের হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহাদের নিকট নল না থাকে তাহারা রুগ্ন গরুর পাঁজরের শেষ অস্থির ও উরতের সন্ধির মধ্যে বাম দিকের দাবনার উপরিভাগে ঐ পাঁজরের শেষ অস্থি ও উরতের সন্ধি এবং কটিদেশের পার্শ্বের অস্থি হইতে সমান দূর ব্যাপিয়া ধারাল ছুরি দ্বারা খোঁচা মারিয়া পাকস্থলীর নিকট পর্য্যন্ত বিঁধিয়া দিয়া থাকে। ছিদ্রটী এমন বড় করিতে হইবে যেন কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত মোটা ৬ ইঞ্চ লম্বা বাঁশের চুঙ্গি একটী তন্মধ্যে প্রবেশ করান যাইতে পারে। তাহার পরে ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাঁশের চুঙ্গি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে গরু ত্বরায় কিঞ্চিৎ

আরাম লাভ করিবে। দুই ঘণ্টাকাল ঐ চুঙ্গি বসান থাকিবে। ঐ চুঙ্গি পেটের ভিতর সমস্ত প্রবিষ্ট হইয়া না যায় এজন্য চুঙ্গির যে দিক বাহিরে থাকে তাহার অগ্রভাগের এক ইঞ্চ নিম্নে ৩ ইঞ্চ লম্বা একটা কাটী এড়ো করিয়া বান্ধিয়া দিতে হইবে। এই সময়ে বিরেচক ঔষধ দিবে। পথ্য অতি অল্প পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাইতে দিবে, কদাচ অধিক দিবে না।

পালের মধ্যে একটা পশুর এই রোগ হইলে অন্য গুলিকে কম করিয়া আহার দিয়া এই রোগের হাত হইতে মুক্ত করিবে।

পেট ফাঁপা ও পেট আঁকড়ান—অত্যন্ত পাকা উলুখড় বা খড়িকাটী মোটা শক্ত অথচ দুষ্পাচ্য দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠে। কখন অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া একবারে অধিক পরিমাণে সুস্বাদু দ্রব্য খাইলে পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং একবারে অনেক শস্য খাইলেও এই রোগ জন্মে। আবার উপযুক্ত পরিমাণে জল খাইতে না পাইলেও এ রোগ হইয়া থাকে।

কারণ—পাকস্থলী অধিক পূর্ণ হইলে প্রথমে তাহার কার্য্য শিথিলভাবে চলে, পরে ক্রমশঃ মাংসপেশীর আবরকের বাষ্পে ফুলিয়া উঠিলে পাকস্থলী শক্তিবিহীন এবং অবশ হইয়া পড়ে।

লক্ষণ—বায়ু বা বাষ্প দ্বারা পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠাই সিমলা রোগের লক্ষণ। তজ্জন্য কখন কখন এই রোগকে সিমলা বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু এ রোগের লক্ষণ সকল সিমলা অপেক্ষা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে পশু প্রথমে ম্লান হয়, জাবর কাটে না, বামদিকের দাবনা ক্রমে ফুলিয়া উঠে, অঙ্গুলি দিয়া টোকা মারিলে বা টিপিলে সিলমা রোগে যেমন ঢ্যাপ ঢ্যাপে শব্দ হয় ইহাতে সেরূপ হয় না।

কিন্তু আহারীয় দ্রব্যে পাকস্থলী পূর্ণ থাকায় শক্ত হয় এবং নরম মাটীতে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে অঙ্গুলি যেরূপ বসিয়া যায় তেমনি টোল পড়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা মধ্যে লক্ষণ সকল বৃদ্ধি পায়, সহজে শ্বাস টানিতে না পারিয়া হাঁপাইয়া উঠে, বারম্বার গেঁ। গেঁ। শব্দ করিতে থাকে, শয়ন করিতে হইলে পশু দক্ষিণ পার্শ্বের উপর ভর দিয়া শয়ন করে, অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে পারে না, শুইয়া থাকিলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় এজন্য দাঁড়াইয়া উঠে, কোঁৎ পাড়ে, দাঁত কড়মড় করে, নাড়ী অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, ক্রমে শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এই রোগ একদিন হইতে তিন দিন থাকে।

চিকিৎসা—ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে জমা হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর যাহাতে পাকস্থলীর ক্রিয়া হইতে থাকে, এরূপ প্রক্রিয়া করিতে হইবে এজন্য অবিলম্বে লবণ দেড় ছটাক, মুসব্বর (গরম জলে ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া) ১।০ তোলা, মষিণার তৈল দুই ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১।০ তোলা, মদ্য ১ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই সের গরম জলের সহিত খাওয়াইবে। এই ঔষধ অত্যন্ত বিরেচক এজন্য পূর্ণ বয়স্ক গরুর পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল জানিতে হইবে, অর্দ্ধ বয়স্ক পশুর জন্য অর্দ্ধেক মাত্রায় দিবে এবং মেষের পক্ষে ছয়ভাগের এক ভাগ।

২ সের গরম জলে সাবান ফেণাইয়া তাহাতে দেড় ছটাক সরিষার তৈল দিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিবে এবং তদ্দ্বারা ১৫ মিনিট অন্তর পিচ্‌কারী দিতে হইবে। তাহার পরে গরুর বামদিকে সরিষার তৈল ৪ ভাগ, তার্পিণ তৈল ২ ভাগ

একত্রে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে দাস্ত না খুলিলে পাকস্থলীর উপর গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেক দিবে এবং সুরা ২ ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১।০ তোলা, গোলমরিচের গুঁড়া ১।০ তোলা, গুড় দেড় ছটাক, মষিণার তৈল ১ ছটাক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ১ সের গরম জলের সহিত ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। এইরূপ করিতে করিতে ২০ ঘণ্টার মধ্যেও যদি জোলাপ না খোলে তবে জয়পালের বীজচূর্ণ ৵০ আনা, লবণ ৵০ ছটাক একত্রে খাওয়াইবে, কিন্তু পিচ্‌কারী দেওয়া বন্ধ না হয়। পশু ম্লান ও অচেতন হইবার চিহ্ন দেখিলে মষিণার তৈল বাদে উপরোক্ত মতে সুরা, শুঁঠেরগুঁড়া, গোল মরিচের গুঁড়া, গুড় একত্র করিয়া খাওয়াইবে। এই সময় তপ্তজল বা তিসির পাতলা খড় যত ইচ্ছা খাইতে দিবে।

দাস্ত আরম্ভ হইলে রোগের যাবতীয় লক্ষণ কমিয়া যাইবে। তাহার পর কয়েক দিন কেবল মাত্র তিসির মাড় কিম্বা ১ ছটাক লবণের সহিত ভূসির জাব খাইতে দিবে এবং অল্প করিয়া কাঁচা ঘাসও খাওয়াইতে পার; কিন্তু সাবধান যেন উক্ত পথ্য কোন মতে অপরিমিত না হয়।

প্রস্রাবের পীড়া—এই রোগের অপর নাম রক্ত মূত্র। রক্ত দোষে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্য ভাল রূপে পরিপাক না হইলে দূষিত রক্ত জন্মিয়া এই রোগ হইয়া থাকে। ইহা কর্ত্তৃক পশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্রমে অস্থি-চর্ম্মসার হয়। ছাগ ও মেষাদিরও এই ব্যাধি হইতে দেখা যায়। জল সঞ্চিত ভূমির তৃণাদি ভোজন এই রোগের অন্যতম কারণ। অপর কারণ ঘোলা জল পান।

লক্ষণ—পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। গা শিহরিতে থাকে, চর্ম্ম শুষ্ক ও হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে, পৃষ্ঠদেশ কুব্জ হয়, পাল ছাড়িয়া একা অন্য দিকে যায়, প্রথম পাতলা মল নির্গত হয়, পরে একবারে দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে, দাবনা বসিয়া যায়, পশু দুর্ব্বল হয়, চক্ষু বসিয়া যায়, মুখ কাণ ও পা ঠাণ্ডা হয়, পরিশেষে উত্থানশক্তিবিহীন হইয়া মারা পড়ে। এই রোগ ৫। ৬ দিন হইতে ২৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

চিকিৎসা—প্রথমাবস্থায় লবণ ।৵০ ছটাক, মুসব্বর ১৷০ তোলা, গন্ধকের গুঁড়া ৫ তোলা, শুঁটের গুঁড়া ২৷৷০ তোলা, গুড় ৵০ ছটাক, গরম জল ১ সের একত্র করিয়া জোলাপ দিবে। দাস্ত পরিষ্কার হইলে শুঁঠের গুঁড়া ১৷০ তোলা, চিরাতার গুঁড়া ১৷০ তোলা, গোলমরিচের গুঁড়া ১৷০ তোলা, যমানির গুঁড়া ৷০ তোলা, লবণ ৴০ ছটাক, সমস্ত দ্রব্যের যত ওজন তাহার সিকি ভাগ গুড় গরম মাড়ের সহিত খাওয়াইবে। যদি প্রথম বার জোলাপ দিলে দাস্ত না হয় তবে ঐরূপ মাত্রায় আর একবার উপরোক্ত ঐ ঔষধ খাওয়াইবে।

পথ্য—ভাল তিসির বা ভাতের মাড় ও পুষ্টিকর কাঁচা নরম ঘাস দেওয়া যাইতে পারে। ভাল মাড়ের সঙ্গে দেড় ছটাক গুড় ও ৵০ ছটাক দেশী মদ প্রতি দিন ২। ৩ বার দিতে হইবে।

উদরাময়—এই রোগে ঘন ঘন দাস্ত হইতে থাকে, কখন কখন পাকস্থলীর প্রদাহ অনুভূত হয়। কদর্য্য খাদ্য বিষময় গাছ গাছড়া কিম্বা ঘোলা জল খাইলে এই রোগ জন্মে। ফুসফুসের প্রদাহ ও অন্যান্য রক্তজন্য রোগের চরমাবস্থায় এই

রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শৈত্য প্রযুক্ত অথবা অত্যন্ত গরমের পর ঠাণ্ডা পড়িলে এই রোগ জন্মিতে পারে, কখন কখন রৌদ্রের উত্তাপ হইতে জন্মিয়া থাকে। প্রথম বর্ষার পর যে নূতন ঘাস জন্মে ঐ ঘাস খাইলেও গবাদির উদরাময় হয়।

লক্ষণ—বারম্বার বায়ুসহিত জলবৎ দাস্ত হয়, রোমন্থানে নিবৃত্তি জন্মে এবং পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধের অল্পতা হইয়া থাকে। কখন কখন গোবরের সঙ্গে রক্তের ছিটাও দেখা যায়।

চিকিৎসা—নিত্য যে স্থানের ঘাস জল খাইয়া থাকে সে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পরে চাখড়ির গুঁড়া ৩৮০ তোলা, পলাশ গঁদ ৮০আনা, আফিম ।৵০ আনা, চিরাতার গুঁড়া ১।০ তোলা উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া ৵০ ছাটাক সরাপ দিয়া মাখিবে, এবং ১ সের ভাতের মাড়ের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইবে। পেটে বেদনা ধরিলে বা মল নির্গমনের সময় বেগাধিক্য জন্মিলে ঐ ঔষধের সঙ্গে ৮০ আনা ওজনে আফিঙ্গ দিতে হইবে।

রোগ কঠিন হইলে পথ্যস্বরূপ ভাতের মাড় কিম্বা ভুষির জাব দিতে হইবে। ঔষধে উপকার না দর্শিলে চা খড়ির গুঁড়া ৵০ ছটাক, খয়েরের গুঁড়া ২॥০ তোলা, শুঁটের গুঁড়া ২।০ তোল, আফিঙ্গ ।৵০ আনা, সরাপ ৵০ ছটাক, জল ।৵০ পোয়া একত্র মিশাইয়া খাওয়াইবে। উত্তমরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিলে দিন কতক জল খাইতে না দিয়া ভাত তিসি ও ময়দার মাড় একত্র করিয়া সেবন করাইবে। আরোগ্য লাভের পর পশু কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে হীরাকশের গুঁড়া ১।০ তোলা আধ সের ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাইতে দিবে।

বহুদিনের পুরাতন পীড়া হইলে সফেদা ৵০ আনা, চা খড়ির গুঁড়া ২॥০ তোলা, আফিঙ্গ ৸০ তোলা, ভাতের মাড় ৵০ ছটাকের সহিত খাওয়ান বিধি।

রক্তামাশায়—এই রোগে গোবরের সহিত আম, রক্ত, পূঁজ নির্গত হইয়া থাকে।

করাণ—উদরাময়ের পর পাকস্থলীর উত্তেজনাপ্রযুক্ত জন্মিয়া থাকে। অথবা কদর্য্য ঘাস, বিষাক্ত উদ্ভিদ, ঘোলা জল খাইলে কিম্বা গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে খোলা বাতাসের শীতলতা শরীরে লাগিলে ও জলাভূমিতে থাকিলে রক্তামাশায় জন্মে।

লক্ষণ—কম্প দিয়া জ্বর হয়, বারম্বার দাস্ত হয়, জলবৎ মলের সঙ্গে রক্ত ও আম মিশ্রিত থাকে। ঐ আম ডিমের ভিতরের লালার মত।

চিকিৎসা—গরম জলে ফ্লানেল বা কম্বল ভিজাইয়া পেটে সেক দিবে, অথবা লৌহ পোড়াইয়া পেটে দাগ দিতে হইবে। মল নির্গমনের বেগ অধিক হইলে কটীদেশ বেষ্টন করিয়া একগাছি দড়ি দিয়া বাঁধিবে ও মধ্যে মধ্যে ভাতের মাড় ১ সের, আফিঙ্গ ৸০ আনা, ভালরূপে মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। দুই একদিন ভেদ বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহাতে পরিষ্কার হইয়া দাস্ত হয়, তাহার জন্য ধুতূরার বীজ চূর্ণ ।৵০ আনা, কর্পূর ৸০ আনা, মদ ৵০ ছটাক, একসের গরম মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে।

তিসির মাড় অর্দ্ধেক, ভাতের মাড় অর্দ্ধেক ও কলাই সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে।

আমাশায় বন্ধ না হইলে সফেদা ৵০ আনা, চা খড়ির গুঁড়া

২॥০ তোলা, আফিঙ্গ ৵০ আনা ঘন মাড়ের সঙ্গে দিন ২ বার খাওয়াইতে হইবে। এই সময়ে তিসি ও ভাতের মাড় সমান ভাগে মিশাইয়া খাইতে দিবে, এবং কচি নূতন ঘাস ও অন্যান্য টাট্‌কা দ্রব্য বিশেষ উপকারী।

এই রোগে পশুকে শুষ্ক, উচ্চ ছায়াযুক্ত অথচ বাতাস যায় এমন জায়গায় রাখিবে। রাত্রিতে শীত হইলে কম্বল দিয়া গোরুর গা ঢাকিয়া দিতে হইবে।

কৃমিরোগ—নিম্ন ও জলাবৃত ভূমিতে চরিলে গোরুর এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ—পশু এই রোগে আক্রান্ত হইলে ক্রমশঃ কৃশ হয়, দাবনায় বা তাহার দুই দিকের পাঁজরায় হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে চামড়ার ভিতর যেন বজ বজ শব্দ করে। প্রথমে চর্ম্ম বিকৃত হইয়া অত্যন্ত পাংশুটে বর্ণ হয়। লোম এমন আলগা হয় যে টানিবা মাত্র খসিয়া আসিবে। কিছু দিন পরে চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণ ও তাহাতে কাল দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া দাগ দেখা যায়। থোপ্‌নার নীচে ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর তেজ কমিয়া যায়, পৃষ্ঠ দেশ বসিয়া পড়ে, পেট বড় হয়, অতিশয় তৃষ্ণা জন্মে, সর্ব্বদাই পেটুকের মত আহার করে, প্রায়ই কাশিতে থাকে। এই সকল হইবার পরে উদরাময় হয়, ক্রমশঃ দাস্ত বেশী হইতে হইতে অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া মারা যায়।

চিকিৎসা—যেস্থানে কটু ঘাস না জন্মে ও উচ্চ সেই স্থানে চরাইবে, ও যেস্থানে রাখিলে রোদ বৃষ্টি না লাগে এমতস্থানে রাখিয়া লবণ ।০ তোলা ও হীরাকশের গুঁড়া ৵০ আনা একত্র করিয়া প্রতিদিন দুইবার খাওয়াইতে হইবে।

পথ্য—উচ্চ ভূমিতে শুষ্ক ঘাস, শস্য ও খইল এবং লবণ মিশান ভাতের মাড় খাইতে দিবে।

কাশরোগ—শ্বাসনলী ও তাহার যে শাখা গুলি ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে প্রদাহ উপস্থিত হয়। তাহা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি।

কারণ—বাছুর ও মেষ চরিবার সময় ঘাসের সঙ্গে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সূতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির ডিম উদরের ভিতরে গিয়া কৃমি জন্মে; সেই কৃমি শ্বাসনলীতে গেলে কাশরোগ উৎপন্ন হয়। যুবা ও বৃদ্ধ পশুদিগের গাত্রে গরমের পর শীতল বাতাস লাগিলে সর্দ্দি ও গলাফুলা রোগ হইয়া তাহা কাশরূপে পরিণত হয়।

লক্ষণ—প্রথমে শুকান কাশি ও গলার গর্ গর্ শব্দ হয়, হাঁস ফাঁস করে ও গলার নীচে কান রাখিলে ফোঁস ফোঁসানি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্বাসনলীতে শ্লেষ্মা পূর্ণ হওয়ায় গলা ঘড় ঘড় করে, কাশিলে নাকের ছিদ্র ও মুখ দিয়া শ্লেষ্মা ও কফ নির্গত হয়। চিকিৎসা না হইলে গোরু ক্রমশ কৃশ হইয়া মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—গলার নীচে সমুদায় স্থানে লোহা পাড়াইয়া দাগ দেওয়া কর্ত্তব্য, অথবা তেলাপোকা ১ ভাগ, মযিণার তৈল ৬ ভাগ, মোম ৬ ভাগ একত্র করিয়া ব্লিষ্টার প্রস্তুত করিয়া কণ্ঠ দেশে মালিশ করিয়া দিবে। মনে রাখা উচিত যে, অগ্রে মোম গলাইয়া মষিণার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে; পীড়া কঠিন হইলে উভয় প্রক্রিয়াই করা যাইতে পারে।

তার্পিন তৈল ৴০ ছটাক, মষিণার তৈল ৶০ ছটাক ভালরূপে মিশাইয়া এক সের গরম মাড়ের সঙ্গে ২।৩ দিন অন্তর খাওয়াইতে হইবে, এবং যেখানে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হয় এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে গোরুকে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

হীরাকশের গুঁড়া ।৶০ আনা, চিরাতার গুঁড়া ১।০ তোলা, ভাতের, তিসির কিম্বা ভূষির মাড় আধ সেরের সঙ্গে মিশাইয়া দিন দুই বার খাইতে দিবে। রাত্রিতে শীত হইলে ভাল শুকান বিচালী বিছাইয়া তাহার উপর পশুকে কম্বল ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে।

রোগের লক্ষণ সমুদায় অন্তর্হিত না হইলে ব্লিষ্টারের উপর সরিষার তৈল ও তার্পিণ তৈল সমান ভাগে লইয়া দিন দুইবার করিয়া মালিশ করিতে হইবে। ইহাতে ব্লিষ্টারের শক্তি প্রবল থাকিবে।

শ্বাসনলীতে সূতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট জন্মিয়া বাছুর কিম্বা মেষশাবকের কাশির পীড়া হইলে বাছুরের জন্য তার্পিন তৈল ৴০ ছটাক ও মষিণার তৈল ৶০ ছটাক একসের ভাতের মাড়ের সঙ্গে ২।৩ দিন অন্তর খাইতে দিবে, আর মেষের জন্য মষিণার তৈল ৴০ ছটাক ও তার্পিণ তৈল ১ তোলা মিশাইয়া খাওয়াইবে।

এককালে অনেক পশুর এই রোগ হইলে তাহাদিগকে কোন ঘেরা ঘরে রাখিয়া সেই ঘরে একটী লোহার হাতায় আগুন দিয়া আধ ঘণ্টা কাল গন্ধক পোড়াইবে। গন্ধকের ধূমে পশুগুলি যতক্ষণ না কাশে ততক্ষণ গন্ধক পোড়াইবে।

বিষ খাওয়ান—কখন কখন গোরুরা খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে হঠাৎ বিষ ভক্ষণ করে, কখন বা তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইলে তাহারা মরিয়া যায়। আমাদের দেশের মুচিরা চামড়া বিক্রয়ের লোভে গোরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া থাকে। গৃহস্থের গোরু বাড়ীর বাহিরে বা মাঠে থাকিলে দুর্ম্মতিরা ঘৃত কিম্বা ময়দার সঙ্গে সেঁকো, হরিতাল, ধুতূরা ও কুচিলা প্রভৃতি দ্রব্য কলাপাতার ভিতরে রাখিয়া গোরুকে খাইতে দেয়, তাহাতেই তাহারা মরিয়া যায়।

কখন কখন ভেরেণ্ডার গাছ ও বীজ এবং তৃণাভাবে কটু গাছ গাছড়া খাইয়াও মরিয়া গিয়া থাকে।

লক্ষণ—বিষাক্ত দ্রব্য খাইলে গোরু কাঁপিতে থাকে, তলপেট বেদনা করিতে থাকে, পশ্চাতের পা ও শিং দিয়া পেটে গুঁতা মারে, বার বার পাঁজরের দিকে দৃষ্টি করে, মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়, অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ করে, খেঁচিতে থাকে, অনবরত দাস্ত হয়, তাহার সহিত রক্ত নির্গত হয় এবং ২। ৪ ঘণ্টা মধ্যে মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—অধিক পরিমাণে বিষ খাওয়াইলে চিকিৎসা প্রায় বিফল হয়। অল্প পরিমাণ বিষ খাওয়াইলে গন্ধকের গুঁড়া ৴০ ছটাক, মষিনার তৈল ৶০ ছটাক, ভাতের গরম মাড় ৷৷০ সের খাওয়াইবে; অথবা মষিণার তৈল এক পোয়া, গন্ধকের গুঁড়া ৶০ ছটাক, শুঁঠের গুঁড়া ১৷০ তোলা, ভাতের গরম মাড় ৷৷০ সেরের সহিত খাইতে দিবে। ইহাতে দাস্ত হইতে থাকিবে। তিসির মাড় অধিক করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিন্তু যতক্ষণ বেদনা নিবারণ কি দাস্ত বন্ধ না হয় ততক্ষণ জল দিবে না। অল্প

কলাই সিদ্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে ভূষির জাব দিতে হইবে,দুই একদিন পরে কাঁচা ঘাস দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ঘাস কোন মতে শক্ত না হয়।

কৃষি অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষিপ্রবৃত্তি।

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিত্য প্রাতে সন্ধ্যায় যখনই কর্ম্ম হইতে অবসর পাইতেন আপন গবাদির যত্ন লইতেন, সাবধাণতার সহিত তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, পশুগুলি তাঁহার সংসারের অনেক উপকার সাধন করিত। গাভীগুলির যে দুগ্ধ হইত, তাহাতে তাঁহার সংসারের পর্য্যাপ্ত হইয়া অনেক উদ্বৃত্ত থাকিত। পশুগুলি কেন, সংসারিক কোন কাজেই তাঁহার অযত্ন বা অনবধানতা ছিল না। চাকরিতে তাঁহার আয় অল্প হইলেও চেষ্টা বলে তিনি গ্রামমধ্যে একজন সম্পন্ন লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সংসারের সমস্ত জিনিস সর্ব্বদা তাঁহার ঘরে উপস্থিত থাকিত, অভাব কেমন তাহা তিনি জানিতেন না।

পশুপালন ব্যতীত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃষিকার্য্যে বড় আস্থাবান ছিলেন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধ কৃষি কর্ম্মনি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। বড় মানুষ হইতে হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় করা নিতান্ত আবশ্যক। অল্প আয়বান ব্যক্তির সংসার ধর্ম্ম সুন্দররূপে পালন পক্ষে কৃষিকর্ম্ম একটী প্রধান সম্বল তাহা তিনি ষোলআনা রকমে জানিতেন। আহার্য্য ফল শস্যাদি অর্থ দিয়া ক্রয় করিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল দ্রব্য স্বয়ং যত্নে উৎপন্ন করিতে পারিলে সংসারের প্রভূত আনুকূল্য হয়, অথচ অত্যল্প মাত্র ব্যয়সাপেক্ষ; সত্যবটে তাহাতে পরিশ্রমের প্রয়োজন, কিন্তু উদ্যোগী না হইলে কোন ব্যক্তি লক্ষ্মীবান হইতে পারেন না। উদ্যোগী ব্যক্তি কখন নিষ্ফল হয়েন না।

পৃথিবীতে যেদিন হইতে সভ্যতার সূত্রপাত, সেই দিন হইতে কৃষিকার্য্যের আবশ্যকতা মনুষ্য জাতির মনে অনুভূত হইয়াছে। অসভ্য জাতিরা যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলাদি ও মৃগয়া-দ্বারা উদর পোষণ করিয়া থাকে। এইরূপে কাল হরণ করিতে হইলে তাহাদিগকে নিত্য পরিশ্রম করিতে হয়, যে দিন ফলা-ন্বেষণ না করিবে, যে দিন মৃগয়ায় বহির্গতি না হইবে, সে দিন তাহাদিগকে অনশনে কালযাপন করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু শরীর ধারণে নিত্য শ্রম নিতান্ত অসম্ভব; দৈবাৎ একদিন শরীর অসুস্থ হইলে অনাহারে থাকিতে হইবে ইহা অল্প দুঃখের কথা নহে। শুধু কষ্ট নয় এরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কোন মতে সুখের নহে, ইহাতে নানান অসুবিধা। যে দিন হইতে মানব জাতির মনে এই অসুবিধা বিষয়ক

জ্ঞান জন্মে, সেই দিন হইতে তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা হইতে থাকে। তখন ইহাতে কেবল মাত্র উপস্থিত অভাব পূরণ করিয়া তাহাদের মন সন্তোষ লাভ করিতে পারে না; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে ব্যাকুল হয়। অভাব সৃষ্টি করা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অভাব হইতেই আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই তাহা পরিপূরণের চেষ্টা আপনা হইতেই করিতে হয়। সেই সঙ্গে অনুসন্ধান চলিতে থাকে, এইরূপে ক্রমশ মানবসমাজ উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়।

শস্য সংগ্রহের জন্যই কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রে জঠর জ্বালা নিবারণের উপায় তবে সভ্যতা রক্ষার অন্যান্য আয়োজন। যাহা না হইলে একদিনও জীবন রক্ষা হয় না এমন সামগ্রী যে অত্যাবশ্যকীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করি, শরীরের সুখ নাই, অসুখ নাই, হাহা ধাধা করিয়া এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াই, পরের মনযোগাইয়া দশটাকা উপার্জ্জনের জন্য আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করি, চোরে যে চুরি করে, দস্যু নরহত্যা করে, শঠ প্রতারণা করে, সে কেবল একমুষ্টি অন্নের জন্য। এই যে প্রাণ প্রদ অতি আদরের অন্ন লাভ করিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে? কে না ইহার জন্য দেহ ও মন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়?

কিন্তু সভ্য সমাজে অর্থের সহিত সকল দ্রব্যেরই বিনিময় চলে; অর্থ হইলে সংসারে কোন জিনিষের অভাব থাকেনা। বিনিময় কার্য্য সৌকার্য্যার্থে অর্থ নিতান্ত সুবিধাজনক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আজি কালি জীবনের নিতান্ত

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ধন্যাদি মহাধনের অপেক্ষা প্রয়োজন-সাধক অর্থের আদর অধিক হইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ সভ্যতার একঘেয়ে উন্নতি, এবং সেই উন্নতির জন্য বলবতী পিপাসাকাঙ্ক্ষতা। তাই আমাদের দেশের লোক আজি কালি সভ্যতার অভিমানে ঘোর অভিমানী। তাই আমাদের পিতা পিতামহের অতি সাধের "পাছুড়ি" আমাদের বিছানায়, পরিবার মটাবালাম লেপ বালিশে, গুবাক ছত্র রাখালের মাথায়, রাজদরবারে যাইবার চর্ম্ম চটীকা বাড়ীর ব্যবহারে, হোমের হবি অন্ন ব্যঞ্জনে. তাই আমরা পরপদতায় মাথায় বহিয়া "সরকার বাবু"—কৃষি ব্যবসায়ে চাসা নহি। তাই আমাদের পাড়া গ্রামের ধান্যক্ষেত্র গোচারনের মাঠ, কৃষক সহরের কল কারখানায় দড়িকাটে, তাঁত বোনে, নল্লি পাকায়, আর পাড়া গ্রামের বড় মানুষ টাকা দিয়া চাউল কেনেন। তাই আমরা অনাবৃষ্টির বৎসরে আধ পেটা খাই, অন্নের জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুল, অনাহারে প্রাণ হারাই। বাবু হইব, সহরে থাকিব, নগদ টাকার মুখ দেখিব সকলের ইচ্ছা, কিন্তু অবোধ আমরা ভাবিয়া দেখি নাই কাহার জন্য টাকার আদর! টাকা খাইয়া পেট ভরে না, টাকা পরিয়া অঙ্গ ঢাকে না। সত্যবটে "কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে," কিন্তু বাঘের দুগ্ধ অজন্মা হইলে কোথায় মিলিবে?

সকলেই যদি বাবু হইবার জন্য লালায়িত হইলাম, সকলেই যদি কৃষিক্ষেত্রে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তবে আর দেশের দুর্গতি কিরূপে ঘুচিবে, কিসে আর দেশের লক্ষ্মী শ্রী হইবে! মুসলমানদিগের রাজত্বকালেও আমাদিগের দেশে কৃষিকার্য্যের

এতটা দুরাবস্থা ছিল না, সে সময়ে দাসত্বের এত আদর ছিল না, দেশের অধিকাংশ লোকেই কৃষিকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, অন্য উপায় ছিল না। দেশের প্রকৃত ধন শস্যাদি প্রচুর জন্মিত, ব্যয়বাদে যাহা থাকিত তাহাও সুপ্রচুর। টাকা পয়সা এত অধিক ছিল না। এই জন্যই সমস্ত দ্রব্য শস্তা ছিল। বাণিজ্যকুশল ইংরেজ জাতি টাকা পয়সা দেখাইয়া দেশের প্রকৃত ধন গ্রহণে লাভবান হইতে লাগিলেন। তখন আমাদের প্রকৃত ধনের কাঙ্গাল না হইলেও টাকার কাঙ্গাল ছিল। ইংরেজ বণিককে শস্যাদি বিক্রয়ে টাকা, তাঁহাদের চাকরীতে টাকা দেখিয়া দেশের লোক টাকার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এখন আর দেশে চাসী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ফসল জন্মেনা, দেশ রক্ষা ভার হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোকের একঘেয়ে প্রবৃত্তির দোষেই এই মহান অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে আমাদের দেশের লোক যদি প্রকৃত গুণগ্রাহী হইত, তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের এতটা দুর্দ্দশা ঘটিত না। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ আদর আছে। সে দেশের অধিকাংশ কৃষকই বিদ্বান ও জ্ঞানবান। বিদ্যার প্রকৃত মাহাত্ম কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। সুশিক্ষিত হইয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই সকল কাম হইতে পারা যায়। সে দেশের কৃষক অপনাকে চাকর অপেক্ষা চাসী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন। তাঁহারা কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ ধনবান হইয়া সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন মুণি ঋষিরাও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহারা স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ ও আপ-

নাপন আশ্রমে বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন করিতেন। বচিত্র তীর্থ-স্থান কুরুক্ষেত্র নামক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মহারাজ কুরু স্বহস্তে চাস করিতেন। প্রাচীন ভারতে কৃষি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল। ভারতের মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা; এখানকার মৃত্তিকায় বীজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ লতিকাদি উৎপন্ন করে। এজন্য বিদেশীয়রা ভারতভূমিকে সমস্ত পৃথিবীর উদ্যান বলিয়া বর্ণন করেন। ভারতীয় অর্য্যগণ ভারতের সেই ঈশ্বরদত্তা শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানিতেন, কৃষিকার্য্যেকে তাঁহারা ঘৃণা করিয়া চাসার কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না, তাঁহাদের উদ্যমেই ভারতভূমির স্বর্ণপ্রসবিনী নাম বজায় হইয়া ছিল।

অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্ন মন্নং সর্ব্বনার্থ সাধকং।
দেবাসুর মনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ॥
অন্নন্ত ধান্যসম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যা বিনা ন চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥
কৃষির্ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদি দোষযুক্তোঽপি মুচ্যঽতিথি পূজনাৎ॥

অন্ন প্রাণের বল, সর্ব্বার্থ সাধক, দেবাসুর মনুষ্য সকলেই অন্নোপজীবী। অন্ন ধান্য হইতে উৎপন্ন হয়; ধান্য কৃষিকার্য্য ব্যতীত জন্মেনা, এজন্য সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া যত্নে কৃষিকার্য্য করিবে।

কৃষি জন্তুর জীবনস্বরূপ। হিংসাদি দোষযুক্ত ব্যক্তিও অতিথি পূজাদ্বারা পাপমুক্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যগণ কৃষি কার্য্যের এতাধিক সম্মান করিতেন, কিন্তু আধুনিক আর্য্য

সন্তানগণের প্রবৃত্তি অন্যরূপ। তাঁহারা এই মহা কল্যান-কারিণী কৃষির প্রতি হতাদর প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ মনে করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি আছে।

আমাদের দেশের সভ্যতাভিমানী বাবুগণ এতদূর বিলাস-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এমন অপকর্ম্ম নাই যে, বিলাসবাসনা চরিতার্থতার জন্য তাঁহারা তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন। তাঁহাদের সখের বাগান আছে, তাহাতে ফুল ফুটা-ইবার জন্য নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদির আবাদ করা হয়, কিন্তু প্রাণের প্রাণ অন্নগর্ভ ধান্য জন্মিতে দিলে বাগানের বাহার যাইবে, অতএব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। সৌভাগ্যের বিষয় বিলাস-চ্ছলে বাবুদের বাগানে আজিকালি নিচু, পীচ, গোলাপজামাদি ফলকর বৃক্ষ প্রবেশ লাভ করিয়াছে পরম লাভের বিষয়। তাহা ইংরজী রুচির অনুকরণ উদ্দেশে, প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নহে। তাই আমাদের দেশবাসীদের কেহ কেহ নীলের চাস করেন, চাবাগানের দিকেও অগ্রসর হইতেছেন। শস্যের ব্যয়সায়ে ইংরেজ বিশেষ লাভবান হইতেছেন, এজন্য এদেশে তাঁহাদের কেহ ধান্যাদির আবাদ করিতেছেন না, তাই আমাদের দেশের লোক এখনও সেদিকে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্তু যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া ইংরেজের কৃষিপ্রবৃত্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই কৃষিকার্য্যের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। তাহাহইলে কি হয়, তাঁহাদের অর্থাভাব, দেশের ধনবান লোকের কয় জন তাহা অবগত আছেন? দুই একজন থাকিলেও তাঁহারা তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃষির আদর বিলক্ষণ বুঝিতেন, চাকরী, কৃষি ও সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনে তিনি সুখে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বেশ দশটাকা হাতে করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী বাগান এবং কতক গুলি শস্যক্ষেত্র ছিল। যেরূপে তিনি সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংক্ষেপে আমারা সে গুলি লিপিবদ্ধ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষিকার্য্যের অঙ্গ।

১। ভূমিতে বীজ বপন করিলে জল, বায়ু এবং উত্তাপের পরিমাণানুসারে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া চারা জন্মে। যে উদ্ভিদের যে প্রকার স্বভাব, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতির সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। স্বভাবের বিপরীত ব্যবস্থা হইলে কখনই বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব উদ্ভিদগণের স্বভাব পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

২। বায়ু এবং উত্তাপের ন্যূনাধিক্য যেমন অঙ্কুরোৎপাদ-

নর পক্ষে বিঘ্নজনক, চারার পক্ষেও সেইরূপ অনিষ্টকর। অর্থাৎ চারার স্বভাব অপেক্ষা তাহাতে বায়ু বা উত্তাপের ন্যূনতা বা আধিক্য ঘটিলে তাহার পত্র পাণ্ডুবর্ণ, পল্লব ক্ষুদ্র, শাখা শুষ্ক ও তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া থাকে।

৩। নীরস ও তপ্ত ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা কখন অঙ্কুরিত হয় না।

৪। বীজ অতি ক্ষুদ্র হইলে বপন করিবার সময়ে তাহার উপর অতি অল্প মৃত্তিকা চাপা দেওয়া উচিত। নতুবা অঙ্কুরোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে। বীজ বড় হইলে কিছু অধিক মৃত্তিকা চাপা দিলেও ক্ষতি হয় না।

৫। যে সকল বীজ অধিক জল বায়ু সহ্য করিতে পারে। তাহাদিগকে বর্ষাকালে এবং যাহারা অধিক জল লাগিয়া পচিয়া যায় তাহাদিগকে শীত কালে বপন করা কর্ত্তব্য।

৬। পুরাতন বীজ মাত্রেই চুনের জলে ভিজাইয়া কিম্বা অগ্রে সুদ্ধু জলে ভিজাইয়া পরে ঘুঁটেরছাইসংযুক্ত করিয়া রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

৭। বীজ বপন ও চারা রোপন করিবার পূর্ব্বে ভূমিতে চাস দিয়া উত্তমরূপে মাটির পাটি করা উচিত।

৮। উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রে সার দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সামান্য কৃষির পক্ষে খোইল ও গোবরের সারাই যথেষ্ট।

৯। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র খনন করিয়া সার ছড়াইতে হয়। যে সকল উদ্ভিদ সমস্ত বৎসর জীবিত থাকে তাহাদের চাস করিতে হইলে ক্ষেত্রে তিন বার সার দেওয়া

উচিত। প্রথমতঃ চারা রোপনের পূর্ব্বে চাস দিবার পর এক বার, দ্বিতীয়তঃ চারা রোপণ সময়ে একবার, তৃতীয়তঃ চারা বড় হইলে আর এক বার।

১০। বর্ষাকালে সার দিলে তাহা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়, সুতরাং সে সার দেওয়ায় না দেওয়ায় সমান। এজন্য মাঘ ফাল্গুন মাসে চারার মূলে সার দেওয়া কর্ত্তব্য।

১১। সার দিতে হইলে কেবল মূলে না দিয়া, তাহার চারি দিকে কিয়দ্দূরের মৃত্তিকায় দেওয়া উচিত।

১২। কোন চারার মূলে টাটকা গোময় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গোময় পচিলে তহাতে উত্তম সার হয়।

১৩। ফলকর বৃক্ষের মূলে উহার মুকুল হইবার পূর্ব্বে সার দিয়া মূলস্থ মৃত্তিকা সরস রাখিতে পারিলে এবং পরে ফল হইলে সেই ফল বান্ধিয়া রোদ না লাগিতে পায় এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে তাহা বড় হয়।

১৪। গোরু ও ঘোড়ার মল বিকৃত হইয়া মাটী হইলে তাহাকে ফাসমাটী বলে। কৃষি মাত্রেই ফাসমাটি উপকারী, ইহাতে ক্ষেত্রের বিশেষ উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে।

১৫। ঘন ঘাসযুক্ত স্থানের চাপড়া কাটিয়া স্তূপাকারে রাখিলে সেই স্তূপের শুষ্কাবস্থা উত্তম উর্ব্বরা মৃত্তিকা মধ্যে গণনীয় হয়।

১৬। নদী বা খালের ধারে যে পলি পড়ে, তাহার উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক।

১৭। অনুৎপাদক ভূমির মৃত্তিকা খনন করিয়া পোড়াইলে অনেক উপকার দর্শে। চিক্কণ মৃত্তিকা রীতিমত পোড়াইলে

তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়; এই কারণ বশতঃ এদেশীয় কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রের ধান কাটা হইলে নাড়ায় অগ্নি ক্ষেত্রের মৃত্তিকা দিয়া পোড়াইয়া থাকে।

১৮। প্রাচীন দেওয়ালের মৃত্তিকা ক্ষেত্রে দিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

১৯। এক ভূমিতে এক জাতীয় শস্য ক্রমাগত জন্মিলে তাহার উর্ব্বরতা নষ্ট হয়। এজন্য সময়ে সময়ে ভূমিতে ভিন্ন জাতীয় শস্য ও সার দেওয়া কর্ত্তব্য।

২০। বায়ুর সংস্রবে মৃত্তিকা শোধিত হয়। এনিমিত্ত বর্ষান্তে অর্থাৎ কার্ত্তিকাদি মাসে অথবা গ্রীষ্ম কালে একবার, ও বৃষ্টিপাত হইলে আর একবার মৃত্তিকা খনন করিয়া উল্টাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

২১। চারা জন্মিলে মধ্যে মধ্যে চারার মূলস্থ মৃত্তিকা অল্‌গা করিয়া দেওয়া উচিত।

২২। স্বভাবানুসারে যে ঋতু যে প্রকার উদ্ভিজ্জের জন্মকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঋতুতে সেই উদ্ভিজ্জ উৎপাদন নিমিত্ত যত্ন পাওয়া উচিত; অন্যায় যত্ন সফল হয় না। বর্ষায় ফসল হইলে বর্ষার পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং রবি ফসল হইলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে চাস দিয়া বীজ বপন করা উচিত।

২৩। চারার মূলে মৃত্তিকা সরস রাখিবার নিমিত্ত জল সেচন আবশ্যক।

২৪। বৃষ্টির জল কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যে স্থানে কিয়ৎকাল থাকিয়া তবে নিম্নদিকে যায়, পলি পড়িয়া সেই

স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত তেজস্বী হয়। সুতরাং তথায় উদ্ভিজ্জ সকল শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

২৫। নদী তীরস্থ ভূমি নিয়ত স্রোতে প্লাবিত হইলে তাহাতে কোন চারা জন্মিতে পারে না, এজন্য সেরূপ স্থানে বাঁধ বান্ধিয়া বন্যা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

২৬। যে দেশে যে গাছ জন্মে সেই গাছ অন্য দেশে রোপণ করিতে হইলে তাহার জন্ম স্থানের উত্তাপের সহিত সেই স্থানের উত্তাপের সামঞ্জস্য রাখা উচিত।

২৭। ছায়া দ্বারা চারা জন্মিবার উপযুক্ত উত্তাপের অল্পতা ঘটিলে ফুল ও ফল উৎপদনের বিঘ্ন হয়। এজন্য উপযুক্ত উত্তাপ রক্ষা করা আবশ্যক।

২৮। চারা বড় হইবার সময় মৃত্তিকা সরস রাখা উচিত।

২৯। মৃত্তিকার নিম্নে ইষ্টক নির্ম্মিত কোন পদার্থ থাকিলে সেই স্থান সদা শুষ্ক থাকে। সুতরাং সেরূপ স্থানে চারা রোপন কর্ত্তব্য নহে; করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়।

৩০। চারা রোপণ করিবার সময়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যেন মূলের উপরের অংশ কোন মতে প্রোথিত না হয়।

৩১। কোন কারণে বৃক্ষের ফল জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটিলে, সেই বৃক্ষের শাখা কিম্বা চোকের সহিত তজ্জাতীয় চারার কলম করিলেই অবশ্য ফল ইহবে।

৩২। চারা রোপণ সময়ে একটী হইতে অন্যটীকে উপযুক্ত দূরে রোপণ করা উচিত। কারণ ঘণ করিয়া পুতিলে তাহারা যখন বড় হয়, তখন একটী আর একটীর উপরে পড়িয়া তাহার বৃদ্ধি হানি করে, এরূপ হইলে ফলও ভাল রূপ জন্মে না।

৩৩। বড় গাছের চারা সকল পরস্পর ২০ হাত অন্তরে রোপণ করাই যুক্তিযুক্ত। অভাবে ১৬ হাত, তাহাতে না হয় তবে ১২ হাতের কম দূরে না হয়।

জল সিঞ্চন প্রণালী।—উদ্ভিজ্জদিগের পরিবর্দ্ধনার্থ জল অতি আবশ্যকীয়। জলহীন ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ সমূহের উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। তথায় বীজ অঙ্কুরিত হইতে পায় না, কদাচিৎ হইলে রসের অভাবে বৃদ্ধি হয় না। উষ্ণ প্রধান দেশের বালুকাময় নীরস ক্ষেত্রে এরূপ হয় যে, বর্ষা-কালে উদ্ভিদ জন্মে, কিন্তু বর্ষার শেষে অথবা সঞ্চিত জল শুকাইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ ও শুষ্ক হইয়া যায়; অতএব জল না পাইলে উদ্ভিদ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেনা। স্বভাবতঃ সরস ভূমিতে জলের অভাব দেখিলে শস্যা-দির উৎপত্তি বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। উর্ব্বরতা প্রধান ভারতে এমত কতস্থান আছে, যেখানে অপরিমিত শস্য জন্মিতে পারে, কিন্তু জল প্রাপ্তির তাদৃশ উপায় না থাকায় মরুভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে; যদিকোন উপায়ে সেই সকল স্থানে জল সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই অনুর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া এত শস্য জন্মে যে, তাহাতে রমণীয় উদ্যানের শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। ফলতঃ জলই উদ্ভিজ্জের জীবন, এই নিমিত্ত যে দেশে তাদৃশ বর্ষা না হয়, অথবা ক্ষেত্রে জল দিবার তাদৃশ নৈসর্গিকউপায় নাই, সে দেশের অধিবাসিগণ অতি পূর্ব্ব কাল হইতে তাহার প্রতিবিধান জন্য কৃত্রিম প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

শাক্ সবজি বা পুষ্পোদ্যানে প্রচুর জল দিয়া ক্ষেত্রকে একবারে প্লাবিত করা নিতান্ত হানিজনক। ঐরূপ ক্ষেত্রে বোমা বা তদ্রূপ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র জল পূর্ণ করিয়া ক্ষীণ ধারায় জল

সেচন করিতে হয়। প্রবল ধারায় জল দিলে, চারার মূলে গর্ত্ত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। শস্যক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া অধিক জল সেচন করিলে, সেই জলে বীজ মাটীর অধিক নীচে পড়ে ও জলের পরিমাণ ঠিক না হওয়াতে বীজের অত্যন্ত হানি হয়, এমন কি তাহাতে বীজ পচিয়া একেবারে নষ্ট হইয়াও যাইতে পারে। অতএব বীজ বপনের পর অধিক জল সিঞ্চন অকর্ত্তব্য; কেবল অঙ্কুর বাহির হইবার উপযুক্ত জল দিলেই যথেষ্ট হয়। বীজের অঙ্কুর এবং শিকড় বাহির হইলে সেই সকল শিকড় যেমন অল্পে অল্পে মাটীর নীচে প্রবেশ করে, সেইরূপ হিসাবে অল্প ২ মাটী ভিজাইয়া জল দিতে হয়। অবার আবশ্যক মত জল না পাইলেও বীজ শুষ্ক হইয়া যায় ও তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। চারা জন্মাইবার জন্য গাম্‌লায় বীজ বপন করিলে, তাহাতে দূর্ব্বার আটিভিজাইয়া জলের ছিটা দেওয়া উত্তম। বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষের চারার মূলে আলবাল্ অর্থাৎ আল বান্ধিয়া জল সেচন করা যায়। জল সেচন অপরাহ্ণে কর্ত্তব্য। রৌদ্রের সময় জল সেচন করিলে চারার পক্ষে বিলক্ষণ হানি হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতি দিবস প্রাতে ও অপরাহ্ণে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে চারর মূলস্থ মৃত্তিকা সরস থাকিলে জল সেচন আবশ্যক হয় না। শীতকালে সায়ংসময়ে জল সিঞ্চন করিতে হয়।

মৃত্তিকা পরীক্ষা।—মৃত্তিকা পরীক্ষা কৃষিকার্য্যের একটী প্রধান বিষয়। উদ্ভিদ্‌দিগের স্বভাবানুসারে মৃত্তিকা পছন্দ করিতে না পারিলে সমুদয় পরিশ্রম বিফল হয়। কিন্তু প্রকৃতরূপ পরীক্ষা দ্বারা মৃত্তিকা বাছিয়া লওয়া কঠিন কাজ। উহাতে

রসায়ন বিদ্যার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেরূপ সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিতে সাধারণে সমর্থ নহে। আর তাহার অনুষ্ঠানও বড় গুরুতর। অতএব সামান্যতঃ যে প্রকারে মৃত্তিকা পরীক্ষা হইতে পারে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

মৃত্তিকা দুই প্রকার, চিক্কণ অর্থাৎ এঁটেল এবং বালি। যে মাটী ভিজাইলে সহজে শুকায় না এবং টিপিলে অঙ্গুলিতে সংলগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে চিক্কণ মৃত্তিকা বা এঁটেল মাটী কহে। আর যে মাটী শীঘ্র শুকাইয়া যায় এবং টীপিলে অঙ্গুলিতে লাগে না, তাহাকে বালি মাটী বলে।

খাঁটী এঁটেলে বা খাঁটী বেলে মাটীতে প্রায় কোন বৃক্ষ জন্মে না। এই উভয়বিধ মৃত্তিকার সংযোগ এবং ইহাদের সহিত অন্যান্য পদার্থের মিশ্রনে অতি কোমল ও হালকা নানা প্রকার মিশ্রিত মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত এই মিশ্রিত মৃত্তিকাই অতি উত্তম। তবে স্বভাবানুসারে কোন জাতিয় উদ্ভিদের পক্ষে চিক্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, কোন কোন জাতির পক্ষে বালির ভাগ অধিক, এবং কোন জাতির পক্ষে উভয়ের সমান ভাগ থাকা আবশ্যক। যে সকল বৃক্ষের শাখাবিশিষ্ট-মূল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের জন্য এঁটেল মাটীর ভাগ অধিক থাকে এরূপ ক্ষেত্র উপযোগী। যথা—আম গাছ নিচু গাছ ইত্যাদি। যে সকল উদ্ভিদের ফল ও গুঁড়িতে জলের অংশ অধিক, তাহাদের চাষে বালির অংশ অধিক থাকে এরূপ মৃত্তিকা উপযুক্ত। যেমন ফুটী, শসা, তর্ম্মুজ ইত্যাদি। অপর যে সকল উদ্ভিদের গুঁড়ি মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং যাহাদের মূল কোমল ও সরস তাহাদের

পক্ষে উক্ত উভয়বিধ মৃত্তিকার ভাগ সমান থাকিলে উপযুক্ত হয়, যথা,—আলু মূলা ইত্যাদি।

ভূমিতে চিক্কণ মৃত্তিকার কি বালির ভাগ অধিক আছে তাহা নিরূপণ কৃষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে জল দিলে যদি কঠিন চাপ বান্ধে, তাহাহইলে তাহাতে চিক্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, আর তাহা না হইলে বালির ভাগ অধিক আছে বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে উভয়ে কিরূপ ভাগে মিশ্রিত তাহা জানা যায় না। ঐ ভাগের পরিমাণ ঠিক করা বড় কঠিন বিষয়। মনে কর তোমার এমন মৃত্তিকা আবশ্যক যাহাতে তিন অংশ চিক্কণ মৃত্তিকা ও এক অংশ বালি মিশ্রিত থাকিবে। কিন্তু তুমি যে স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতেছ, তাহাতে চিকণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক আছে, এরূপ ঠিক করিলে; কত অধিক আছে? তোমার প্রার্থিত তিন অংশ আছে, কি কম আছে তাহা তুমি কিরূপে জানিবে? ফলতঃ যাঁহারা অনেক বার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবিষয়ে অনুমান তাঁহাদেরই সূক্ষ্ম হয়, নূতন লোকের পক্ষে বড় গোল। যত কার্য্য করা যাইবে এবিষয়ে ততই সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মিবে। যাহা হউক পরীক্ষা দ্বারা যতদূর পারা যায় তাহার উপায় এই,—প্রথমতঃ যে স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই স্থান হইতে কিয়দংশ শুষ্ক মৃত্তিকা আনিয়া ওজন করিবে। পরে তাহাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া, সেই পোড়া মত্তিকা কোন পাত্র মধ্যে জলে গুলিবে। এরূপ করাতে চিক্কণ মত্তিকার অংশ জলের সহিত মিশ্রিত হইবে, এবং বালির অংশ পাত্রের তলায়

পড়িবে। তাহার পর ঐ ঘোলা জল আস্তে২ ফেলিয়া দিয়া, তলার সমস্ত বালি শুষ্ককরিয়া ওজন করিলে, ঐ মৃত্তিকায় কি পরিমাণে বালি ও চিক্কণ মৃত্তিকা মিশ্রিত ছিল তাহা জানা যাইবে। আর পোড়াইয়া ওজন করায়, পূর্ব্ব পরিমাণাপেক্ষা যত কম হইবে, তাহাতে সারের অংশ তত ছিল বিবেচনা করিতে হইবে। মৃত্তিকায় প্রাণি-সার মিশ্রিত থাকিলে পোড়াইবার সময় দুর্গন্ধ বাহির হয়, কিন্তু উদ্ভিজ্জসার থাকিলে তদ্রূপ কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। উল্লিখিত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া ঐ স্থানের মৃত্তিকায় বাঞ্ছিত অপেক্ষা চিক্কণ মৃত্তিকার অংশ কম দৃষ্ট হইলে, অন্য স্থান হইতে কিক্কণ মৃত্তিকা, এবং বালির অংশ কম দৃষ্ট হইলে বালুকা আনিয়া মিশ্রিত করিবে। অপর কোন স্থানের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সামান্যরূপে জানিবার ইচ্ছা হইলে, প্রথমতঃ তথায় যে সকল তৃণাদি উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের বৃদ্ধিশীলতা সন্তোষজনক কি না দেখিবে, কারণ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, স্বভাবতঃ উর্ব্বরা মৃত্তিকা না পাইলে কখন বলবান হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্ষেত্রের কিয়দংশ অত্যন্ত শুষ্ক মৃত্তিকা ও কিছু ভিজা মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেখিবে। যদি শুষ্কাংশ সাতিশয় কঠিন হয় এবং ভিজা অংশ অঙ্গুলিতে এমত জড়াইয়া যায় যে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে বিশেষ যত্ন পাইতে হয়, তবে সে মৃত্তিকা নিতান্ত অনুর্ব্বরা, তাহাতে কৃষিকার্য্য কদাচ উত্তম হইবে না। কিন্তু যদি মৃত্তিকাতে কিঞ্চিন্মাত্র আঠার সঞ্চার থাকে, অথচ অঙ্গুলিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন না হয়, তাহাহইলে সেই মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা বিবেচনা করিতে হইবে।

সার।—কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত সার অতি আবশ্যকীয়। ইহার সংযোগে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জের স্বভাব ও চারার অবস্থা বিবেচনা করিয়া সার দিতে না পারিলে কখন কখন হানিজনকও হইয়া থাকে। যেমন মটরের পক্ষে ইহা হিতকারী না হইয়া বরং অনিষ্টকারী হয়। আবার কপিজাতীয় উদ্ভিজ্জ, সার ভিন্ন কখন বাঁচিতে পারে না।

সার নানা প্রকার, তন্মধ্যে এদেশে উদ্ভিজ্জ-সার, প্রাণি-সার, এবং মিশ্রিত-সার এই তিন প্রকার সার প্রচলিত আছে। ধাতু-সার প্রধান বটে, কিন্তু সার দেওয়ার উপযুক্ত ধাতু এদেশে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও চূণ পাওয়া যায় কিন্তু এই বঙ্গ-দেশের মৃত্তিকায় বালির অংশ অধিক থাকাতে এদেশে চূণ প্রায় সার ব্যবহৃত হয় না। অতএব উক্তবিধ সারের বিষয় পরিত্যক্ত হইল।

উদ্ভিজ্জসার।—গছের ডাল পালা প্রভৃতি পচিয়া অতি তেজস্কর সার হয়। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে লতা, পাতা, ডাল প্রভৃতি একত্র করিয়া অল্প জলবিশিষ্ট কোন গর্ত্তে ফেলিয়া রাখিবে। তথায় ১২।১৩ মাস পচিলে ঐ সকল সার-রূপে পরিণত হয়। কিন্তু জল অধিক থাকিলে শীঘ্র পচিবে না।

এইরূপ সারের একটী দোষ এই যে, উহা চারার মূলে প্রদান করিলে এক প্রকার কীট জন্মিয়া কখন কখন চারার শিকড় কাটিয়া ফেলে।

যত প্রকার উদ্ভিজ্জ-সার আছে, তাহাদের মধ্যে খোইল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। খোইল সংযোগে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-

শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। সাম্বৎসরিক চারার পক্ষে খোইল বিশেষ উপকারী; কিন্তু অতিরিক্ত হইলে ইহাদ্বারা চারার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রতি বিঘায় এক মন খোইল ছড়াইলেই যথেষ্ট হয়। খোইল ছড়াইতে হইলে, প্রথমতঃ উহাকে গুঁড়া করিবে, পরে ঐ গুঁড়ার সহিত ঘুঁটের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া চাস দেওয়া ভূমিতে ছড়াইয়া দিবে। তাহার পর যাহাতে খোইল কেবল মাত্র চাপা পড়ে, এরূপ ভাবে চাস দিয়া জল দিয়া মৃত্তিকা ভিজাইয়া দিবে। কয়েক দিন পরে পুনর্ব্বার কিছু খোইল ছড়াইয়া চারা রোপণ করিবে। চারা বড় হইলে আর একবার খোইল দেওয়া আবশ্যক। সর্ষপ, মসিনা, তিল, ভেরণ্ডা প্রভৃতির খোইল উৎকৃষ্ট। খোইলসারে উদ্ভিদ সমূহের ফল বড় হয়। নীল কুঠির চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া যায় তাহাও উত্তম সারমধ্যে গণ্য।

প্রাণিসার।—প্রাণিদিগের চর্ম্ম, মাংস, শোণিত, অস্থি, শৃঙ্গ, নখ প্রভৃতি পচিয়া উত্তম সার প্রস্তুত হয়। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে, মৃত জন্তুর শরীর মৃত্তিকা গর্ত্তে ফেলিয়া, তদুপরি চূণ ছড়াইয়া দিবে। পরে মাটি চাপা দিয়া দুই মাস তদবস্থায় রাখিবে। অনন্তর তাহা তুলিয়া দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য পুনর্ব্বার চূণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে।

প্রাণিদিগের অস্থি চূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত থাকে। কিন্তু অস্থিগুলি অত্যন্ত চূর্ণ হইলে প্রথম বৎসরেই অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়, তৎপরে উহার আর সেরূপ তেজ থাকে না। অতএব অস্থি চূর্ণ করিবার সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত না

করিয়া কিছু স্থূল খণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। ইহার সংযোগে মৃত্তিকা অত্যন্ত আলগা থাকে। শৃঙ্গের গুঁড়া অস্থিচূর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ আলগা ও উত্তাপিত, প্রাণি-সার তাহার পক্ষেই বিশেষ উপকারী কিন্তু যে ক্ষেত্রে চিক্কণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক, তাহাতে এই সার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে না দিলে উপকার দর্শে না।

মিশ্রসার।—উদ্ভিজ্জ-সার, প্রাণি-সার এবং ধাতু-সার এই ত্রিবিধ সার মিশ্রণে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকে মিশ্রসার বলা যায়। আমাদের দেশে গো, মেষ, মহিষ, ঘোটক, গর্দ্দভ, শূকর, কপোত এবং কুক্কুট প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর বিষ্ঠা মিশ্রসারের মধ্যে প্রধানরূপে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে গোময় ও অশ্ববিষ্ঠাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহা পুরাতন ও পচা হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ ছয় মাস না পচিলে সার ভাল হয় না। এই সার ক্ষেত্রে ছড়াইবার পূর্ব্বে ভূমি চষিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে ও তাহাতে মোই দিবে। গামলায় যে সকল চারা জন্মান যায়, তাহাদের মূলে এই সার দিলে তাহারা শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হয়। গোমূত্র পচাইয়া তাহাতে খোইলের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট মিশ্র-সার প্রস্তুত হয়।

বাগানের ও ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রস্তুতের নিয়ম।—আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য মৃত্তিকা প্রস্তুত করিবার বিষয়ে বড় অযত্ন দেখা যায়। সাধারণতঃ আমাদের দেশের কৃষকেরা কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতেই বীজ বপন বা চারা রোপণ করিয়া থাকে। ইহাতে ফসল ভাল জন্মে না। মন্দ জমিতেও ভাল চারা রোপণ

করিলেও নিস্তেজ হইয়া পড়ে,সুতরাং তাহার ফল পূর্ব্বমত হইতে পারিবে না।

অতএব যাঁহারা অধিক পরিমাণে ও আকারে বড় ফল পাইতে ইচ্ছা করেন, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রস্তত করিবার বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। চা খড়ি, কাদা, বালি এবং উদ্ভিজ্জ-সার, এই সকল পদার্থ সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া যে উদ্যানের মৃত্তিকা প্রস্তত হয়, তাহাতে শাকসব্জি ইত্যাদি প্রভূত জন্মিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জদিগের কাণ্ড মোটা ও বড় করিতে হইলে উদ্ভিজ্জসার বিশেষ হিতকারী। বিশেষতঃ কপি, কুলকপি প্রভৃতি বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ যে ক্ষেত্রে জন্মাইতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জসার অধিক দেওয়া উচিত, নতুবা উপযুক্ত পুষ্টিকর রস সঞ্চিত থাকে এমত স্থান দুর্ল্লভ।

মৃত্তিকা খনন করা ও সার দেওয়ার বিষয়।—ক্ষেত্র খনন বিষয়ে ভিন্ন ২ দেশের মৃত্তিকার অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অবধারিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা গিয়া থাকে তাহাই নিম্নে লিখিত হইল। বীজ বপন করিবার নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে ভূমিতে সার দিয়া লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিবে, এবং জল যাইবার নিমিত্ত চারিদিকে পয়নালা রাখিবে। অগ্রে জমী প্রস্তত না করিয়া যাঁহারা বীজ বপনের সময় ক্ষেত্র খনন আরম্ভ করেন, ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের জমী ভাল পাইট হয় না, হয়ত সময়মত বীজ বপনও ঘটিয়া উঠে না।

উদ্যানের জমিতেও বৈশাখ মাসের শেষে কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে সার দেওয়া আবশ্যক। সার দিবার নিমিত্ত

প্রথমে ১৪।১৫ আঙ্গুল গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া জমি প্রস্তুত করিবে। জমিতে যদি জুলি করিতে হয়, তাহা হইলে।০ সোয়া-হাত গভীর করিয়া জুলি কাটিবে। যে জমিতে অধিক কাল ফসল থাকে, তাহাতে জুলি কাটিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ঐ জুলি কাটিবার নিয়ম এই,—জমীর একপার্শ্বে দুই বা আড়াই হাত চৌড়া করিয়া জমির দৈর্ঘ্য যতদূর ততদূর পর্য্যন্ত প্রথমতঃ একটী জুলি কাটিবে, তাহার পর সেই জুলির পার্শ্বে আবার ঐরূপ জুলি কাটিয়া তাহার মৃত্তিকা দিয়া প্রথমের জুলি পূর্ণ করিবে। এই প্রকারে সকল জমিতে জুলি কাটা হইলে, জমীর উপরের মাটী প্রত্যেক জুলির নীচে, এবং নীচের মাটী জমির উপরে পড়িবে। তাহাতে সমুদায় জমীর উপরিভাগ নূতন মৃত্তিকাবিশিষ্ট হইবে। ঐ নূতন মৃত্তিকা চাসের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

যে জমিতে শাক্ সবজি রোপণ আবশ্যক হয়, সেই জমীও ঐরূপে জুলি কাটিয়া প্রস্তুত করিলে অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়। জমি খুঁড়িয়া বা জুলি কাটিয়া মাটী সমান করা হইলে তাহার উপর সার ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর সার একেবারে মৃত্তিকার উপরও না থাকে এবং অধিক মৃত্তিকার দ্বারা ঢাকাও না পড়ে, এই অভিপ্রায়ে অল্প গভীর করিয়া আর একবার খুঁড়িয়া দিবে। জমিতে সার দিয়া পরে অত্যল্প মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে, সহসা অধিক বৃষ্টি হইলে, ঐ সার জলে গলিয়া তাহার সার-ভাগ জমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। এরূপ হইলে জমি অতিশয় উর্ব্বরা হয়। বর্ষা শেষ হইলে অর্থাৎ ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমে পুনরায় একবার অল্প খুঁড়িয়া মৃত্তিকা

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিবে, অথবা একেবারে চারা পুতিয়া দিবে।

বর্ষার শেষ হইলে যদি জমিতে সার দেওয়া হয়, তাহা হইলে আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত ঐ সার তদবস্থায় থাকে। জমির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হওয়াতে উহাদ্বারা মৃত্তিকা তেজস্কর হইতে পারে না। অপর সার অধিক ভিজা থাকিলে অধিক উপকারক হয়। এজন্য সার দেওয়ার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইতে না পারে, এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলম।

বীজ দ্বারা চারা উৎপন্ন করিলে তাহার ফলের গুণ সেরূপ হয় না, এজন্য কলমে চারা করিয়া ফল ও ফুলের উৎকর্ষসাধন করা হইয়া থাকে। সাত প্রকারে কলম প্রস্তুত হয়। যথা,—(১) গুটিকলম, (২) মাটিকলম, (৪) শাখা-কলম, (৩) যোড়কলম, (৫) চোককলম, (৬) চোঙ্গকলম, (৭) জিহ্বাকলম। কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষ হইতে কলমের চারা হয় না এবং সকল প্রকার কলম প্রস্তুতের প্রণালী সকল বৃক্ষে সমান নয়। বৃক্ষ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কলমের ব্যবস্থা আছে।

গুটিকলম।—গুটিকলম করিতে হইলে কোন শাখার

দুইটী পত্রের মধ্যস্থলে যে পর্ব্ব (পাব) থাকে, তাহার চতুষ্পার্শ্বের ছাল ছুরিদ্বারা কিয়দংশ কাষ্ঠের সহিত তুলিয়া ফেলিবে। পরে পচা পাতার সার, গোময় অথবা খোইল প্রভৃতির সার অল্প মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থানের চারিদিকে দিয়া তদুপরি ছেঁড়া চট অথবা তদ্রূপ অন্য আবরণ বান্ধিয়া দিবে, এবং একটা সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া যাহাতে তাহার ঠিক উপরে সর্ব্বদা বিন্দু ২ জল পতিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। এই প্রকারে দুই কি আড়াই মাস রাখিলেই বন্ধন স্থান হইতে শিকড় বাহির হইবে। তখন অতি সাবধানে ধীরে ২ শাখার যে স্থানে কলম বান্ধা গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগে কাটিয়া রোপণ করিবে। কলম কাটিবার সময় অধিক নাড়া চাড়া লাগিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। উদ্যানে রোপণ করিয়া আতপ নিবারণ জন্য কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত তাহাতে ছায়া করিয়া রাখিতে হয়। লেবু, লিচু, আম, জাম প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এইরূপ কলমে চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস গুটিকলম বান্ধিবার উপযুক্ত সময়।

মাটিকলম।—মাটিকলম গুটিকলমের রূপান্তর মাত্র। ইহাদের পরস্পরের প্রভেদ এই যে, মাটিকলম করিতে হইলে বৃক্ষের ডালকে নত করিয়া মৃত্তিকাপূর্ণ টবে পুতিতে হয়, আর গুটিকলমে বৃক্ষের উপর মাটি তুলিয়া সেই মাটি ডালের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া বান্ধিতে হয়। যে শাখাকে নত করিয়া মাটিকলম করিতে হইবে, তাহার মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার উপযুক্ত অংশে ও মূলভাগে এক পত্র গাঁইট হইতে অপর পত্র গাঁইট পর্য্যন্ত ছুরিকা দ্বারা সমানাংশে চিরিয়া

দিবে। ঐ চেরা অংশদ্বয় পুনরায় সংযুক্ত হইয়া না যায়, এ নিমিত্ত চেরার মধ্যস্থলে কোঞ্চি বা কাষ্ঠ দিয়া মৃত্তিকায় এমত দৃঢ়রূপে প্রোথিত রাখিতে হইবে যে, শাখা কোন প্রকারে তথা হইতে উঠিতে না পারে। শাখার নির্দ্দিষ্টাংশ না চিরিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বের ছাল কিছু কাষ্ঠের সহিত তুলিয়া মৃত্তিকায় পুতিলেও হয়। অনন্তর তিন চারি মাস তদবস্থায় রাখিয়া মধ্যে ২ জল দিলে উহা হইতে শিকড় বাহির হইবে, তখন সাবধান পূর্ব্বক ক্রমে ২ শাখা হইতে উহাকে ছেদন করিয়া লইয়া উদ্যানে রোপণ করিবে। বৈশাখ মাস এই কলম করিবার উপযুক্ত সময়।

যোড়কলম।—এরূপ অনেক বৃক্ষ আছে যে, মাটি ও গুটিকলমে তাহাদের চারা অতি কষ্টে প্রস্তুত হয়, কিন্তু যোড়কলমে অনায়াসে তাহাদের চারা জন্মান যায়। এজন্য মালিরা কেবল যোড় কলম দ্বারাই সেই সকল বৃক্ষের চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই কলম করিতে হইলে অগ্রে গাম্‌লায় বীজ রোপণ পূর্ব্বক একটী চারা জন্মাইতে হয়। ঐ চারা উত্তমরূপ পরিপুষ্ট হইলে যে বৃক্ষে কলম করিতে হইবে, তাহার এমন একটী শাখা বাছিয়া লওয়া আবশ্যক যে, সেই শাখার স্থূলতা চারার ডাঁটার ন্যায় হয়। চারার ডাঁটা অপেক্ষা শাখার স্থূলতা অধিক হইলে যোড় লাগিতে পারে, কিন্তু পরে চারার সরু ডাঁটা মোটা শাখার উপযুক্ত রস যোগাইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। শাখা অপেক্ষা চারার ডাঁটা কিঞ্চিৎ স্থূল ও সতেজ হইলে কোন হানি হয় না, বরং কলম ভাল হয়।

চারা ও শাখা উভয়ের যে যে অংশ জুড়িতে হইবে, সেই

সেই অংশ হইতে অন্যূন চারি অঙ্গুলি দীর্ঘে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত ছাল তুলিয়া এরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে যে, জুড়িলে তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে। অনন্তর উভয়ের উক্ত অংশদ্বয়কে পরস্পর মিলিত করিয়া এক গাছি সরু দড়ি দিয়া পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত তদবস্থায় জড়াইয়া রাখিতে হইবে। পরে যখন উভয়ে উত্তমরূপ জোড়া লাগিবে, তখন জোড়ের নিম্ন ভাগে শাখা ও উপরিভাগে চারার মস্তক কাটিয়া ফেলিতে হইবে। চারার মস্তক ছেদন না করিলে চারায় ও শাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল প্রসব করিবে এবং তাহাতে সংলগ্ন শাখা বল করিয়া বাড়িতে পারিবেনা, সুতরাং যোড়কলমের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এই কলম সকল সময়েই বাঁধা যাইতে পারে। শাখা ও চারা ভিন্নজাতীয় হইলে প্রায় যোড়কলম হয় না।

এই কলম বান্ধিবার সময় শাখা ও চারার জোড় মুখের ছাল পরস্পর মিলিত না হইলে শাখা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায় এবং চারার ডাঁটাটিও উপযুক্ত রসাকর্ষণে অসমর্থ হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব কলম করিবার সময় যাহাতে উভয়ের ছাল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, সেজন্য সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে।

অন্য চারা না পাওয়া গেলে এক জাতীয় দুই বৃক্ষের শাখায় শাখায়ও পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রক্রিয়ায় জোড় লাগান যাইতে পারে, কিন্তু উহা সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় না। আম, জাম, লিচু প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে।

শাখাকলম—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বীজ হইতে উৎপন্ন

চারার ফলের স্বাদ বৈলক্ষণ্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অর্থাৎ যে ফলের বীজ হইতে চারা জন্মান যায়, সেই ফলের যে প্রকার আস্বাদ তাহার প্রায় সে প্রকার হয় না। এজন্য লোকে কৌশলপূর্ব্বক বৃক্ষের শাখাদ্বারা চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শাখাদ্বারা চারা প্রস্তুত করিবার তিন প্রকার কৌশল উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে আর এক প্রকারের কথা লিখিত হইতেছে। এরূপ কলমকে শাখা কলম বলে। শাখাকলমজাত ফলের স্বাদের বৈলক্ষণ্য প্রায়ই ঘটেনা; কিন্তু সকল গাছের শাখাকলম হয় না।

এই কলম প্রস্তুত করিতে হইলে চারি হাত লম্বা, দুই হাত প্রস্থ ও পাঁচ পোয়া উচ্চ একটী ইষ্টক নির্ম্মিত চৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ চৌকা এমন স্থলে করা উচিত যে, তাহার উপর কোন প্রকার আচ্ছাদন না থাকে। প্রথমে ঝামা, ইট ভাঙ্গা অথবা খোলাকুচা দিয়া ঐ চৌকার অর্দ্ধহস্ত পূর্ণ করিবে, তাহার উপর ৫।৬ আঙ্গুল উচ্চ মাটী ফেলিবে, অবশিষ্টাংশ বালী দিয়া পূর্ণ করিবে।

বৃক্ষের যে সকল শাখা ঝুলিয়া পড়ে, সেই সকল শাখা হইতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখা বাহির হয়, সেই প্রশাখা গুলিকে শাখার কিয়দংশের সহিত কাটিয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ রাখিবে, বক্রী কাটিয়া ফেলিবে এবং উহাদের নিম্নস্থ পত্রগ্রন্থির চারিদিক পরিষ্কার করিয়া কাটিবে। কাটিবার পর চৌকা মধ্যে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া শাখা গুলি এরূপ ভাবে রোপণ করিবে যেন তাহাদের পত্রোদ্গম হইলে একটীর পাতা আরটীর গায়ে না লাগে। এইরূপে রোপন করিবার পর বেলগ্ল্যাস বা

লণ্ঠন দিয়া শাখা গুলিকে ঢাকা দিবে। তদ্বারায় কলম গুলির গোড়ার রস রোদে শুকাইবে না। গ্ল্যাস ঢাকা দিবার পর দিবা ভাগে চৌকার চতুর্দ্দিকে দর্ম্মা বা গোল্ পাতার আচ্ছাদন দিয়া রাখিবে, রাত্রিকালে খুলিয়া দিবে। চৌকার মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল সেচন আবশ্যক, কিন্তু কোনমতে বৃষ্টির জল না পড়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উদ্ভিজ্জের অভাব বুঝিয়া তদুপযুক্ত ধাতুতে শাখালকম করিতে হয়। গোলাপের এই জাতীয় কলম শীতকাল ব্যতীত অন্য কালে হয় না।

চোঙ্গকলম।—চোঙ্গকলম করিবার প্রথা এদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। থাকিলে এই কলমদ্বারা অনেক বৃক্ষের চারা উৎপাদনে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

কোন চারার মস্তক ছেদন করিয়া ডাঁটার উপরিভাগের দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান হইতে চারিদিকের ছাল তুলিয়া চরক গাছের আলের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কাটিতে হইবে। অনন্তর সেই জাতীয় বৃক্ষের উপরোক্ত চারার মস্তকের উপযুক্ত স্থূল ও কোমল শাখা আনয়ন করতঃ তাহার যে স্থানে চোক্ আছে, সেই স্থানের ছাল প্রকৃতাবস্থায় রাখিয়া, চারার মস্তকের আলের পরিমাণে উহার অভ্যন্তরের কাষ্ঠ কৌশলক্রমে উন্মোচন করিতে হইবে, কিন্তু ছাল ঠিক থাকিবে। অতঃপর উক্ত ছিন্ন-মস্তক চারার উপরিভাগে উহাকে এমত চাপিয়া বসাইতে হইবে, যাহাতে অভ্যন্তরে কিছুমাত্র ফাঁক্ না থাকে অথচ চোঙ্গ ফাটিয়া না যায়। অভ্যন্তরে ফাঁক থাকিলে বা চোঙ্গ ফাটিয়া গেলে কদাচ কলম প্রস্তুত হইবে না। পরে ঐ চারাকে

ছায়ায় রাখিয়া উপরে সছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া তাহাতে প্রতি-দিবস জল দিতে হইবে। নতুবা সূর্য্য কিরণে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধান্যাদি শস্য।

তণ্ডুল আমাদিগের প্রধান খাদ্য, তণ্ডুল ব্যতীত এক দিনও আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না; এজন্য অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে কিরূপে তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে হয় তাহা সকলের শিক্ষা করা উচিত।

যে কৌশলে ধান্য হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত হয় বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু কিরূপে ধান্য উৎপাদন করিতে হয়, কৃষিজীবী ভিন্ন বোধ হয় অপর সাধারণে তাহা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। সংক্ষেপে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিম্নে কয়েকটী স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বীজবপন এবং শস্য ছেদনের সময়ের বিভিন্নতা হেতু ধান্য দুই জাতিতে বিভক্ত। এক জাতীয় ধান্য আশু অর্থাৎ শীঘ্র পাকিয়া উঠে, এজন্য তাহার নাম আশু বা "আউশ।" অপর জাতীয় ধান্য হেমন্ত ঋতুর শেষভাগে পরিপক্ক হয়, এজন্য তাহার নাম হৈমন্তিক। আশু ও হৈমন্তিক ধান্য কিরূপে চাস করিতে হয় পশ্চাৎ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। উক্ত দুই প্রকার ব্যতীত গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলে ও জলাভূমিতে

বোরো নামে এক প্রকার ধান্য জন্মে, দেখিতে অতি কদর্য্য, এবং আহার করিলে পীড়াদায়ক হয়। জলপূর্ণ ভূমি ভিন্ন অন্যত্র বোরো ধান্য উৎপন্ন হয় না।

আশু।—বেলে মাটীতেই আউশ ধান্য উত্তম জন্মে, অন্যত্র প্রায়ই আজন্মা হয়। বৈশাখের শেষভাগে বৃষ্টি হইলেই কৃষকেরা লাঙ্গল দ্বারা উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করে। ভূমিতে যত অধিক চাস দেওয়া যায়, শস্যও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ কৃষকেরা আউশ জমিতে চারিটী চাস দেয়। ইহাতেই মাটী পরিষ্কৃত হইয়া ধান্যোৎপাদনের উপযোগী হয়। চাস দেওয়ার পরে যদি জমির "বাত্ত" থাকে, অর্থাৎ জমি এমন সরস থাকে যে, কাদাও নয় আর শুষ্কও নয়, তাহা হইলে এরূপ ভাবে বীজ ছড়াইতে হয়, যেন ভূমির সর্ব্বত্র সমান চারা উৎপন্ন হয়। বীজবপনের দিবসেই মৈ দিতে হয়, তাহার এক দিবস পরেই একবার লাঙ্গল দিতে হয়। এইরূপে লাঙ্গল দেওয়াকে কৃষকেরা "উকুনী" দেওয়া কহে। উকুনী দেওয়ার সাত আট দিন পরেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা দেখা দেয়। সেই সকল চারার সহিত ছোট ছোট ঘাস জন্মায়। সেই ঘাস নষ্ট করিবার জন্য চারাগুলি একটু বড় হইলে তাহার উপর একবার মৈ দেওয়া আবশ্যক হয়। তাহাতেও ঘাসগুলি সমস্ত নষ্ট হয় না, এজন্য ক্রমান্বয়ে তিন চারিবার বিদা* দিতে হয়। বিদা

---

* বিদা—আড়াই বা তিন হস্ত পরিমিত কাষ্ঠখণ্ড, তাহাতে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ছোট ছোট কতকগুলি বাখারীর খোঁচ দেওয়া, তাহার আঁচড়েই তৃণাদি উৎপাটিত হয়।

দেওয়া শেষ হইলেও একবারে ঘাস নষ্ট হইয়া যায় না। এজন্য দাউলী দ্বারা একবার নিড়াইয়া দিতে হয়। তাহাতে সমস্ত ঘাস নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেও যদি ভূমিতে নূতন ঘাস জন্মে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না; যেহেতু চারাগুলি ক্রমে বাড়িতে থাকে। পরে অর্দ্ধ হস্ত বা তাহা অপেক্ষা কিছু বড় হইলে ভূমির যেখানে ঘন চারা থাকে, সেখান হইতে তুলিয়া যেখানে পাতলা থাকে সেইখানে বসাইতে হয়। তাহার পরেই একবার বৃষ্টির আবশ্যক। সে সময় বৃষ্টির অভাবও থাকে না, যেহেতু আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইয়া পড়ে। জল পাইয়া চারাগুলি সতেজ হইলে, চারার গায়ে না আঘাত লাগে এমন ভাবে একবার কোদাল দিয়া মাটি উল্টাইয়া দিতে হয়। নিড়াইয়া দিবার পর যদি নূতন ঘাস জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা দ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর বড় কৃষকের যত্ন আবশ্যক করে না। মাঝে মাঝে বৃষ্টির সাহায্যে চারাগুলি বড় হইয়া শ্রাবণ মাসে ধান্য প্রসব করে। প্রসবকালে ঝড় বহিলে শস্যের বড় হানি হয়। ধান্য উত্তমরূপে পক্ক হইলে যখন চারাগুলি পীতবর্ণ হয়, সেই সময় কৃষকেরা তাহা ছেদন করিয়া দুই তিন দিন ক্ষেত্রে শুকাইয়া পরে খামারযাত করে। আউশ ধান্য উচ্চ জমিতে জন্মিয়া থাকে এবং হৈমন্তিক ধান্যের ন্যায় অধিক বৃষ্টি আবশ্যক করে না।

হৈমন্তিক।—হৈমন্তিক ধান্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর জন্মে। বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই কৃষকেরা ভূমিতে হল-চালনা করে, সে সময় বর্ষা নয় যে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইবে, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির নিবৃত্তি হইলে প্রখর রৌদ্র হয়, এজন্য ভূমিতে

চাস দিবা মাত্র মাটী শুকাইয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত যতবার বৃষ্টি হয় কৃষকেরা সুবিধা অনুসারে ভূমিতে ততবার চাস দেয়; ন্যূনকল্পে চারি পাঁচটী চাসের কম ভূমিতে প্রচুর শস্য জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে ভূমিতে যেমন চাস দেওয়া হয় অমনি যার যেমন আবশ্যক, ভাল জমিতে যন করিয়া সেই সেই মত বীজ বপন করিয়া রাখে। সেই বীজ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ভূমিতে প্রায়ই দুই তিন বার চাস দেওয়া হয়। যদি আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে প্রচুর বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে ভূমি আকর্ষিত থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না। আষাঢ় হইতে বর্ষার আরম্ভ; প্রতিদিন প্রায়ই বৃষ্টি হয়, এজন্য ভূমি সর্ব্বদাই জলসিক্ত থাকে; সেই জমিতে চাস দিবার বড় সুবিধা হয়। আষাঢ় মাসের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া জমি সকল জলপূর্ণ করিলে কৃষকেরা ভূমিতে চাস দিয়া কাদা করে। তিন চারিটা চাসের পরেই ভূমির ঘাস পচিয়া যায়; পরে তাহাতে মোই দিয়া জমি সমান করিয়া লয়, তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র সমান জল রক্ষিত হয়। পরে পূর্ব্বকথিত বীজ-গুলি উপড়াইয়া আঁটী বাঁধিয়া ক্ষেত্রে আনয়ন করে এবং অনধিক এক হস্ত অন্তর চারাগুলি রোপণ করে। রোপণ কার্য্য অষাঢ়ের শেষে শ্রাবণের প্রারম্ভে সমাপন হইলেই ভাল হয়। শ্রাবণ মাসে জমীর কাণায় কাণায় জল থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে চারা গুলি কালিমা বর্ণ ধারণ করিয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে কিছু বড় হইলে তাহার নীচে যে ঘাস জন্মে, তাহা নষ্ট করিবার জন্য দুই তিন বার নিড়াইয়া দিতে হয়। ধান্যের সহিত আগাছা জমিতে দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে ধান্যের

বৃদ্ধি হ্রাস হয়। মধ্যে মধ্যে সামান্য বৃষ্টির সহিত ভাদ্র মাসের রৌদ্র ধান্যের পক্ষে বড় উপকারী। অনন্তর আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হইয়া যদি ভূমি জলপূর্ণ রাখে, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই চারা গুলি ধান্যের শীস প্রসব করিতে থাকে, আর কার্ত্তিক মাসে যদি গুঁড়ি গুঁড়ি বারিবর্ষণ হয় ও ঝড় না বয়, তাহা হইলেই পুরা ফসল উৎপন্ন হয় এবং বিঘাপ্রতি ষোল সতের মণ ধান্য অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য সমুদায় পরিপক্ক হইয়া সোণার বর্ণে মাঠকে সুশোভিত করে দেখিলে চক্ষু জুড়ায় এবং মনে বড় আহ্লাদের উদয় হয়। পৌষ মাসে কৃষকেরা ধান্য চ্ছেদন করিয়া আঁটি বাঁধে এবং ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উত্তমরূপে শুষ্ক করে, তদনন্তর মাঠ হইতে বাটীতে লইয়া যায়।

ধান্য নানা জাতীয়; তন্মধ্যে বেনাফুল, বাস-মতি, গোবিন্দ-ভোগ, মোশনোট প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট। এই সকল ধান্যে অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল প্রস্তুত হয় এবং তাহার গন্ধ অতিশয় মনোহর, এজন্য বড় সুখাদ্য। আর হরকলি, নাগরা, জটাকমলা প্রভৃতি ধান্য অপেক্ষাকৃত মোটা, পল্লিগ্রামে এই সকল চাউলই সকল গৃহস্থের দৈনিক খাদ্য। যশোহর বাখরগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে যে তণ্ডুল প্রস্তুত হয় তাহাকে বালাম কহে। বালামেরও ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে।

ধান্য ব্যতীত অরহর, মুগ, মটর, মসুর, বিরি, শরিষা প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদের চাসের বিষয়ে কিছুই জানিবার নাই, কেবল কার্ত্তিক মাসে অরহর বপন করিতে হয় ও শীতাবসানে কাটিতে হয়। যে সকল জমিতে

আউশ জন্মে অগ্রহায়ণ মাসে তাহাতে একটা চাস দিয়া মুগ, মটর, সরিষা প্রভৃতি ছড়াইতে হয়, অনন্তর শিশির ও সূর্য্যকিরণে, কৃষকের যত্ন ব্যতীত, দিনে দিনে বৃদ্ধি হইয়া শস্য উৎপাদন করে। ফাল্গুণ মাসে ঐ সকল শস্য পাকিয়া উঠিলে কৃষকেরা গাছগুলি উপড়াইয়া আনে এবং গবাদির দ্বারা তাহা মাড়াইয়া শস্য বাহির করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন কৃষকদিগের মুগ মটর প্রভৃতির জন্য অধিক যত্ন লইতে হয় না। এই সকল শস্য রবিকিরণে উৎপন্ন এবং পরিপক্ক হয় বলিয়া তাহাদিগকে রবিশস্য বা রবিখন্দ কহা গিয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কার্পাস, ইক্ষু, তমাক।

কার্পাস।—ইহার চলিত নাম কাপাস। কার্পাস প্রায় সকল মৃত্তিকাতেই জন্মে; তন্মধ্যে যে মৃত্তিকায় বালির অংশ অপেক্ষা চিক্কণ মৃত্তিকার অংশ অধিক ইহার পক্ষে সেই মৃত্তিকাই বিশেষ উপযোগী।

কার্ত্তিক মাসে প্রথমে জমিতে জল সেচন করিয়া একবার লাঙ্গল দিবে; পরে সেই জল টানিয়া গেলে পুনরায় জল সেচন করিয়া ২।৩ বার লাঙ্গল দিবে এবং গোময়ের সার ছড়াইবে। জমি উত্তম পাট হইলে বীজ বপন করিয়া মোই টানিবে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলিকে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে জল হইতে ছাঁকিয়া গোময় ও ঘুঁটের ছাইএর সহিত

মাটিতে ফেলিয়া এরূপে ঘর্ষণ করিবে, যেন তাহাদের মুখের কাঁটা ভাঙ্গিয়া যায়।

কার্পাসের চারা ৬।৭ অাঙ্গুল উচ্চ হইলে একবার জল দিবে এবং তাহার একমাস পরে পুনরায় জলসেচন করিয়া সিঞ্চিত জল টানিয়া গেলে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এরূপ করিতে হইবে। বৈশাখ মাসে ফল সকল পরিপক্ক হইয়া ফাটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় ফলগুলিকে তুলিয়া লইবে।

তামাক।—তমাকু চাষের নিমিত্ত বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকা অতিশয় উপকারী; কারণ যে পর্য্যন্ত চারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা হইতে রস পাইতে পারে। এইরূপ মৃত্তিকা-বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া, কর্ষিত মৃত্তিকার সহিত নীল কুঠির চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া যায় সেই সিটা কিম্বা গোময়ের সার মিশাইবে।

অন্য ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুঁড়িয়া ভাদ্র মাসে তথায় তামাকুর বীজ বপন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে ঐ স্থানের উপরে উপযুক্ত আবরণ তুলিয়া দিবে; কারণ বৃষ্টির জল লাগিলে বীজের বিশেষ অপকার হয়। বীজ বপনের ২০। ২৫ দিন পরেই চারা জন্মিয়া থাকে। চারা গুলিতে যখন ৫।৬টী পাতা ধরিবে তখন তাহাদিগকে নাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। আশ্বিন মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে রোপণ কার্য্য শেষ করা উচিত; তৎপরে যে সকল চারা রোপিত হয়, তাহারা উপযুক্তরূপে বাড়িতে পারে না। রোপণ সময়ে দেড় হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া প্রতি শ্রেণীতে পরস্পর ঐ পরিমিত ব্যবধানে চরা গুলি পুতিবে। মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া গেলে

যতদিন ইহাদের শিকড় নামিবে, ততদিন জল সেচন করিবে এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রৌদ্রের সময় কলাগাছের খোলা দ্বারা ঢাকিয়া দিবে।

চারা সকল বাড়িতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। পাঁচ ছয়টা বড় ২ পাতা জন্মিলে, চারার পুষ্প-মঞ্জরী সকল ভাঙ্গিয়া দিবে; তাহাতে যে সমুদয় নূতন ফেঁকুড়ী ও পল্লব গজিয়া উঠিবে, তাহারা না বাড়িতে বাড়িতে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এরূপ করিলে পাতা গুলি অতি দীর্ঘ ও পুরু হইয়া উঠে। অতঃপর চারার নীচে যে সকল ছোট পাতা থাকিবে তাহা ভাঙ্গিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে।

যখন বড় ২ পাতা সকল ঈষৎ পীত বর্ণ হইবে, তখন তাহাদিগকে গাছের কিয়দংশ ছালের সহিত কাটিয়া লইবে।

ইক্ষু।—যে ভূমি বন্যার জলে ডুবিবার সম্ভাবনা নাই এবং যাহাতে অধিক বড় গাছ নাই, সেই ভূমিই ইক্ষু চাষের উপযুক্ত। ঐ স্থানের মৃত্তিকা দোঁয়াশ হইলে ভাল হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ঐরূপ ক্ষেত্রে লাঙ্গল দ্বারা চারি পাঁচবার চাস দিয়া উত্তম রূপে পাটি করিবে। পাটি করিবার সময় মৃত্তিকার সহিত খোইল ও গোময় সার মিশাইবে। মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে এক এক হাত অন্তরে আধ হাত চৌড়া এবং আধ হাত গভীর করিয়া জুলি প্রস্তুত করিবে। জুলি খুঁড়িতে যত মাটি উঠিবে, তাহা দুই দুইটী জুলির মধ্যে আলির আকারে রাখিবে; কারণ পরে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় ঐ মাটি সহজে লওয়া যাইতে পারিবে। এই প্রকারে জমি প্রস্তুত হইলে জুলির মধ্যে

এক এক হাত অন্তরে ইক্ষুর ডগা বসাইবে। প্রত্যেক ডগায় অন্ততঃ তিনটী চোক্ থাকা আবশ্যক। সেই চোক্ উপরের দিকে রাখিয়া তদুপরি আড়াই অঙ্গুলি পুরু করিয়া এরূপে মাটি চাপা দিবে যে, সমুদয় ডগাটী যেন ঢাকিয়া যায়। মাটি চাপা দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ জল সেচন করিবে। ডগা রোপণের পূর্ব্বে জুলির মধ্যে অতি পাতলারূপে খোইলের গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কোঁড়া বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দুই দিন অন্তর জল সেচন করিবে। যখন কোঁড়াগুলি সম্যকপ্রকারে জন্মিবে, তখন ১২।১৩ দিন অন্তর জল দিলেই চলিবে। সিঞ্চিত জল একটু টানিয়া গেলে, অপর পার্শ্বস্থ আলির মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। তাহাতে পুনরায় জল সেচন করিলে বা বৃষ্টি হইলে, ঐ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া জুলির মধ্যে পড়িবে, সুতরাং চারার গোড়ায় মৃত্তিকা দেওয়ার কাজ হইবে।

ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। আশ্বিন মাসে আলি সকলে যে মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা খুঁড়িয়া সমান করিয়া দিবে, অর্থাৎ তখন আর আলি রাখিবে না। এই সময়ে ক্ষেত্রে একবার খোইল ছড়ান আবশ্যক এবং এখন ১৫।২০ দিন অন্তর জলসেক প্রয়োজন হয়। জলসেকের দুই এক দিন পরে মৃত্তিকা অল্প ২ খুঁড়িয়া দিবে।

চারা গুলিতে যখন, ৫।৬টা পাতা ধরিবে তখন অবধি নীচের পাতা দ্বারা তাহাদিগকে জড়াইতে আরম্ভ করিবে এবং গাছ ক্রমে যত বাড়িবে, তত জড়াইয়া দিবে।

ইক্ষুর যে সকল ডগা রোপিত হইয়া থাকে, রোপণের পূর্ব্বে

তাহাদিগকে হাপরে ফেলিয়া রাখিতে হয়। হাপরে রাখার নিয়ম এই,—কোন স্থানে এক হস্ত গভীর একটী গর্ত্ত করিবে। অনন্তর পুকুরের পাঁক, ছাই ও বালি মিশ্রিত করিয়া উহার গর্ত্তের কিয়দংশ পূর্ণ করিবে। এইরূপে হাপর প্রস্তুত হইলে, ইক্ষুর ডগা সকল তন্মধ্যে অল্প হেলাইয়া সাজাইয়া বসাইবে। তৎপরে তাহাদের চারি পার্শ্ব মৃত্তিকা দ্বারা এরূপে ঢাকিয়া দিবে যে, গোড়ায় বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, কিন্তু এই মৃত্তিকার আবরণ যেন ডগার উপরি ভাগ পর্য্যন্ত না উঠে, অর্থাৎ উপরে কিয়দংশ বাকি রাখিয়া মৃত্তিকা ঢাকা দিবে। অনন্তর রোপণের উপযুক্ত সময় হইলে, ডগাগুলিকে হাপর হইতে উঠাইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুতিয়া দিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেশীয় সবজী।

পটল।—ইহার বীজে চাস হয় না, মূল হইতে চারা জন্মে। এই জাতীয় লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইয়া মাটীর ভিতর প্রবেশ করে। সর্ব্বদা জলে ডুবিয়া যদি পচিয়া যাইতে না দেওয়া যায় তবে, পটলের লতা (পল্‌তা) বার মাসই থাকে। কিন্তু একবার যদি তাহায় ফল জন্মে, পর বৎসর আর তাহার সেরূপ তেজ থাকে না, এজন্য তাহাতে ফলও উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব্বোক্ত পল্‌তা লতার গাঁইটের উভয় পার্শ্ব ও শিকড়ের

৩।৪ আঙ্গুল রাখিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। সেই শিকড় গুলিকে সার গোময়ের জলে একদিন আর্দ্র করিয়া রাখিবে। পরে দোঁয়াস মাটিবিশিষ্ট ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাস দিয়া মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ করিবে। এই সময়ে খইল ও গোময়ের সার মাটীতে ছড়াইতে হইবে। মাটী উত্তমরূপ প্রস্তুত হইলে তিন হাত অন্তর পয়নালা কাটিয়া তাহাদের উপর মাটীর স্তূপ করিতে হইবে। সেই স্তূপের উপর তিন তিন হাত দূরে গর্ত্ত করিয়া এক একটী গর্ত্তে ২। ৩টী শিকড় রোপণ করিবে। অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া না যায় এজন্য চারা বাহির হওয়া পর্য্যন্ত পাতলা করিয়া খড় চাস দিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অল্প অল্প জল সেচন করিবে। চারা গুলি বড় হইলে আর দিন দিন জল দেওয়া আবশ্যক করে না, মাটী শুকাইয়া না যায় এরূপ ভাবে মধ্যে মধ্যে জল দিলেই যথেষ্ট হইবে। কার্ত্তিক মাস পটল চাসের উপযুক্ত সময়।

বেগুণ।—জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবন মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে ৩।৪ হস্ত ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়, দুই তিন ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া বপন করিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

বীজ গুলি যতদিন অঙ্কুরিত না হয় ততদিন রৌদ্রের সময় তাহাদের উপর কলাপাতা ঢাকা দিয়া রাখিবে, বৃষ্টি না হইলে প্রতিদিন জল দিতে হইবে। চারা গুলি একটু বড় হইলে বেগুণ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া জমিতে এক হস্ত অন্তর জুলি কাটিবে এবং সেই জুলির ভিতর এক হস্ত ব্যবধানে চারা গুলিকে পুঁতিবে। যে পর্য্যন্ত না চারার শিকড়

মাটীতে শক্তরূপে বসিয়া পাতাগুলি স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মাটী সরস রাখিবার জন্য জল দেওয়া আবশ্যক তাহার পর ২।১ বার ঘাস নিড়াইয়া দিবে।

গোলআলু।—গোলআলু চাস করিতে হইলে দোয়াঁস মাটীর প্রয়োজন। কার্ত্তিক মাসে উত্তমরূপে মাটির পাইট করিয়া ধূলিবৎ করিতে এবং তাহাতে খইলের সার ছড়াইতে হইবে তাহার পর আধ হাত অপেক্ষা কিছু অধিক অন্তরে জুলি কাটিয়া মধ্যস্থলের মৃত্তিকা আইলের মত উচ্চ করিতে হইবে সেই আইলের উপরে আধ হাত অন্তরে আলুর বীজ বসাইয়া অল্প মাটী ঢাকা দিবে। এই সময়ে জল সেচন করিয়া মাটী সরস রাখিবে। তাহা হইলে ১০।১২ দিন মধ্যে বীজ হইতে চারা বাহির হইবে। তাহার পর নিয়তই জল সেচনে মাটীর সরসতা রক্ষা ও মাটী উল্টাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে আলুগুলি ক্রমে বড় হইতে থাকিবে।

শাঁকআলু।—দোয়াঁস ও বালি মাটীতে উত্তম জন্মে গোলআলুর চাসের মত ইহার চাস করিতে হয়। কেবল সময়ের ইতর বিশেষ এই যে, এই আলুর চাস বৈশাখ হইতে অপর মাস পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। শ্বেত শাঁক আলুর বীজ বড় অপকারী, খাইলে মনুষ্যের জীবন নষ্ট হইতে পারে।

পালঙ শাক—আশ্বিন কার্ত্তিক মাস ইহার চাসের সময়। দুই এক দিন বীজ গুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর কিছু ফুলিয়া উঠিলে তাহাদিগকে জল হইতে তুলিবে। তুলিয়া অপর পাত্রে ছাই মিশাইয়া রাখিবে এবং সেই ছাইপাত্রের মুখ ঢাকা দিবে। তাহাতেই তাহাদের অঙ্কুর বাহির হইবা

উপক্রম হইবে। তখন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া প্রতিদিন ত্রৈকালে জল দিতে থাকিবে। চারা গুলি একটু বড় হইলে যেখানে ঘন আছে উপড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবে। টকু পালঙ্গের চাসও এইরূপে করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে মাটীতে চাস দিলে চারা তেজস্বী হইয়া থাকে।

আর্দ্রক (আদা) ও হরিদ্রা।—আদার মূল খণ্ড করিয়া এক খণ্ড পুতিয়া দিলে গাছ হয়। উর্ব্বরা দোঁয়াস মাটীতে বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে ভূমিতে চাস দিয়া একহাত অন্তর আইল প্রস্তুত করিবে এবং তাহাদিগকে ৮।১০ অঙ্গুলি ব্যবধানে পুতিয়া দিবে। চারা বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে। আমআদার চাসও এইরূপে করিতে হয়, কেবল ইহার মূল রোপনের সময় ফাল্গুনের শেষ হইতে আষাড়ের শেষ পর্য্যন্ত।

হরিদ্রার চাসও প্রায় এইরূপ। কেবল শীতের পূর্ব্বে ইহাকে রোপন করিতে ও চারা বাহির হইলে মৃত্তিকা উল্টাইয়া দিতে হয়। শীত পড়িলে আর সেরূপ করিতে হয় না। ফাল্গুন মাসে যখন ওষধি গুলি শুকাইয়া যায়, তখন মাটী খুঁড়িয়া হরিদ্রা বাহির করিয়া লইতে হয়।

ওল।—সমস্ত ফাল্গুন মাস ও চৈত্রের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত ওল চাসের উপযুক্ত সময়। দোঁয়াসা মাটীর জমিতে উত্তমরূপে চাস দিয়া মাটীকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, সেই সঙ্গে তাহাতে খইল ও গোময়ের সার ছড়াইবে। তাহার পর এক হাত অন্তরে আইল প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক আইলের উপর ১৫।১৬ অঙ্গুলি দূরে ওলের বেঁজি রোপন করিবে। চারা বাহির হইলে

গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া আল্গা করিয়া দিতে হইবে। এক ওল তাদৃশ বড় হয় না। এজন্য যখন ওলের গাছ শুকাইয়া যায়, তখন কৃষকেরা ওল গুলিকে উপড়াইয়া বাড়িতে আনিয়া রাখে, পর বৎসর যথাকালে ক্ষেত্রে রোপন করে। এইরূপে দুই তিন বৎসর করিলে ওল অতিশয় বৃহৎ হয়। ছায়াযুক্ত বা ভিজা জমিতে কোন মতে ওল চাস করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে রন্ধনে "কুট্ কুটে্" দোষ যায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিলাতী সবজী।

কপি।—কপি শাকের চাস বড় যত্নে করিতে হয়। ইহার বীজ বাছিয়া লওয়া বড় সহজ নহে। দেখা গিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কপির বীজ হইতে হয়ত একই রকম শাক জন্মিয়াছে। এজন্য আমাদের দেশে কপি চাস করিতে হইলে বিলাতী বীজই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে যে কপি বীজ জন্মে তাহা কখন অঙ্কুরিত হয় না। বীজ টাট্কা হওয়া আবশ্যক। বাতাস লাগিলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য, কৌটা বা বোতলের ভিতর রাখা উচিত।

উত্তম হাল্কা উর্ব্বরা মৃত্তিকা চাস দিয়া ভাদ্র মাসে কপি বীজ বপন করিবে। চারা উৎপন্ন করিবার রীতি এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে যেরূপ লিখিত হইবে তদ্রূপ

করিবে। ক্ষেত্রটীর মাটী এরূপ ভাবে চারাইতে হইবে যে বৃষ্টি হইলে একটুও জল না ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়া চারার মূল পচাইতে পারে। চারা গুলি যখন ছোট থাকে তখন বৃষ্টি-হাওয়া লাগিলে নষ্ট হইতে পারে, এজন্য বৃষ্টির সময় তাহাদিগকে ঢাকা দিয়া রাখিবে; এই সময়ে মক্ষিকায় চারা গুলির বড় ক্ষতি করিয়া থাকে। তাহাদের উৎপাৎ নিবা-রণের জন্য অঙ্গার চূর্ণ চারাগুলির উপর ছড়াইয়া দিবে। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিলেও তাহা হইতে শাক জন্মে, এজন্য কেট্ এন্ ফিল্ড লার্জ অক্সার্ট ড্রামহেড জাতীয় কপীর বীজ উপযুক্ত। চারা গুলির ছয়টী করিয়া পাতা বাহির হইলেই ক্ষেত্রে রোপন করিবে। এই কার্য্য করি-বার পক্ষে সন্ধ্যাকালই প্রশস্ত। যখন সমস্ত চারা ক্ষেত্রে রোপন করা হইয়া যাইবে, তখন উত্তম রূপে জলসেচন করিতে হইবে।

ছোট জাতীয় চারার পক্ষে ২০ বর্গ অঙ্গুলি স্থান আব-শ্যক। এই স্থানের মধ্যস্থানে ৩২ আঙ্গুল বেড়বিশিষ্ট একটী গর্ত্ত করিবে। ঐ গর্ত্তের গভীরতাও ৩২ অঙ্গুলি হওয়া চাই। এই গর্ত্তের ২॥০ অঙ্গুলি বাকী রাখিয়া পুরাতন গোবরের সার দিয়া পূর্ণ করিবে। তাহার উপর চারা রোপন করিতে হইবে। বড় জাতীয় কপির জন্য এক বর্গ গজ স্থানের আবশ্যক। চারা রোপন করিবার পর মৃত্তিকার সরসতা রক্ষা করি-বার জন্য মধ্যে মধ্যে কপি ক্ষেত্রে জল দিতে হইবে। জল শুকাইবার সময় পাতলা করিয়া সার দিবে।

লালবাঁধা কপির চারা আশ্বিন মাসে ঐরূপে খোলাস্থানে

চৌকা উচ্চ করিয়া রোপণ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন চাসের ব্যবস্থা সকলই বাঁধা কপির মত।

ফুলকপি।—ফুলকপির জন্য অতিশয় উর্ব্বরা ভূমির আবশ্যক। আমাদের বাঙ্গালা দেশে এদেশজাত বীজে বেশ কপি জন্মে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য বিলাতী বীজ প্রয়োজন হয়।

প্রথমতঃ গামলায় বীজ রোপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইবে। আমাদের দেশে আশ্বিন ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ভাদ্র মাসে বীজ রোপনের উপযুক্ত সময়। চারা গুলিতে চারিটী করিয়া পাতা বাহির হইলে তাহাদিগকে পাত্রান্তরে রোপন করিবে। যখন তাহাদের ৮টী পাতা বাহির হইবে, তখন ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। রোপণ করিবার সময় ক্ষেত্রের মাটী বেশ নরম করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর ক্ষেত্রে জুলি কাটিয়া এক হাতের কিছু বেশী দূরে এক একটীকে বসাইয়া গোড়ায় মাটী চাপা দিবে। রোপণের পরে এরূপ ভাবে চারা গুলিকে চাপা দিবে, যেন তাহাদের গায়ে আলোক ও বায়ু স্পর্শ করিতে পারে। চারা পুতিয়া তাহার গোড়ায় পুরান সার দেওয়া উচিত, এবং অতি অল্প মাত্রায় "পটাশ" জলে গুলিয়া ছিটাইলে ফুল খুব বড় হয়।

যে সকল চারা ক্ষীণ হইয়া পড়িবে তাহাদিগকে উপড়াইয়া অন্য সতেজ চারা বসাইবে। যেমন করিয়া হউক চারাগুলির গোড়ায় প্রচুর জল সেচন করিবে, তৎপক্ষে অন্যথা না হয়।

যখন ফুল বাহির হইবার উপক্রম দেখিবে, তখন একটী কপিপাতা ভাঙ্গিয়া উঠন্ত ফুলের উপর চাপা দিবে।

ফুল কপির বীজ কলিকাতার অনেক বাগানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পাটনার বীজ বড় প্রসিদ্ধ।

শালগম।—এই সবজি অতি পুষ্টিকর। ইহার পত্র ও মূল উভয়ই আমাদের খাদ্য। যে শালগমের পত্র ভাল তাহার মূল খারাপ এবং যাহার মূল ভাল তাহার পত্র প্রায়ই খারাপ হইয়া থাকে। বিদেশীয় বীজ এদেশে চাসের পক্ষে বড় উপযোগী। বীজ যত টাট্‌কা হয় ততই ভাল। উর্ব্বরা ও হাল্‌কা মাটীতে লবণ মিশ্রিত করিয়া চাস করিলে উত্তম শালগম জন্মে। ইহার বীজ চৌকা মধ্যে রোপণ করিতে হয়। চারার যখন চারিটী পাতা বাহির হইবে, তখন তাহাকে ক্ষেত্রে পুঁতিবে। চারা গুলি একটী হইতে অপরটী যেন ৮ আঙ্গুল তফাতে বসান হয়। প্রতিদিন চারায় জল দিতে হইবে এবং ইহার মূলে ভালরূপে মাটী ঢাকা দেওয়া আবশ্যক। শালগমে যত বাতাস ও আলোক লাগিবে ততই ভাল। আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। মাছি এই উদ্ভিদের বড়ই শত্রু, এজন্য চারার গোড়ায় কাঠের ছাই দিবে।

গাজর।—এই জাতীয় উদ্ভিদ বিলাতে আপনা হইতে জন্মে। চাসের জন্য কোন আয়োজন করিতে হয় না। বালি মিশ্রিত ঝুরা মাটীতে গাজর উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। ইহার বীজ অতিশয় লঘু, অল্প বাতাসে উড়িয়া যায়। এজন্য যে দিন বেশী বাতাস না বয়, সেই দিন বীজ বপন কর্ত্তব্য। যে জমিতে গাজরের চাস করিতে হইবে, উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তাহার মাটী ঝুরা করিবে। মাটী খনন যত অধিক হইবে তত সুবিধা হইবে। মাটীতে যেন কাঁকর বা পাথর মিশ্রিত না

থাকে, সেজন্য বিশেষ সাবধান লইবে। বীজ প্রোথিত করিয়া গামলায় জল দিবে। ৪।৫ দিনের মধ্যে বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া যখন তাহাদের চারিটী পাতা বাহির হইবে, ক্ষেত্রে তখন পাঁচ আঙ্গুল দূরে এক একটীকে রোপণ করিবে। চারাগুলি একটু বড় হইলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে পুতিতে হইবে। এবারে পরস্পরে ১২। ১৩ আঙ্গুল দূরে থাকে এরূপ ভাবে রোপণ করিবে। চারায় যথেষ্ট জল দিতে হইবে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে গাজর বীজ বপন করিতে এবং জৈষ্ঠ মাসের মধ্যে চারা পূর্ণবস্থা প্রাপ্ত হইলে উৎপাটন করিতে হয়। বীজ রাখিবার প্রয়োজন না হইলে গাজর চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হয় না।

এ্যারারুট।—আমাদের দেশের বর্দ্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইহার চাস প্রচুর হইতেছে। মনে করিলে সর্ব্বত্রই এ্যারারুটের চাস করা যাইতে পারে। দোঁয়াশ তে এ্যারারুট ভাল জন্মে। মাটী উত্তমরূপ চসিয়া ধূলিবৎ করিবে, তাহাতে পূর্ব্ব বৎসরের সার মিশাইয়া বার তের অঙ্গুলি অন্তর আইল প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ আইলের উপরে আধহাত ব্যবধান রাখিয়া মূল রোপন করিবে (কারণ ইহার বীজ হয় না)। মৃত্তিকা সরস থাকিলে সর্ব্বদা জল দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সাবধান, যেন মাটী একেবারে শুকাইয়া না যায়, তাহা হইলে সকল নষ্ট হইবে। চারা বাহির হইলে আইলের নিম্ন স্থান হইতে মাটী তুলিয়া উহার মূলে ঢাকিয়া দিবে। শীতকাল আসিলে আর ঐরূপে মাটী দিতে হইবেনা। বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের

কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত এ্যারারুট বসান যাইতে পারে। মধ্যে ফাল্গুন মাসে মূল সমেত গাছ গুলি উৎপাটন করিলে সেই মূল হইতে এ্যারারুট পালো প্রস্তুত হয়।

চীনের বাদাম।—চীনের বাদাম আমাদের দেশে মাট্ কলাই নামে প্রসিদ্ধ। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা প্রভৃতি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে জন্মে। দোঁয়াশ মাটী মাট্-কলাই চাসের পক্ষে উত্তম। জমিতে খুব ভাল করিয়া চাস দিয়া মাটী ধূলার মত করিতে হইবে। এমন কি ফল হইবার সময়ও যেন মাটী তদ্রূপ থাকে, কেননা গাছ বড় হইয়া মাটীতে ঝুলিয়া পড়ে এবং ফল জন্মিলে তাহা মাটীর ভিতর প্রবেশ করে। চারা রোপণের পূর্ব্বে মাটীতে খইল ও গোময়ের সার দিতে হইবে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার চাস আরম্ভ করিতে হয়। বলা বাহুল্য সকল ক্ষেত্রেই তৃণাদি আগাছা জন্মিলে তাহা উৎপাটন করা আবশ্যক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চাসোন্নতির প্রক্রিয়া।

গামলায় চারা উৎপাদনের নিয়ম।—কপি, ফুলকপি প্রভৃতি নানা প্রকার শাকসবীজ ও বহুবিধ ফলের চারা অগ্রে গামলায় প্রস্তুত করিয়া তবে ক্ষেত্রে রোপন করিতে হয়। এজন্য

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে তৎপক্ষে উদ্ভিদের কোন হানি না হইয়া উন্নতি হয় তাহার বিষয় লিখিত হইতেছে।

উত্তম উর্ব্বরা হালকা মাটীকে ঝুরা করিয়া গামলা পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের নিজের দোষে অনেক সময় আমরা ভাল চারা উৎপন্ন করিতে না পারিয়া বীজের দোষ দিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহা অন্যায়। উদ্ভিদের যত্ন লইতে ক্রটী হইলে অবশ্যই আমরা উপযুক্ত ফললাভে অসমর্থ হইব। এজন্য সর্ব্বাগ্রে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে মাটী দিয়া গামলা পূর্ণ করিতে হইবে। তাহা এপ্রকার হইবে যে, তাহাতে জল সেচন করিলে চাপ বান্ধিয়া কঠিন না হয়। সেরূপ মাটীতে যদিও বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, কিন্তু অঙ্কুর বাহির হইতে অধিক সময় লাগে। ফলতঃ যদি মনের মত মাটী না পাওয়া যায়, তবে নিম্নলিখিত উপায়ে মাটী প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কোন স্থান হইতে নূতন মাটী তুলিয়া তাহার সহিত সমান ভাগে পচা পাতার সার ও তাহার আট ভাগের একভাগ নদীর সরু বালি মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সেই মিশ্রিত মৃত্তিকা ভাল রকমে চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে কাঁকর ও অন্যান্য উদ্ভিদের শিকড় বাছিয়া ফেলিবে; এই প্রকারে যে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবে তাহা অতিশয় নরম, সুতরাং তাহাতে বীজ মিশ্রিত করিবামাত্র সুন্দর বলিষ্ঠ চারা উৎপন্ন হইবে। শাকসবজীর জন্য পচা পাতার সারের পরিবর্ত্তে মাটীর চারি ভাগের এক ভাগ পচা গোবর তাহার সহিত মিশাইলে চলে।

যে গামলায় বীজ বপন করিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক। পাত্র ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলে ভাল চারা জন্মে না, জন্মিলেও তেমন সতেজ হয় না। গামলা পরিষ্কার হইলে তাহাতে যে ছিদ্র থাকে তাহাতে খোয়া বা ইটের কুঁচা দিয়া বন্ধ করিবে। তাহার পর গামলার উপর দুই আঙ্গুল বাদ রাখিয়া মাটী দিবে। মাটী সর্ব্বত্র সমান করিয়া ধীরে ধীরে টিপিয়া একটু বসাইবে। এইরূপ করিয়া তাহার উপর বীজ ছড়াইবে। বীজ ঘন হওয়া ভাল নয়। বীজ বপন হইলে তাহার উপর আল্‌গা করিয়া ঝুরা মাটী চাপা দিবে। তাহাতে যেন কেবল মাত্র বীজ গুলি ঢাকা পড়ে। এইবার ঝাঁঝরীযুক্ত জলপাত্র দ্বারা জল সেচন করিয়া গামলাটীকে এমন স্থানে রাখিবে যেন তাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগে। যতদিন বীজ হইতে চারা বাহির না হয়, ততদিন এই অবস্থায় রাখিবে, এবং মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত জল দিবে। চারা বাহির হইলে কিয়দ্দিন প্রাতে ও বৈকালে গামলাটীকে বাহিরে রাখিবে। যখন চারা গুলি তিন চারি আঙ্গুল বড় হইবে, তখন প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে পাত্রান্তরে তুলিয়া রোপণ করিবে। এই সময় কিছু অধিক জল সেচন আবশ্যক এবং এই অবস্থায় গামলাটী সমস্ত রাত্রি বাহিরে রাখিবে। কিন্তু সাবধান যেন অধিক বৃষ্টির সময় উহা বাহিরে না থাকে। স্থান পরিবর্ত্তন হেতু যত দিন চারার দুর্ব্বলতা না যায়, ততদিন রৌদ্রের সময় ঢাকা দিয়া রাখিবে। চারা সতেজ হইলে আর ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে না। তাহার পর যখন তাহারা আরও

বড় হইয়া উঠিবে, তখন তাহাদিগকে কিছু মৃত্তিকার সহিত গামলা হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিবে ও সর্ব্বদা যত্ন লইবে, যেন কিছু দিন তাহাদের গায়ে অধিক রৌদ্র ও বৃষ্টি না লাগে।

সাংসারিক কার্য্যাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অর্থাগমের জন্য কি প্রয়োজন।

ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি গৃহস্থাশ্রমী, যিনি স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকেই চিন্তা করিতে হয় কিসে সংসার সচ্ছন্দে চলিবে। অনেকে মনে করিতে পারেন যাঁহার প্রচুর অর্থ আছে, যাঁহাকে অভাব পূরনের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাঁহারই সংসার সচ্ছন্দে চলে, তাঁহার আর ভাবনা কি? সংসারে তাঁহার আবার দুঃখ কিসের? সংসারে আসিয়া সংসারী হইয়া, সংসারের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া শুনিয়া, সংসারের সহিত হাড়ে হাড়ে, মাসে মাসে, রক্তে রক্তে মিশামিশি করিয়া যদি আমারা এ কথার অনুমোদন করি, তাহা হইলে আপনাদিগকে সংসার কাণা বলিয়া পরিচিত করিতে বাকী রহিল কি! বড় লোকের সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাবলী আমাদিগের নয়ন পথে দেদীপ্যমান থাকিতে কি বড় লোকের বড় জ্বালা একথা ভুলিয়া যাইব? বড় লোকের যে জ্বালা সে বড় লোকেই

ন্য, আর যাঁহারা তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখেন তাঁহারাও অবগত আছেন। সে কথা বিস্তারিতরূপে এস্থলে বলিবার আবশ্যক নাই। সারে অর্থের নিতান্ত আবশ্যক একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহার যেমন আয়, সে যে চেষ্টা করিলে সংসারে সুখী হইতে পারে না একথা কোন মতে স্বীকার করা যায় না।

সংসারে অর্থের তৃষা কাহার নিবৃত্তি হইয়াছে? কোটী-পতিও কি আপনার লাভেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়া আছেন মনে কর? তাঁহার যেরূপ আয় তাহাতে তিনি আপনার ধন বজায় রাখিয়া দুইহস্তে খরচ করিয়া অনেক দরিদ্রের দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাহা কি তিনি করিতে সম্মত? তাঁহার এক পয়সা এদিক ওদিক হইলে তিনি কি সহজে তাহা ছাড়িয়া থাকেন? অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংসারে ধনী দরিদ্র সকলেই অর্থের আকাঙ্ক্ষা রাখেন,—তবে কথা এই যে, দরিদ্রের ধন নাই, তাহাকে অর্থাভাবে অনশনে দিন যাপন করিতে হয়, সুতরাং সে তাহাতে সুখী হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে দরিদ্রেরই ধনের অভাব, ধনীর তাহা নহে। ধনীর ধন স্বত্বে ও তিনি ধনলোভী। ধনীর প্রবৃত্তি পরিতোষের উপায় নির্দ্ধারণ করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে এখন দেখিতে হইবে নির্ধন লোক কি উপায়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। সুখ দুঃখের কথা ছাড়িয়া দাও সে পৃথক কথা। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া সময় এবং কার্য্যগতিকে হয়ত রাজাও অসুখী, আবার পর্ণকুটীর মধ্যে আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা

গুলিকে লইয়া দরিদ্রও সুখী হইতে পারে। সুখ দুঃখ মনের খেলা, ধনের নয়, পদ মর্য্যাদার নয় বা কুলগৌরবেরও নয়।

পাঠক মনে করিতে পারেন আজি আমরা একটা বড় গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, একটা অসঙ্গত বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত, যাহা হইবার নয় তাহাই সিদ্ধ করিবার জন্য লেখনী ধরিয়াছি। দরিদ্রকে সচ্ছন্দে তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া দিব। পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুজনের মুখ হইতে একথা বাহির হইলেও অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার সময় থাকে না, যেন আপনা হইতেই মনের মধ্যে উপহাসের সঞ্চার হয়। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি প্রকৃত পক্ষে এ কথাটা কি এতই অসম্ভব?

দেখ, ঈশ্বর মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জীব জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের জীবনধারণের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, জগতে তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের কোন অভাবই তিনি রাখেন নাই, এবং রাখাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, রাখিলে সংসারে জীব জন্ম মাত্রই মরিত, এত লীলা খেলার ব্যবস্থা হইত না; পৃথিবী কেবল সংসার ও সূতিকাগার মাত্র হইত। বৃক্ষের ফল, নদীর জল, খণির মণি কিছুরই প্রয়োজন ছিলনা। তাঁহার সৃষ্টির রহস্য অতীব গূঢ়, এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ। তুমি আমি দুঃখের জ্বালায় অস্থির হইয়া অনেক সময় বলিয়া থাকি ঈশ্বর আমাকে দেন নাই আমি কোথায় পাইব? মনের দুঃখে যাই বলি, ভাবিলে কিন্তু সান্ত্বনা পাই, আপনাকে আপনি লজ্জা দিই। এই সংসারের জীবকে তাঁহার অদেয় কি? আর তিনি দেনই না বা কি? পশু পক্ষ্যাদি ইতর জন্তুর কথা ছাড়িয়া

দাও, তাহারা ত' তাঁহার খাস বাগানে বিনা পয়সায় উদর পুরিয়া খাবার খায়। তোমার আমার জন্য বড় বড় প্রান্তর পড়িয়া আছে, উপায় চিন্তার জন্য বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তবে আর নাই কি? সকলই আছে। তবে তুমি তাঁহার নিকট আর চাও কি? তিনি কি আমাদিগকে সকালে সন্ধ্যায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন মুখের নিকট আনিয়া দিবেন? পশু পক্ষীগণ যে স্বভাবের এত মুখাপেক্ষী তাহাদিগকেও খুঁজিয়া খাইতে হয়। তবে আমাদের ভরণপোষণের জন্য নিতান্ত কর্ত্তব্য কি? চেষ্টা। চেষ্টা বলে মনুষ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ করে, দশ মাসের পথ দশ দিনে যায়, আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তাড়িৎ ধরিয়া রাখে, চেষ্টায় অসাধ্য সধনা করা যায় এবং চেষ্টা ব্যতীত কোন কার্য্য করা যায় না; পরিশ্রম বিনাও চেষ্টা হয় না। সুতরাং ইষ্টসাধনার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে পরান্মুখ হইলে চলিবে কেন? এতদুভয়ের বলে আমরা দারুণ দারিদ্র্য দুঃখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সংসারে সুখী ও সচ্ছন্দ হইতে পারি। একজন প্রাচীন কবি বলিয়াছেন, উদ্যোগী পুরুষ নিশ্চয়ই অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয়েন। কেবল অলস ও নিরুদ্যম ব্যক্তিই অদৃষ্টের অপমান রটনা করিয়া আপনার কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া থাকে। সংসারে যিনি উদ্যমশীল, যিনি আলস্যশূন্য হইয়া দিবারাত্র আপানার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য লালায়িত, তিনিই লক্ষ্মীবন্ত। উদ্যম কখন ব্যর্থ হয় না। একবার, দুইবার, তিনবার, ততধিক চেষ্টা করিয়াও যদি অকৃত কার্য্য হও ছাড়িও না, কৃতকার্য্য হইবেই। স্কটলণ্ড দেশে একজন প্রভূত পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার নাম "রবার্ট ব্রুশ।" একদা তিনি

বারম্বার শত্রুসৈন আক্রমণ করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন বসিয়া চিন্তামগ্ন আছেন কি উপায়ে শত্রু-গণকে পরাভূত করেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটা মাকড়সা একটা অতি উচ্চ স্থান হইতে নীচে আপনার উর্ণা দ্বারা জাল বিস্তার করিবার চেষ্টায় সূত্রক্ষেপ করিতেছে। সে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইরূপে একাদশ বার অকৃতকার্য্য হইয়াও চেষ্টার ক্রটী করিতেছে না। দ্বাদশ বারে তাহার উদ্যম সফল হইল। মাকড়সার অধ্যবসায় দেখিয়া রবার্ট ব্রুশ পুনর্ব্বার বিপুল তেজে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীকে লাভ করিলেন। ইতিহাস পড়, বড় বড় লোকের জীবন চরিত পড়, দেখিতে পাইবে উদ্যম, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের কি ফল।

অর্থোপার্জ্জনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া যদি বিফল হইতে না চাও, তবে তোমাকে অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি উচ্চ বংশসম্ভূত, আমার পিতা পিতামহ বড় লোক ছিলেন, তাঁহারা কত লোককে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, আজি আমার অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য তুচ্ছ কাজ করিব! তুমি বড় বংশে জন্মিয়াছ, বড় লোকের পুত্র ও পৌত্র বটে; কিন্তু তথাপি তুমি তাঁহাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন নও কেন? এবিষয় ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয় জানিতে হইবে তাঁহাদের যে সকল গুণ ছিল, যে সকল গুণ থাকায় তাঁহারা বড় হইয়া গিয়াছেন, তোমাতে তাঁহাদের কোন কোন গুণের অসদ্ভাব আছে, নতুবা অবশ্যই তদ্রূপ হইতে। যদি তোমার ক্রটী আছে তবে সেই ক্রটি স্বীকার কর, তাহার পূরণ জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখ তুমিও এই সংসারে আপনার

পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম বজায় রাখিতে পার কি না। পাঠক দিগের অনেকেই বোধ হয় "স্যার রবার্ট্ ইনিস্" নামক একজন ইউরোপীয়ের জীবন চরিত পাঠ করিয়া থাকিবেন। সার রবার্ট্ আপনার হীনাবস্থায় সামান্য প্রহরীর কার্য্য করিয়াও কেমন স্বাবলম্বনত্ব বজায় করিয়া ছিলেন। দেশে একটা চলিত কথা আছে, "ব্যাগার খাটা ভাল, তথাপি বেকার থাকা কিছু নহে।" আমাদের দেশের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কিছু দিন কলিকাতা মহানগরীতে চাকরীর জন্য উমেদারী করিয়া তাঁহার বাল্যকাল হইতে প্রতিপালিত আশাকে ফলবতী করিতে পারিলেন না। তখন কি করেন, কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন। কিয়দ্দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিদেশের সম্বল ক্রমে ফুরাইয়া আসিল, আরও অধিক দিন তথায় থাকিলে দেশে ফিরিয়া আসা ভার হইবে এই ভাবিয়া তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু দেশে পৌঁছিবার খরচ কিছু অকুলান হইল। মধ্যবর্ত্তী কোন সহরে আসিয়া তাঁহার একটী টাকা মাত্র পুঁজি রহিল, সেই টাকাটীকে অবলম্বন করিয়া তিনি মুড়ি মুড়কি, কলাই ভাজা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সহরটীতে একটী বৃহৎ কারখানা ছিল। কারখানার কুলীগণ তাঁহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার নিকট খাবার লইত। ইহাতে তাঁহার নিজের উদরান্নের অতিরিক্ত কিছু কিছু সঞ্চয় হইতে লাগিল। সঞ্চিত টাকার সংখ্যা যখন দশটীমাত্র হইল, তখন তিনি কিঞ্চিৎ হাওলাত করিয়া এক খানি মিঠাইয়ের দোকান

করিলে মিঠাইয়ের দোকানে তাঁহার বেশ দশটাকা লাভ হইতে লাগিল, কিন্তু তখনও তিনি কাহাকেও আপনার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। সাত বৎসর পরে তিনি আটহাজার টাকা জমাইতে সমর্থ হইলেন, এবং সেই টাকায় ঘৃত ও চিনির চালানী কারবার খুলিয়া কলিকাতায় একটী আড়ত খুলিলেন। আজি কালি তিনি একজন বিলক্ষণ ধনী। এরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার অভিমানে যদি তিনি মুড়ি মুড়কী ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া অর্থোপার্জ্জনে হতাশ হইতেন, তাহা হইলে সামান্য অর্থের জন্য তাঁহাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইত।

আমাদগের দেশে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কতক গুলি লোকে দিব্য সুস্থ ও সবল দেহ লইয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকাল হইতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সেই সকল লোক ভ্রমণ-জনিত সামান্য ক্লেশ স্বীকার করিলেও তাহাদিগকে অলস ও নিরুদ্যম বই আর কিছু বলা যাইতে পারে না। তাহারা সামান্য শ্রমে উদরান্ন সংগ্রহের জন্য সমাজকে প্রতারিত করে; দেহে যেরূপ সামর্থ্য আছে তদনুযায়ী শ্রম করিতে কোন মতেই স্বীকৃত নহে। ঐ সকল লোক যদি আপনাদের শরীরকে খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, তবে আপনারাও সুখি হইতে পারে এবং সমাজেরও যথেষ্ট মঙ্গল হয়। কিন্তু তাহাদের সে প্রবৃত্তি কোথায়? প্রবৃত্তির দোষে তাহাদিগকে চিরদিন দুঃখ পাইতে এবং একমুষ্টি অন্নের জন্য রাত্রি প্রভাত হইলেই পরের প্রত্যাশাপন্ন হইতে হয়।

এমন জীবন ধারণে যে কিসুখ তাহারাই তাহার মর্ম্মকথা জানে। এই সকল লোকের নিকট অদৃষ্টের বিলক্ষণ প্রাধান্য। সত্য বটে অনেকে অদৃষ্টকে সুখদুঃখের নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহারা বলে অদৃষ্ট দুরদৃষ্টবান ব্যক্তিকে সুপথে চলিতে দেয় না। এরূপ বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। কোন দুঃসাধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তিকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, "ক্ষমতাতীত হইলেও চেষ্টা করিবার হানি নাই।" অনেক স্থলে তাঁহরা কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধনসঞ্চয়।

শ্রমী ও উদ্যোগী হইলেই যে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হওয়া যায় একথা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। সংসারে অনেকেই ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু সেই অর্থের প্রকৃত ব্যবহার করা সকলের দ্বারা হইয়া উঠে না। অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থতা হেতু অনেকে কষ্ট পাইয়া থাকেন, আবার বহুল অর্থলাভ করিয়া অনেকে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেন। সে কেবল তাঁহাদের অপরিনামদর্শিতা দোষেই ঘটিয়া থাকে। আজি দশটাকা উপরি হইল, যাহা ইচ্ছা হইল তাহাতেই ব্যয় করিলাম, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করি-

লাম না, আবার দুদিন পরে যখন অর্থাগমের অল্পতা হইল অমনি অর্থকষ্ট আসিয়া জুটিল এবং হাহাকার পড়িয়া গেল, দিন চলা ভার হইল. তখন পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থের জন্য অনুতাপ আসিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। অর্থ পাইয়াও দুঃখ মিটিল না। এই অসুবিধা দূর করিতে হইলে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা আবশ্যক। সঞ্চয়ী হইতে হইলেই মিতব্যয়ী হওয়া চাই। যে ব্যক্তি মিতব্যয়ী নহে, সে কখন ধনসঞ্চয়ে সমর্থ হইতে পারে না, সে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপায় করিলেও তাহার অর্থের জন্য হাহাকার ঘুচি-বার নহে। মিতব্যয়ীকে কৃপণ বলা অন্যায়। যাহার যেমন আয় সে তদনুযায়ী ব্যয় করিবে। তাহা বলিয়া "যত্র আয় তত্র ব্যয়" এমন করিলে সংসার রক্ষা করা যায় না। আহারীয় ও পরিধেয় ক্রয় করিবার জন্য যেমন অর্থ ব্যয় অপরিহার্য্য তেমনি অপরিহার্য্য জ্ঞানে কিছু কিছু সঞ্চয় করাও নিতান্ত আবশ্যক। সত্য বটে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের তাহা সহজে ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহারাও আয়ের অনুযায়ী অত্যল্প সঞ্চয়েও সমর্থ হইতে পারে। অনেকে এরূপ কথা বলিতে পারেন যে, যাহাদের নিত্য অভাব তাহারা কি প্রকারে সঞ্চয় করিবে, এবং কেনই বা করিবে, যেহেতু ভবিষ্যৎ অভাবের জন্যই সঞ্চয়ের আয়োজন, কিন্তু সেই অভাব যখন তাহাদের প্রতিদিনের সহচর, তখন উপস্থিত অভ্যাপাত নিবারণ না করিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করা কত দূর সঙ্গত। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারের গূঢ় রহস্য বুঝিয়া চলেন, কূলকিনারা নাই এমন দুঃখ

সাগরে পড়িয়াও যিনি ডুবিয়া ডুবিয়া বাহিতে থাকেন, এবং এমন অবস্থাতেও এক দিন সুখের তরঙ্গে গা ভাসাইবার আশা রাখেন, তিনি ভাবেন সেই দুঃখরাশির বিন্দু মাত্র হ্রাস বৃদ্ধিতে কিছু আসে যায় না। এই ভাবিয়া সেরূপ অবস্থাতেও দুঃখের একটানা স্রোত ফিরাইবার জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া তিনি তাঁহার অনন্ত কল্প দুঃখের মধ্যেও সান্তনা লাভ করেন। এরূপে যিনি সঞ্চয় করিতে সাহসী, দুঃখের দারুণ কশাঘাতকেও যিনি গণনার মধ্যে না আনিয়া আপনার মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঞ্চয়রূপ মহামন্ত্রের জপে ব্যস্ত, তিনিই প্রকৃত সংসারবীর, কিন্তু যিনি নিতান্ত কাপুরুষ তিনি হাল ছাড়িয়া অতল জলে মগ্ন হয়েন, আর তাঁহার উঠিবার শক্তি থাকেনা। দারিদ্র্য দুঃখের পরিহার করিয়া যাঁহার ধনবান হইবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহার এরূপ অবস্থাতেও সঞ্চয়ী হইতে হইবে, কেন না তাঁহার এই দুঃখসঞ্চিত অর্থ ভিন্ন তাহাকে বড় করিবার আর কেহই নাই। এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, সমস্ত জীবন দুঃখে ক্ষেপণ করিয়া মরিবার সময় এমন অর্থ রাখিয়া যায় যে, তাহাদের দ্বারা সেরূপ সঞ্চিত হওয়া অসম্ভব। তাহাদের কাহাকেও দেখিয়া, কাহারও কথা শুনিয়া আমরা বলিয়া থাকি, লোকটা কি অর্থপিচাশ ও আত্মনিগ্রহী যে চিরদিন পেটে না খাইয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কি সঙ্গে গেল? তাহা আমাদের নিতান্ত ভ্রম; হয়ত সেই ব্যক্তির মনে যে মহান উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, জীবত থাকিয়া মনোমত অর্থ পাইলে সে যে সংসারে আপনাকে একদিন

প্রভূত ধনবান বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য মহান মনকষ্ট করিত তাহার কিছুই ভাবিলাম না। সে ব্যক্তি তাহার সঞ্চিত অর্থে হয়ত বৃহৎ ব্যবসায় বানিজ্য করিয়া আপনার অবস্থাকে দশজনের হিংসনীয় করিবার চেষ্টা করিত। যে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াও তদ্রূপ ধনসঞ্চয় করিতে পারে সে অবশ্য সহিষ্ণু লোক। সেরূপ স্থিরপ্রকৃতির লোক যে প্রসংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি। আমরা এই জন্য সঞ্চয়ী হইতে সকলকেই অনুরোধ করি। দুঃখি তোমার দারিদ্র্য দুঃখ ত কিছুতেই ঘুচিতেছেনা, দিনান্তে তুমি যাহা উপার্জ্জন কর তাহাতে তোমার উদর পূরণ হইবার কোন উপায় দেখিতেছি না সত্য, তোমার জঠর জালা ত কোন রূপে নিবৃত্তি হইতেছেনা, অর্দ্ধা-শনেই তোমার জীবনকাল কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু মনে কর দেখি, এ অবস্থাতে তোমার মনে এমন কি আশা আছে যে তুমি রাতারাতিই বড় মানুষ হইবে। যদি তুমি এখন আশাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রমক্রমেও মনোমধ্যে স্থান দাও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে কস্মিনকালেও দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোথাও কোন উপায় হইবেনা। তুমি বলিবে চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, দাঁও খুঁজিতেছ,—দাঁও মারিতে পারিলে হয়ত তুমি এক রাত্রিতে লক্ষ পতি হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেরূপ দাঁও কয় জন লোকের অদৃষ্টে ঘটে! যাহা আপনার ক্ষমতার অধীন, যাহা তোমার হস্তমুষ্টির মধ্যে আছে, সে সুবিধা ছাড়িয়া দৈবের মুখাপেক্ষী হইতে যাইতেছ কেন? সক্ষম পুরুষ কখন দৈবের আরাধনা বা তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। অতএব

যদি তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে, যদি তুমি আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য মনে কর, তবে দুঃখে দমিও না, সাহস অবলম্বন কর, আয় বুঝিয়া ব্যয় ও সঞ্চয় কর। যদি আপনার অবস্থা সংশোধন করিতে চাও, তবে যত পার কষ্ট সহ্য করিয়া কিছু কিছু সংস্থান কর, নতুবা উপায়ান্তর নাই।

বিন্দুবাসিনীর শ্বশুর রামেশ্বর বিলক্ষণ জ্ঞানবান এবং পরিণামদর্শী ছিলেন। যখন চাকরিতে প্রবেশ করেন তখন কুড়িটী মাত্র টাকা বেতন পাইতেন। তাঁহাদের দেশে জিনিষ পত্র বেশ সুলভ ছিল। কুড়িটী টাকায় সাত আট জন লোকের বেশ চলিত। সে সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারে কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিনী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর এবং একটী মাত্র দাসী। বিশ্বেশ্বর অকালে কালকবলিত হয়েন। এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর ভরণ পোষণ করিয়া তাঁহার হাতে কিছু কিছু সংস্থান হইত। তিনি নিতান্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার খরচের নিয়ম এই ছিল যে, আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য কিছু হাতে না রাখিয়া খরচ করিতেন না, এজন্য তাঁহাকে এক দিনের জন্য ঋণ হস্ত হইতে হইত না। তখন অবধি তাঁহার সংসারে দুইটী গাভী, খিড়কীতে একটী বাগান। দাসীটীকে অবলম্বন করিয়া তিনি গাভী দুইটীর সেবা করিতেন, বাগানটীতে স্বহস্তে গাছ পালা রোপণ করিতেন। বাগানের শাক সবজী, ফল শস্যে এবং গাভীর দুগ্ধে তাঁহার সাংসারিক খরচের অনেক সাশ্রয় হইত। পাড়াপ্রতিবাসীদিগের সকলের অগ্রে তিনি বৎসরের নূতন

জিনিষ খাইতেন, গাভী দুইটীতে পর্য্যায়ক্রমে বার মাস দুগ্ধ দিত। ক্রমে তাঁহার সঞ্চয়ের সহিত বাগান বাগিজা পুষ্করিণী শস্য ক্ষেত্র সকলই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অল্প দিনেই তাঁহার হাতে বেশ দশ টাকা জমিয়া গেল এবং গ্রামের মধ্যে একজন সঞ্চয়ী লোক ও সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহস্থালী।

রামেশ্বরের বাসগ্রাম মধ্যে একটা কথা রটিয়া উঠে যে, রামেশ্বর ঘোরতর গৃহী, সংসারের জন্য যেন তিনি জীবন বাঁধা দিয়া রাখিয়াছেন। একথা অবলম্বন করিয়া কেহকেহ আবার বলিতেন "লোকটা ঈশ্বর বিড়ম্বিত, কেন যে সংসারের জন্য দিন নাই রাত্রি নাই খাটিয়া মরে কিছু বুঝিয়া উঠা যায় না।" সংসারে সকল লোক সমান নয়, কেহ বা রামেশ্বরের অনুকূলে বলিতেন, সংসারে রামেশ্বরের উৎসাহ কত? লাভে লোহা বয়, তাঁহার খাটিয়া যত সুখ, আমরা আলস্যে তাহার শতাংশের একাংশ পাই না, রামেশ্বর আমাদের সকলের অপেক্ষা সুখী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামেশ্বর প্রতি রাত্রিতে উষার আলোতে শয্যা হইতে উঠিতেন, শৌচে যাইতেন, মুখ হাত ধুইয়া বাগানের চারিদিক্ ভ্রমণ করিয়া কোথায় কোন্ গাছে কোন্ ফল পাকিয়াছে তাহা পাড়িতেন, কাহারও বা

তলায় পড়িয়াছে তাহা কুড়াইয়া আনিতেন, শুকান নারিকেল পাতাটী পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। রামেশ্বর এই ভোরের সময়েই শাক সবজী ও অন্যান্য তরকারী গুলি বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে আনিতেন, আসিয়া দেখিতেন ব্রাহ্মণী সেই সময়ের মধ্যে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পাক করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইতিমধ্যে দাসী গোরু গুলিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া ভোরের বাতাসে রাখিয়াছে। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া গায়ের ময়লা গুলি স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতেন, দাসী তাহাদের খাবার আনিয়া যোগাইত, আপনি তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। এই সকল কাজ করিতে করিতে তিনি বালসূর্য্যকে উষার আলিঙ্গন লইতে দেখিতেন; দেখিবা মাত্র গঙ্গাস্নানে যাইতেন, ফিরিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর সংবাদ পত্র লইয়া পড়িতেন। সংবাদ পত্র পড়িতে পড়িতেই বাড়ী হইতে ডাক আসিত, বাড়ীতে গিয়া আহার করিতেন, আহারান্তে আপিশে বাহির হইতেন, যাইবার সময় আপিশে জলযোগের আয়োজন সঙ্গে লইয়া যাইতেন। গৃহজাত সুন্দর জল খাবার সুখাদ্য অথচ অল্পব্যয়ে হইত।

আপিশ হইতে আসিতে সন্ধ্যা হইত। বাড়ীতে আসিয়া রামেশ্বর মুখ হাত ধুইয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন এবং কিঞ্চিৎ জলযোগের পর তামাকু খাইতে খাইতে বাগানের দিকে একবার বেড়াইতে যাইতেন। বাগানে গিয়া গাছ পালা গুলিতে জল সেচনাদি রীতিমত হইয়াছে কিনা তাহার বিশেষ তদন্ত করিতেন। সাবধান প্রভুর দাসদাসীরাও সতর্ক।

প্রতিদিনই তিনি বাগানে যাইতেন এক দিনও হতাশ হই-তেন না। কোন প্রকারে তাহাদের কখন কোন ত্রুটী দেখিলে নিজে তাহা সংশোধন করিতেন ও তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর দুই আড়াই ঘণ্টাকাল বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া বৈঠকখানায় তাস পাশা খেলিতেন। রাত্রিতে কোন কর্ম্ম কাজ দেখিতেন শুনিতেন না, সমস্ত দিনের পর নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে অঙ্গ স্থাপন করিয়া শ্রম-ভার নষ্ট করিতেন।

রামেশ্বরকে তৈল লবণাদির জন্য নিত্য নগদ পয়সা বাহির করিতে হইত না। দোকানদারকে কিছু টাকা কর্জ্জ দেওয়া ছিল, বৎসরের মধ্যে ঐ সকল জিনিষের যে নিম্নতম দর হইত, সেই দরে সে সম্বৎসর তাঁহার সংসরের তৈল লবণ যোগাইত। বাজারের উঠ্‌তি কাটতি ধর্ত্তব্য হইতনা। রামে-শ্বরের টাকার সুদ ছিল না, দোকান দারের মূল্যের দাবী ছিল না। সংসারের সুসার অসুসার সকল গৃহস্থেরই থাকে। বাজার হইতে কখন কোন জিনিষ আনিয়া দুদিন পরে তাহার মূল্য দিতে হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে এমনি সতর্ক ছিলেন যে, কড়ারের পূর্ব্বেই তাহা পরিশোধ করিতেন, কাহা-কেও কখন টাকা চাহিতে আসিতে হইত না। এজন্য তাঁহার বিলক্ষণ বাজার সম্ভ্রম ছিল। গৃহস্থ লোকের বাজারসম্ভ্রম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তিনি ভাল রকম বুঝিতেন। যাঁহার বাজার সম্ভ্রম নাই, তিনি কোন প্রকার সম্ভ্রমের দাবী করিবার যোগ্য নহেন। বাজার সম্ভ্রম থাকিলে গৃহস্থ অনেক সময় অনেক দায় হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

সংসারের উপরোক্ত কাজ ব্যতীত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কুটুম্ব সজ্জন দিগের সহিত সদ্ব্যবহার এবং তাঁহাদিগের সহিত লৌকিকতা রক্ষা করাকেও গৃহস্থের একটী প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে জানিতেন। কটুম্বদিগের নিকট যাঁহাদের লৌকিকতা রক্ষা না পায়, তাঁহারা জনসমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে আসিয়া পশু পক্ষীরাও আপনাদিগের উদর পূরণ করে, কিন্তু উদর পূরণ ব্যতীত গার্হস্থ্যধর্ম্ম বজায় করা, লোক লৌকিকতা রক্ষা করা, গৃহীদিগকেই করিতে হয়। তাঁহাদের দ্বারা যদি সে সকল সামাজিক নিয়ম রক্ষা না পাইবে, তবে নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ কি? অতএব তজ্জন্য যে ব্যয় বা শ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলে বা কৃপনতা করিলে মনুষ্যনামের যোগ্যতা রক্ষা পাইবে না। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পরেই কুটুম্বগণের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আমাদের সুখ দুঃখ তাঁহাদের সহিত দৃঢ়তর সূত্রে আবদ্ধ, যাঁহারা সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তাঁহাদের সহিত কদাচ অসদাচরণ করা বিধেয় নহে, প্রত্যুত যাহাতে তাঁহারা আপ্যায়িত হয়েন, সদা সন্তুষ্ট থাকেন, তদ্রূপ ব্যবহার করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

যাঁহার উপর সমস্ত সংসারের কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত থাকে, তিনি চারিদিক্ চাহিয়া সকল দিক্ বজায় করিয়া কার্য্য করিলে তবে নামের উপযুক্ত সম্মানলাভে সমর্থ হয়েন। কর্ত্তা হইলে সমদর্শী হইতে হইবে। কর্ত্তা যদি পক্ষপাতী হয়েন, অর্থাৎ সকলকে যদি সমান স্নেহ, সমান যত্ন না করেন,

তবে তিনি কোনমতে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণের যোগ্য নহেন, এবং তাঁহাকে ধর্ম্মতঃ পতিত হইতে হয়। দশজনের উপর যাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাঁহাকে দশরকম স্বভাবের লোকের সহিত চলিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে সুবোধ অবোধ সকল প্রকারের লোক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সকলকে সমান ভাবে চালান অল্প বিচক্ষণতার কার্য্য নহে। কর্ত্তা নাম শুনিতে বড় মধুর বটে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখা বড় কষ্টকর। কর্ত্তা হইলেই কতকটা স্বার্থত্যাগ ও অনেক সহ্য সমাবেশ করিতে হয়, নতুবা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে ও সংসারে শান্তি রাখিতে পারা যায় না।

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারটী প্রথমে খুব বড় না থাকুক কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্যে অনেক গুলি নিরাশ্রয় আত্মীয় অন্তরঙ্গ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকে ও দাসদাসী গুলিকে লইয়া তিনি বেশ সুখী হইতে পারিয়াছিলেন, এবং পরিবারস্থ সকলেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া গৃহস্থালীকে সংসারজ্বালার বহির্বর্ত্তী স্থান মনে করিতেন, যেন সেখানে অশান্তির প্রবেশাধিকার নাই।

একবার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর পীড়া হয়, তাহাতে তাঁহাকে দুই রাত্রি জাগরণ করিতে হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরেই একটী দাসীর পীড়া হয়, সে পীড়া সহজে সারিল না, রামেশ্বর অতিরিক্ত চারি পাঁচ রাত্রি সমানভাবে যাপন করেন। এজন্য তাঁহার সংসারে দাসদাসী থাকিতে সকলেই প্রার্থনা করিত। সকলেই বলিত রামেশ্বরের সুখের সংসার এবং রামেশ্বর তাহার উপযুক্ত কর্ত্তা।

বিষয়কার্য্য অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিসাবপত্র।

ব্যবসায়ী ব্যতীত প্রায় সকল গৃহস্থই মনে করিয়া থাকেন, সংসারে যেমন আয় হইল, তেমনি ব্যয় করিয়া যদি কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে রহিল, না হয় জমা খরচে ঠিক হইল, সকল গোল মিটিয়া গেল। যে মাসে খরচের অকুলান হইল, দশটাকা দেনা হইল, আপনার উপায়ের টাকা আপনি খরচ করিলাম, কাহাকেও হিসাব দিতে হইবে না, তাহার আবার হিসাব পত্রের প্রয়োজন কি? বাস্তবিক এরূপ মনে করা ভ্রম। অনেক সময় এমন হয় যে, সমস্ত খরচ মনে থাকেনা, খরচ করিতে করিতে মনে হইয়া থাকে, "তাইত এমাসে এত টাকা আসিল, কোথায় গেল?" মনে মনে খরচের হিসাব করিতে করিতে হয়ত পাঁচটা মনে পড়িল দুইটা মনে আসিল না, সন্দেহ হইতে লাগিল, "তাইত টাকা গেল কোথায়?" তখন মনে অনেক তোলা পাড়া হইতে থাকে

"বাক্সে টাকা ছিল হয় কেহ খুলিয়া লইল, না হয় কাহাকেও ভ্রমক্রমে অধিক টাকা দেওয়া হইয়াছে, কি কোন প্রকারে হারাইয়া গিয়াছে।" প্রকৃত পক্ষে যে বাবতে সেই টাকা খরচ হইয়াছে তাহা যদি কাহাকেও শোধ করা গিয়া থাকে, সে যদি অধার্ম্মিক হয় তবে সে তাহার প্রাপ্তিস্বীকার না করিয়া ঠকাইয়া লইতে পারে। এই সকল সন্দেহ ও ক্ষতি হইতে অব্যাহত থাকিতে হইলে জমা খরচ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সত্য বটে অনেকেই চাকরী করেন, যেমন উপায় করেন তাহাতে সংসার চলিয়া যায়, অনাটন নাই, কিন্তু আপনার মনকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য আয় এবং ব্যয়ের টাকা হিসাব রাখিলে সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়, তজ্জন্য অধিক পরিশ্রম বা ব্যয়স্বীকার করিতে হয় না। যে গৃহস্থ বেশ আঁটাসাটা, সংসারে সকল দিক রাখিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া চলেন, তাঁহাদের জমা খরচ থাকে। মনে কর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটা খরচ হইয়াছে, আজি তাহা জানা আবশ্যক, কিন্তু হয়ত তোমার তাহা মনে নাই, যদিও আছে তাহাও স্পষ্ট নাই, সে ক্ষেত্রে সন্দেহের ঘোরে কত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

মহাজন দিগের ঘরে হিসাব পত্র রাখিবার অনেক প্রকার কাগজ পত্র থাকে, কিন্তু তাহাদের সহিত গৃহস্থালীর সংস্রব বড় কম যথা,—খসড়া জমাখরচ, খতিয়ান ইত্যাদি বহী গৃহস্থালীর জমা খরচ রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয় না, ঘর খরচের জন্য সামান্য লেখাপড়া করিয়া রাখিলেই চলিয়া যায়। কোন্ দিন কত টাকা আসিল, সেই টাকা কিরূপে খরচ হইল, কেবল মাত্র তাহা লিখিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হয়। যাঁহারা কাজ

কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, আপনাদের কাজ কর্ম্ম লইয়া প্রায়ই বিব্রত থাকেন, আপিসে কাজ কাজ করিতে করিতেই সময় থাকেনা, অথচ বাড়ীতে অন্য অভিভাবক নাই, এমতস্থলে গৃহিণীরাও সামান্য পরিশ্রমে সংসারের খরচপত্র লিখিয়া রাখিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে সাংসারিক সাধারণ জমাখরচের একটী আদর্শ প্রদত্ত হইতেছে। যে গৃহিনী অশিক্ষিতা, সময় না থাকিলেও কর্ত্তাকে তাহা করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
শরণম্।

সন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।
১লা বৈশাখ, বুধবার।

জমা।——————————খরচ——————

জমা		খরচ	
মার্চ মাসেরবেতন বাবত	৫০৲	চাউল ৫ মন ৩॥০ হিঃ	১৭॥০
		সরিষার তৈল ৴৭॥ সের।৴০ হিঃ	২।৴১
		জ্বালানী রেড়ীর তৈল ৴৪ সের।০ হিঃ	১৲
		নারিকেল তৈল ৴১॥০ সের।৵০ হিঃ	॥৴০
		লবণ ৴৫ সের ৴৫ হিঃ	।৵৫
		ডাউল ৴১০ সের ৴৫ হিঃ	৸১০
		কাহ্নু গোয়ালিনী দুগ্ধের দরুণ।	৪৲
মোট	৫০৲		২৬॥৴৫

নিজরোজ	৫০৲
সাবেক	০
মোট	৫০৲
বাদ খরচ	২৬॥৴৫
বাকী	২৩৷৵১৫

শ্রীশ্রীদুর্গা।
শরণম্।

সন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।
২ রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

জমা		খরচ	
বাগানের আম্রবিক্রয়	৫॥৵০	রমানাথ রজক কাপড় কাচান বাবত	২৲
		জ্বালানী কয়লা ২॥০ মন ॥০ হিঃ	১।০
		বিভূতি ভূষণের ধুতি ১জোড়া	৪॥০
		সরোজিনীর বডি ১টা	২॥০
		বীরজা চরণের শ্বালকের বিবাহে লৌকিকতা	২৲
		১২৯৪ সালের জন্য বঙ্গবাসীর অগ্রিম মূল্য (পাঠাইবার খরচ সমেত)	২৵০
		বাজার খরচ	।০
		বিভূতি ভূষণের মার্চ মাসের স্কুলের বেতন	৩৲
মোট	৫॥৵০	মোট	১৭॥৵০

নিজরোজ	৫॥৵০
সাবেক	২৩।৵১৫
মোট	২৯৲১৫
বাদ খরচ	১৭॥৵০
বাকী	১১।৵১৫

গোয়ালার দুগ্ধের মূল্য নিত্য দিবার রীতি প্রায়ই নাই, কাপড় কাচান সম্বন্ধেও তদ্রূপ, এবং কোন কোন গৃহস্থের বস্ত্রাদি নগদ মূল্যে লওয়া হয় না, প্রায়ই কিছু কিছু বাকী রাখা হইয়া থাকে, এজন্য সেই সকল হিসাব পরিষ্কার রাখিবার জন্য এক একটী পৃথক খাতার প্রয়োজন হয়। অতএব তাহাদেরও এক একটী আদর্শ প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সহায়।

হিসাব শ্রীমতি কাদম্বিনী গোয়ালিনী।

সাং গোতান, হাল সাং করোয়া।

সন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

মাহ বৈশাখ।

জমা		খরচ	
১লা বৈশাখ	৪৲	১লা বৈশাখ	
		দুগ্ধ ৴১ সের	৷১০
		২রা বৈশাখ	
		দুগ্ধ ৴২৷৷ সের	৶১৫
		ইত্যাদি।	

মাসকাবারের শেষে সমুদয় জমা ও সমুদায় খরচ ঠিক দিয়া হিসাব করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সহায়।

হিসাব শ্রীরমানাথ রজক।

সাং ভাঙ্গামোড়া। *

সন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, মাহ বৈশাখ।

জমা————————— খরচ—————————

২রা বৈশাখ—————২৲ ২রা বৈশাখ।

লাল কিনারী প্রমান ধুতি—৪খানা।

সাদা প্লেট কামিজ———৪ খানা।

দেশী সরু চাদর———৩ খানা।

লংক্লথের ধুতি————২ টা।

মোজা।——————২ জোড়া।

১০ ই বৈশাখ

কাল কিনারী সাটী———৪ খানা।

৫ হাতী কালকিনারী

ধুতি ——————২ খানা।

ইত্যাদি।

---

* খাতার জমাখরচের উপর কোন স্থানে কি দরে কাপড় চাচান হয় লিখিয়া রাখিলে সহজে দেনা পাওনা বুঝা যাইবে।

জমা খরচ রাখিবার জন্য বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে যখনই যাহা জমা বা খরচ হইবে তখনই তাহা লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সময়ান্তরে লিখিব মনে করিয়া ফেলিয়া রাখিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

যে সকল জিনিষ প্রতিদিন গ্রহণ করিতে হয়, তাহার মূল্য মাসকাবারে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে দেওয়া হয়, তাহার জন্য এক একটী পৃথক হিসাব রাখিলে কোন গোলযোগ ঘটে না, এবং সেই খাতা খানি বিক্রেতার নিকট রাখিয়া দেওয়া উচিত। যে দিন তাহাকে যত দেওয়া যাইবে, তাহা জমার ঘরে ও সে ব্যক্তি যে জিনিষ জোগাইবে তাহার পরিমাণ খরচের ঘরে লিখিয়া দিতে হইবে। খাতা খানি তাহার কাছে থাকিলে তাহার মনে স্থির থাকিবে যে, তুমি খাতায় কোন অসত্য কথা লিখিতে পারিবে না, এবং তুমি নিজে হাতে লিখিয়া দেওয়ায় তোমারও মনে কোন সন্দেহ হইতে পারিবে না যে সে কোন প্রকারে তঞ্চক করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্র লিখন প্রণালী।

বিষয়কর্ম্ম মধ্যে লেখা একটী আবশ্যকীয় কর্ম্ম। বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতে অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতার পরিচায়ক; তবে সংসারে সকলেই যে জ্ঞানী ও বিদ্বান্ তাহা নহে, তজ্জন্যই আমরা কয়েকখানি পত্রের আদর্শ

লিখিয়া দিতেছি, সে গুলি পাঠ করিয়া সাধারণতঃ পত্রাদি লিখিবার পক্ষে অনেকটা আনুকুল্য লাভের প্রত্যাশা আছে।

বিদেশস্থ পিতার পুত্রকে পত্র লিখিতে হইলে এইরূপে লিখিতে পারেন। সাংসারিক প্রয়োজনীয়তার অনেকটা ভিন্নতা প্রযুক্ত স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।

বর্দ্ধমান।
রাধানগরের বাসাবাটী।
১৩ই বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

চিরজীবেষু,

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন।

প্রিয়তম! কয়েক দিন তোমার পত্রাদি না পাইয়া ভাবিত আছি। আমার বিবেচনা হয়, তোমার বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হওয়া প্রযুক্ত পাঠাভ্যাসে ব্যস্ত আছ। যাহা হউক তজ্জন্য পত্র লিখিতে ক্ষান্ত থাকা ভাল হয় নাই। অবিলম্বে বাটীর সংবাদ লিখিবে। আমি বাটী হইতে আসিবার সময় বিভাবতীকে কিছু অসুস্থ দেখিয়া আসি, কেমন অছে বিশেষ করিয়া লিখিবে।

তোমাদের খরচের জন্য যে টাকা দিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দিবে।

বাটীর ভৃত্যগণকে দিয়া বৈটকখানার সম্মুখের বাগানের মৃত্তিকা খনন করাইবে এবং সন্ধ্যা কালে ফুলগাছ গুলিতে জল দেওয়াইবে।

আমি আগামী "কুইন্স বার্থ ডের" ছুটীতে বাড়ী যাইব। সেই সময় তোমাদের বস্ত্রাদি লইয়া যাইব।

যদি তোমাদের খরচের টাকা ফুরাইয়া গিয়া থাকে, তবে শ্রীমান্ যদুনাথ ভায়ার নিকট পাঁচ টাকা লইয়া আবশ্যক মত খরচ করিবে। তোমরা সদা সাবধানে থাকিবে।

আমি ভাল আছি, কেবল তোমাদের সংবাদ না পাইয়া একটু চিন্তিত রহিলাম ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়।

পুত্র পিতাকে নিম্নলিখিত প্রকারে পত্র লিখিবেন।

কুমারপুর।

১৮ই বৈশাখ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীচরণেষু।

প্রণতি পুর্ব্বক নিবেদন।

আপনার গত ১৩ই বৈশাখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। যে যে কাজ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র ক্রটী হইবে না, সকলই সম্পন্ন করিব।

আমার বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এবৎসর আমি নূতন শ্রেণীতে উঠিবার অনুমতি পাইয়াছি। যদি এবৎসর পুরস্কার বিতরণ হয়, তবে আমি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইব। মাষ্টার মহাশয় আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং আমার পাঠোন্নতির পক্ষে বিশেষ যত্ন লয়েন।

আপনি গতবারে বাড়ী আসিবার সময় বিভাবতীর জন্য "বডি" আনিয়াছিলেন, আমার জন্য কিছুই আনেন নাই। এবার আসিবার সময় এক জোড়া কামিজ আনিবেন। যদি

অধিক দাম না লাগে তবে, ঘোষালদের হীরালালের যেমন গরদের কোট, তেমনি একটী কোট আমার জন্য আনিবেন। আপনি যে দিন বাড়ী হইতে বর্দ্ধমান যান, বিভাবতী তাহার পর দিনই ভাত খাইয়াছিল, সে এখন বেশ ভাল আছে।

অদ্য ১০।১২ দিন পূর্ব্বে শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণীর সামান্য জ্বর হওয়ায় তিন চারি দিন তিনি ভাত খান নাই; আজি সাত আট দিন বেশ ভাল আছেন, এবং পূর্ব্বমত আহার করিতেছেন।

"মঙ্গলা" গাভীটা একটী বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বকনা বাছুর প্রসব করিয়াছে। কৈলাস বলে এবার ৪।৫ সের দুগ্ধ দিবে। তাহার খাবার ভাল বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে। আসিবার সময় বাছুরটীর জন্য একটী বাল্‌তি আনিবেন।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল, আপনার মঙ্গলাদি লিখিবেন। ইতি

প্রণত
শ্রীবিনোদ বিহারী রায়।

বিদেশস্থ যুবক আপন সহধর্ম্মিনীকে এইরূপে পত্র লিখিয়া থাকেন।

এলাহাবাদ, দারাগঞ্জ।
১৭ই বৈশাখ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

প্রাণাধিকা বসন্ত!

আজি কয়েক দিবস তোমার পত্র না পাইয়া কি অবস্থায় আছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। ঈশ্বর পরাধীন করিয়াছেন, পরসেবা ব্যতীত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই, তাই আপিশে যাই, কাজ করি, যতক্ষণ সেখানে থাকি

কর্ম্ম করি, ভয়ে ভয়ে তোমাকে মন হইতে সরাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই তাহা পারি না, এজন্য সময়ে সময়ে কাজে ভুল হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভ্রূকুটী সহ্য করিতে হয়, কি করি মন মানে না।

পূজার সময় যখন বাড়ী হইতে আসি, আসিবার পূর্ব্ব রাত্রি আমাদের জাগরণে দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু মনের কথা সমস্ত বলিয়া ফুরাইতে পারিলাম না। যখন বিছানা হইতে উঠি তুমি কাঁদিতে লাগিলে, সে দৃশ্য মনে হইলে মন ব্যাকুল হয়, ইচ্ছা হয় ঈশ্বর পাখা দেন ত উড়িয়া যাই।

যখন বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করি, তখন তুমি গবাক্ষে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, তোমার মুখ খানি দেখিয়া মনে অনেক গুলি ভ্রমের উদয় হইল। যেন ঢল ঢলে কমল কুসুম প্রভাতে মলিন, এ ঘোর অসম্ভব কথা। সেই নিষ্প্রভ নলিনী, তাহাতে আবার নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগ যেন ভ্রমর পংক্তি, আরও অসম্ভব, প্রভাতের পদ্ম বলিয়া কি তাহাতে নীহারকলিকারূপে অশ্রু বিন্দু! আহা তোমার সেই গোলাভসন্নিভ গণ্ডস্থল দুইটী, সেই মধুর হাসি, সেই অমিয় মাখান কথা গুলি মনে হইলে আর আমাতে আমি থাকি না, আপনা হারা হই,—এ অবস্থা-তেও যদি প্রতিদিন তোমার পত্র এক এক খানা পাই, তাহা হইলেও মনটা অনেক সুস্থ থাকে, কিন্তু তোমার সে বিষয়ে মনোযোগ নাই, মধ্যে মধ্যে তুমি আমাকে এরূপ চিন্তান্বিত কর যে লিখিয়া শেষ করা যায় না। প্রতিদিন ডাক পেয়াদার প্রতীক্ষা করি, তাহাকে দেখিলেই মনে হয় যেন তোমার অমৃত

স্রাবী পত্র এক খানি পাইয়া সমস্ত জালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতেছি। যাহা হউক এই পত্র পাইবা মাত্র উত্তর লিখিয়া আমার সমস্ত চিন্তা দূর করিবে।

তুমি আজি কালি কি পুস্তক পড়িতেছ? উলের কাজ কত দূর শিখিলে? আমাকে যে টুপিটী পাঠাইয়াছিলে, তাহা দেখিয়া অনেকেই তোমার কারুকার্য্যের সুখ্যাতি করিলেন। আমার বন্ধু প্রথমনাথের জন্য সেই রূপ একটী টুপি প্রস্তত করিয়া পাঠাইয়া দিবে।

এবার পূজার সময় বাড়ী গিয়া তোমাকে এখানে আনিব। ভগিনী বিনোদিনী কেমন আছে? তাহাকে আমার প্রণাম এবং বাড়ীর আর আর সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইবে। আপিশ যাইবার সময় হইল, বড় ব্যস্ত। আমি শারীরিক ভাল আছি, ইতি।

তোমারি
সুধাংশু শেখর।

নিম্ন লিখিত পত্র খানি স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে লিখিতেছেন।

বালী।
২০ শে বৈশাখ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

প্রাণেশ্বর!

অদ্যকার ডাকে আপনার পত্রখানি পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। নিদাঘতপ্ত চাতকের পক্ষে বারিধারা যতদূর সুখের, এই পত্র খানি আমার পক্ষে ততোধিক।

কয়েক দিন পত্র না লেখার জন্য আপনি দুঃখিত ও চিন্তিত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে অধিনী বিশেষ অপরাধিনী

নহে। আজি সাত দিবস মাতৃদেবী পীড়িতা হইয়া ছিলেন। অধিক সময় তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকিতাম; তাহা হইলেও আপনাকে যে একখানি পত্র লিখিবার সময় করিয়া লইতে পারিতাম না এমত নহে। কিন্তু পত্র লিখিতে হইলেই তাঁহার পীড়ার সংবাদ জানাইতে হইত। তাঁহার পীড়া নিতান্ত সামান্য নহে। আপনি বিদেশে আছেন, পাছে চিন্তিত হয়েন এজন্য লিখি নাই। তাঁহার চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আরও দুই একদিন তিনি আরোগ্যলাভ করিতে না পারিলে আপনাকে আসিবার জন্য লিখিতাম। ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে তিনি পথ্য পাইয়াছেন।

আপনার পরাধীনতা ক্লেশের কথা শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। আমাদের এমন অবস্থা নয় যে চাকরী না করিলে চলিবে না, ঘরে বসিয়া থাকিলেও মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান আছে। কিছু মূলধন পাইলে যদি আপনি কোন ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার পিত্রালয় হইতে অনায়াসেই তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমার কোন মতে ইচ্ছা নহে যে আপনি বিদেশে পরাধীন অবস্থায় কালযাপণ করেন।

অধীনকে যে আপনি ক্ষণকালের জন্য মন হইতে অন্তর্হিত করিতে পারেন না সে কেবল ভালবাসার আধিক্য প্রযুক্ত, নতুবা দাসীর এমন কোন গুণ নাই যে আপানার পবিত্র হৃদয় অধিকার করিবার যোগ্য হইতে পারে। আপনি যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তাহাতে সঙ্গিনিগণ আমাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া থাকে। মনের কথা যদিও তাহাদিগকে প্রকাশ না করি, কিন্তু মনে জানি তাহাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য।

এবার হইতে সর্ব্বদাই পত্র লিখিব। সহস্র কর্ম্ম থাকিলেও ভুলিব না। আপনিও কিন্তু দাসীকে উত্তর লিখিতে বিলম্ব করিবেন না।

আমার "সীতার বনবাস" পড়া শেষ হইয়াছে। একবার আমার "স্বর্ণলতা" পড়িতে বড় সাধ যায়। যদি অনুমতি করেন তবে পড়িতে আরম্ভ করি। মুখুয্যেদের "নর্ম্মদার" স্বামী তাহাকে একখানি কিনিয়া দিয়াছেন।

আপনার টুপিটী দেখিয়া যে কেহ প্রশংসা করিবেন একথা মনেও করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা ছিল বন্ধু বান্ধবদের নিকট সেটী ব্যবহার না করিতে অনুরোধ করিব, কেননা সেটী আমার প্রথম উদ্যম। প্রমথ বাবুর টুপির জন্য কলি-কাতা হইতে আজি "উল" আনিবার জন্য দাদাকে পয়সা দিলাম। যত সত্বর পারি টুপী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইব। এখানকার সমস্ত মঙ্গল শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার নিতান্ত আশ্রিতা
শ্রীমতী বসন্ত বালা।

স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে পরস্পর পত্র লিখিবার পদ্ধতি প্রদর্শিত হইতেছে।

কলিকাতা, বাগবাজার।
১১ই ফাল্গুণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।

ভাই সরোজিনি!

অনেক দিন তোমার পত্র না পাইয়া ভাবিত আছি। তোমার দীর্ঘকাল নীরব থাকায় মনে হয় তুমি আমাকে একে-বারে ভুলিয়া গিয়াছ। আমি সম্প্রতি পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম,

সেখানে শুনিলাম যে তুমি এক্ষণে তোমার স্বামীর নিকট রাজমহলে আছ। প্রিয়তমা বিরাজমোহিনীর নিকট তোমার স্বামীর ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছি। এখন ভাই তুমি কেমন আছ? তোমার সকল কথাই বিরাজের নিকট শুনিয়াছি, কিন্তু তোমার নিজের নিকট সেই সকল কথা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। বিরাজ বলিল সরোজিনী আজি কালি বড় স্বামীসোহাগিনী; ভাই, বড় সুখের কথা। তোমরা সকলে সুখে থাক ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদের সুখের কথা শুনিলে বাস্তবিকই মনে বড় সুখ হয়। আমার কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, নিজের দুঃখের কথা লিখিয়া তোমাদের মানসিক শান্তির অপচয় করি, কিন্তু কি করি, দুঃখের কথা আত্মীয় স্বজনের কাছে বলিলে দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়, সেই জন্যই আজি লিখিতেছি। ভাই! আমি বড় কষ্টে আছি। স্বামী চাকরী করেন মাসে মাসে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, অর্থের অভাব নাই, কিন্তু অর্থ পাইলেই যে লোকে সুখী হইতে পারে এমন কিছু কথা নাই, পৃথিবীতে সকলে সমান অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম নহে। তাহা বলিয়া কি তাহারা সুখী হইতে পারে না? যাহাদের ধন নাই তাহারাই মনে করে ধনে সুখ আছে, কিন্তু সে কথা কতদূর সত্য যাহার ধন আছে সেই জানে।

কি কুক্ষণে ভাই, বিজাতী সভ্যতা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে! কি কুক্ষণে যে ভারতে সুরাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে জানিনা। আপিশের ফেরত স্বামীকে আমার একদিনও প্রকৃতিস্থ পাইলাম না। যদি সব রাত্রিতে

তাঁহাকে পাইতাম তাহা হইলেও ততটা দুঃখ ছিল না। কোন দিন রাত্রি ২ টায়, কোন দিন ৩ টায়, কোনদিন বা ভোরের সময় তিনি বাড়ীতে আইসেন। বিষ প্রয়োগ করিয়া যাহারা চৌর্য্যাদি অপকর্ম্ম করে বিলাতী আইনে তাহাদের দণ্ড আছে, কিন্তু এ বিষ প্রয়োগের শাস্তি নাই কেন বলিতে পার?

ভাই! তোমাকে কত লিখিব, সাত রাত সাতদিন ধরিয়া লিখিলেও আমার দুঃখের কথা শেষ হয় না। এই ক্ষুদ্র পত্রে কত লিখিব, শক্রেরও যেন এমন না হয়। আমার মত হত-ভাগিনী আর সংসারে কেহ নাই। চুঁচুড়ার হৃদয়কালীকে তোমার মনে হয়? সে আজ পাঁচ দিন হইল এইরূপ যন্ত্রণা পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আমার অদৃষ্টে কোন্ দিন কি আছে বলিতে পারি না। যাহা হউক ভাই সরো, যে কটা দিন থাকি তোমাদের সুখের কথা শুনিতে পাইলে সুখী হইব।

অভাগিনী শারীরিক ভাল আছে, তোমরা কেমন আছ লিখিবে, আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমারই
শরৎকুমারী।

সরোজিনীর উত্তর।—

রাজমহল।
১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।

প্রাণাধিকা শরৎ!

তোমার ১১ই ফাল্গুনের পত্র পাইলাম। এত দিন চিঠি লিখি নাই বলিয়া কিছু মনে করিও না। যেখানেই থাকি,

তোমাদিগকে কখন ভুলিব না। তোমরা যে মনে করিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লেখ, তাহাতে আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী জ্ঞানকরি।

ভাই, তুমি যে আমাকে বাল্যাবধি ভালবাসার চক্ষে দেখ, তাহা ভালরূপে জানি। বিরাজের নিকট তুমি যে সকল কথা শুনিয়াছ সে সমস্ত মিথ্যা না হইলেও অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া যে পতি সোহাগের অধিকারিণী না হইতে পারে, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, তাহার বাঁচিয়া কি সুখ!

ভাই শরৎ, তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া মনে বিলক্ষণ কষ্ট হইল। তারক বাবু ত' মূর্খ নহেন, তাঁহার লেখা পড়া বোধ আছে; তাইত! তাঁহার মত লোকে যদি ওরূপ কুক্রিয়াসক্ত হয়েন, তবে আমাদের সমাজের মঙ্গলের আশা কাহার নিকট করিব। বিশেষতঃ তুমি যেরূপ পতিপরায়ণা, তোমাকে যখন তিনি মনঃপীড়া দিতে কুণ্ঠিত নহেন, তখন আর অদৃষ্টের দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না। ভাই, সুরা আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিল। শুধু তুমি কেন, বঙ্গ দেশের কত রমণী যে তোমাপেক্ষা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাহা কি জান না? আমাদের দেশের যুবকগণ লেখা পড়া শিক্ষা করেন, যত দিন না পটদ্দশা অতিবাহিত হয়, তত দিন সচ্চরিত্র সাধু পুরুষের ন্যায় কাল যাপন করেন, আর যেই কলেজ হইতে বাহির হইয়া সমাজের সহিত মিশিতে আরম্ভ করেন, সেই এক একটী মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়ান। আমি কিছু এমন কথা বলিতেছি না যে সকলেই সেরূপ, কিন্তু দেখিলে শতকরা ১০ ১২টীকে ভালর দলে পাওয়া যায়।

কি করিবে ভাই, প্রাণপণে চেষ্টা কর, হতাশ হইও না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, অবশ্যই তিনি তোমার মত সরলা স্ত্রীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তোমার সকল দুঃখের পরিহার হইবে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই, জগাই মধাইয়ের মত পাষণ্ডও সাধুত্ব লাভ করিয়াছিল। অতএব কদাচ আত্ম-নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইও না।

আমরা সকলে ভাল আছি। মধ্যে মধ্যে তোমাদের সংবাদ লিখিতে ভুলিবে না। তবে ভাই আজি আসি।

তোমার ভালবাসার
সরোজিনী।

বন্ধুগণের মধ্যে পত্রাদি লিখিবার প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভবানীপুর।
৭ই বৈশাখ, ১২৯৪।

প্রিয় কালি!

সে দিন কলেজ হইতে আসিবার সময় তোমার বাসায় গিয়া অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ সাক্ষাৎ না হওয়ায় ৫ টার সময় ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিন হইতে তোমার কোন খপর পাই নাই।

আমাদের সঞ্জীবনী সভার বাৎসরিক অধিবেশনের দিন নিকট হইয়া আসিতেছে, এদিকে গ্রীষ্মাবকাশও পাওয়া যাই-তেছে। একারণ আগত শনিবার দিন বাড়ী যাইবার ইচ্ছা করিতেছি। বোধ হয় তোমারও ঐ দিন যাইবার পক্ষে আপত্তি হইবে না; প্রথম ট্রেণেই যাইতে হইবে। অতএব সকালে মুখ হাত ধুইয়াই ষ্টেশনে যাইবে।

এ বৎসর উৎসবে গীতবাদ্যাদি তামসিক ব্যাপারে বৃথা অর্থ ব্যয় না হয় এমন চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে দেশের গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর হয় অগ্রে এমন সব অনুষ্ঠান করা চাই। সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে যেরূপ চেষ্টা করা যাইতেছে, তাহা নিতান্ত মন্দ নহে, বরাবর সেরূপ করিতে পারিলে অনেক চাসা ভূষা, কৃষাণ মজুর, লেখা পড়া শিখিয়া আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

যাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিয়োগ নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য "মহারাণীর জুবিলী" উপলক্ষে তাঁহার নিকট একখানি আবেদন পাঠাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

খোলাভাটীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইতেছে, অতএব তাহার প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে চলিবে না।

মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছি আগত রবিবারে যাহাতে আমাদের সভার পূর্ণাধিবেশন হয়। তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিবেন এবং এক খানি আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। আমরা শনিবারে না যাইলে রবিবারের সভার কোন কাজই করিতে পারিব না। ষ্টেশনে আসিবার সময় ভূধারীকে বাসা হইতে ডাকিয়া লইবে। তাহার সহিত গতকল্য আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেও আমাদের সঙ্গে বাড়ী যাইবে।

আমি ভাল আছি আশা করি তুমিও সেইরূপ ইতি।

একান্ত বশম্বদ—

হরিপদ।

কালীবাবুর উত্তর।—

শ্যামবাজার।

৮ই বৈশাখ, ১২৯৪।

প্রিয় হরি!

ভাই, এইমাত্র তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি যে সে দিন আমার বাসায় আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছ তাহা আমাদের বাসায় সারদা বাবুর নিকট শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যেমন অপেক্ষা করিয়াছিলে আর ১০। ১৫ মিনিট থাকিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত। বাজারে সামান্য একটা দরকার ছিল তজ্জন্য তোমাকে কষ্ট দিতে হইল, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। তোমার আসিবার সংবাদ পূর্ব্বে পাই নাই, পাইলে কখন এরূপ হইত না, যাহা হউক সে জন্য আমাকে মাপ করিবে।

বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে যাহা অবধারিত করিয়াছ কিছুতেই তাহার ত্রুটী হইবে না। শনিবার প্রাতে ঠিক ৭ টার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিব। যদি দৈবাৎ তোমার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারি, তবে তোমার এক খানা টীকিট কিনিয়া রাখিব।

সভার বাৎসরিক উৎসব সম্বন্ধে যাহা যাহা অবধারিত করিয়াছ, আমার তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমত জানিবে। তুমি সকল কথাই লিখিয়াছ, কিন্তু বর্ষিক বিজ্ঞাপনী লিখিবার বন্দোবস্ত কি করিয়াছ? কোন ছাপাখানার সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেখানে গিয়া বিজ্ঞাপনী লিখিয়া পাঠাইলেও চলিতে পারিবে, নতুবা অনেক বিলম্ব হইবে। এমন কি উৎসবের পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনী মুদ্রিত হইয়া উঠিবে না।

অতএব তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে ভুলিবে না। আগামী রবিবারে কলিকাতায় আমার একটু কাজ ছিল কিন্তু সাধারণের কার্য্যানুরোধে তাহা হইয়া উঠিবে না। সাক্ষাতে সমস্ত জানাইব, তবে আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার নিতান্ত অনুগত,

কালীপ্রসন্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দলিল লিখিবার প্রণালী।

সাংসারিক হিসাব ও পত্রাদি লিখিবার বিষয়ে গৃহীমাত্রেরই যেমন জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তেমনি জমি জায়গার স্বত্ব আদান প্রদান সম্বন্ধীয় নিয়মাদি পরিজ্ঞাত না থাকিলে আমাদিগকে সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তৎপ্রতিকার জন্য আমরা নিম্নে কতকগুলি খৎ কোবালা প্রভৃতি দলিলের আদর্শ প্রদান করিতেছি, তদনুসারে কর্ম্ম করিলে বিষয়ী লোকদিগের আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

যে ঋণের জন্য রীতিমত সুদ দিতে হয়, তাহা গ্রহণ করিবার সময় মহাজনকে যে দলিল লিখিয়া দিতে হয়, তাহাকে খৎ রশীদ বা তমসুক কহে যথা;—

শ্রীশ্রীহরি।

শরণম্।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ রায়

মহাশয় বরাবরেষু।—

শ্রীহরিচরণ দে।
সাং নিশ্চিন্তপুর।

লিখিতং শ্রীহরিচরণ দে সাং নিশ্চিন্তপুর কস্য তমস্থক পত্রলিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমি নিজ প্রয়োজন বশতঃ আপনার নিকট কোম্পানি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ লইলাম। ঐ টাকার সুদ মাসিক শতকরা এক টাকার হিসাবে দিব এবং অদ্যকার তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে সমস্ত টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিব। একবারে সমস্ত টাকা শোধ করিতে না পারি, যখন যত টাকা দিব এই খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়িয়া দিব। খতের পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অন্য কোন রসীদের ওজর আপত্তি করিব না। যদি করি, তবে তাহা মঞ্জুর নহে, এতদর্থে উপরোক্ত টাকা আপন তস্থরুপাতে আনিয়া তমস্থক পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি তাং ২রা বৈশাখ সন ১২৯৪ সাল।

সাক্ষী—

শ্রীরামতারণ দে, সাং ভাঙ্গামোড়া।

শ্রীজগন্নাথ অধিকারী, সাং ঐ।

তমস্থক ব্যতীত আজি কালি টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য হ্যাণ্ডনোট নামে এক প্রকার দলিল লিখিত হইয়া থাকে।

হ্যাণ্ডনোটে টাকা শোধের কড়ার লিখিত থাকে না, প্রত্যুত এরূপ ভাবে লিখিত হইয়া থাকে যে, মহাজন যখনই টাকা চাহিবেন তখনই তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। এজন্য হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিবার দিন হইতে ঠিক তিন বৎসর পরে উহা তমাদি অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। হ্যাণ্ড-নোটের আদর্শ যথা;—

এতদ্দ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, দাবী করিবামাত্র অত্র দলিলের অধিকারীকে কোং ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিব। অদ্যকার তারিখ হইতে যত দিন পরে টাকা শোধ করিব, প্রতিমাসে প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে সুদ দিব। ইতি তাং ২রা বৈশাখ সন ১২৯৪ সাল।

সাক্ষী।—শ্রীরাম চরণ চট্টোপাধ্যায়, সাং দিনাজপুর।
শ্রীহরিসাধন বসু, সাং নস্করপুর।
শ্রীহৃদয় নাথ সরকার, সাং নারায়ণগঞ্জ।

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণের লিখন পঠন প্রণালী যথা;—

মহামহিম
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।
সাং বাথরপুর সবরেজিষ্ট্রী জাহানাবাদ
জেলা হুগলী।

শ্রীজন্মেঞ্জয় দত্ত।
সাং ভাঙ্গামোড়া।

লিখিতং শ্রীজন্মেঞ্জয় দত্ত পিতা ৺রাধা গোবিন্দ দত্ত সাং ভাঙ্গামোড়া পরগণে বালিগড় সবরেজিষ্ট্রী ও থানা জাহানাবাদ জেলা হুগলী কস্য জমি বিক্রয় কোবলা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে জেলা হুগলী থানা ও সবরেজিষ্ট্রী জাহানাবাদের

অন্তর্গত পরগণে বালিগড় মৌজে বাথরপুর গ্রামের নিম্ন লিখিত চৌহদ্দীস্থিত আমার পৈতৃক লাখরাজ /৪ চারি বিঘা জমি, পুষ্করণী ও বৃক্ষাদি যাহা কিছু তাহাতে আছে, সমস্ত সমেত ৪০০৲ চারিশত টাকা মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিলাম। উক্ত জমিতে আমার যে স্বত্ব ছিল, অদ্যকার তারিখ হইতে আপনি সেই স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করিতে থাকুন। কস্মিন কালে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণের কেহ কোন আপত্তি করি কিম্বা করে, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে উপরোক্ত পণের টাকা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া সুস্থ দেহে ও সচ্ছন্দ মনে এই বিক্রয় কোবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি তাং ১২ই বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

সাক্ষী।

শ্রীনিধিরাম হাজরা, সাং বাথরপুর।
শ্রীনিত্যানন্দ পাল, সাং ভাঙ্গামোড়া।
শ্রীরাস বিহারী ঘোষাল, সাং ঐ।
শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্য, সাং শোমালুক।

চৌহদ্দী।

উত্তরে ৺ রাম নারায়ন ভট্টচার্য্যের ব্রহ্মোত্তর। পূর্ব্বে শ্রীদিগম্বর কুণ্ডুর জমাই জমি। দক্ষিণে শ্রীরামগোবিন্দ মিত্রের বাগান। পশ্চিমে শ্রীদীননাথ রায়ের পুষ্করিণী।

বন্ধকী কোবলা লিখিবার প্রণালী।

মহামহিম

শ্রীযুক্ত বাবু রাজ চন্দ্র রায় মহাশয়

বরাবরেষু।

শ্রীযাদব চন্দ্র ঘোষ
সাং মদনমোহনপুর

লিখিতং শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষ, পিতা ৺রামজীবন ঘোষ সাং মদনমোহনপুর থানা ও সবরেজিষ্ট্রী ধন্যাখালী, জেলা হুগলী। কস্য জমি বন্ধক পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমি নিজ প্রয়োজন বশতঃ জেলা বর্দ্ধমান, থানা ও সবরেজিষ্ট্রী জামালপুরের অন্তর্গত মাধবপুর গ্রামের দক্ষিণ মাঠে আমার নিম্ন লিখিত চৌহুদ্দীস্থিত যে ৵৩ বিঘা পৈতৃক লাখরাজ জমি আছে, তাহা আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া ১২৫৲ একশত পঁচিশ টাকা কর্জ্জ লইলাম। এই টাকার সুদ শতকরা মাসিক এক টাকা হিসাবে দিব, এবং সন১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে সুদ সমেত সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব। একবারে সমস্ত টাকা শোধ করিতে না পারি, যখন যত টাকা দিব এই বন্ধকী কোবলার পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিয়া দিব। কোবলার পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অন্য রশীদ পত্রাদির ওজর করিতে পারিব না। যদি নিয়মিত সময় মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, তবে আপনি উপযুক্ত আদালতের সাহায্যে সুদসমেত সমস্ত

টাকা আদায়ের জন্য ঐ জমি ও আমার অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। এতদর্থে ১২৫৲ একশত পঁচিশ টাকা বুঝিয়া পাইয়া বন্ধকী কোবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

সাক্ষী।

শ্রীহরিসাধন সামন্ত, সাং রামনগর।

শ্রীলালমোহন দে, সাং বাঘনান।

শ্রীদেবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সাং জামালপুর।

চৌহদ্দী।

উত্তরে ৺হরিমোহন ঘোষের জমাই জমি।

পূর্ব্বে শ্রীরাধানাথ সামন্তর লাখরাজ।

দক্ষিণে শ্রীরামদাস শেঠের দেবোত্তর।

পশ্চিমে শ্রীশশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মোত্তর।

পাট্টা লিখিবার পদ্ধতি।

শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র

সুচরিতেষু।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল।
জমীদার।

শুভ জমি জমার পট্টক পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমার জমিদারী ভুরষিট পরগণার জয়পুর গ্রামের উত্তর মাঠে

রাজীবলোচন রায়ের জমাই জমির দক্ষিণ, রমানাথ দত্তের লাখরাজ জমির পশ্চিম, যদুনাথ সাধুখাঁর চাকরাণ জমির উত্তর এবং নীলমাধব হাজরার লাখরাজ পুষ্করণীর পূর্ব্ব এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত দুই বন্দে ১৪ বিঘা শালি জমি তুমি জমা করিয়া লইবার প্রার্থনা করায়, ১৬ ষোল টাকা জমা ধার্য্যে, ৫ পাঁচ সন মেয়াদে তোমাকে জমা করিয়া দেওয়া গেল। তুমি নিম্নোক্ত কিস্তিমত উক্ত গ্রামের মালের কাছারীতে রীতিমত খাজনার টাকা দিয়া দাখিলা লইবে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদিতে ফসল না জন্মিলে যদি খাজনা দিবার আপত্তি কর, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। কিস্তি খেলাপ হয় গ্রাম হার সুদ দিতে বাধ্য থাকিবে। এই কড়ারে কবুলতি লইয়া পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল, তারিখ ১৬ই বৈশাখ।

মোট জমা——১৬৲ টাকা

কিস্তির জায়।—

মাহ আষাঢ়——৪৲
মাহ আশ্বিন——৪৲
মাহ অগ্রহায়ণ——৪৲
মাহ চৈত্র——৪৲

মোট ১৬৲ টাকা মাত্র।

কবুলতি লিখিবার পদ্ধতি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ পাল
জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র সাং জয়পুর। কস্য কবুলতি

পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশয়ের জমিদারী জয়পুর গ্রামের উত্তর মাঠে রাজীবলোচন রায়ের জমাই জমির দক্ষিণ, রমানাথ দত্তের লাখরাজ জমির পশ্চিম, যদুনাথ সাধুখাঁর চাকরাণ জমির উত্তর, এবং নীলমাধব হাজরার পুষ্করণীর পূর্ব্ব এই চতুঃসীমার মধ্যে দুই বন্দে ৵৪ চারি বিঘা শালিজমি আমি জমা করিয়া লইবার প্রার্থণা করায়, মহাশয় ১৬৲ ষোল টাকা খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া ৫ পাঁচ সন মিয়াদে জমা করিয়া দিলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনার মালের কাচারীতে খাজনার টাকা আদায় দিয়া তাহার দাখিলা লইব। যদি হাজা শুকা অথবা অন্য কোন কারণে শস্য উৎপন্ন না হয়, তবে খাজনা দিতে ক্রুটী করিব না, এবং নিম্নের লিখিত কিস্তিমত খাজনা দিতে না পারিলে গ্রামস্থরত তলব স্থদ দিব। এই কড়ায়ে পাট্টা লইয়া কবুলতী লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তাং ১৬ই বৈশাখ।

সাক্ষী

শ্রীসূর্য্যকুমার রায়।

শ্রীদীনবন্ধু তরফদার।

শ্রীবেণীমাধব নন্দী।

সর্ব্ব সাকিম জয়পুর।

কিস্তির জার।—

মোট খাজনা ——— ১৬৲

জায় কিস্তিবন্দী।

মাহ আষাঢ় ——— ৪৲

মাহ আশ্বিন ——— ৪৲

মাহ অগ্রহায়ণ———— ৪৲
মাহ চৈত্র————— ৪৲
মোট ১৬৲ টাকা মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ষ্ট্যাম্প ব্যবহার।

ইংরাজী ১৮৭৯ সালের ১ আইনে আমাদের দেশে দলিলাদির উপর যে যে পরিমাণের ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে সময়ে সময়ে মহা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে দলিলে লেখা পড়া করিলে, দেওয়ানী আদালতে দলিল অগ্রাহ্য হয় ও দণ্ডদিতে হয়। দলিল পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও রেজিষ্টরী আফিশে সেই সময়ে দলিল রেজিষ্টরী করিতে গিয়া নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। তবে যদি উচিত মত ষ্ট্যাম্প ও তাহার দশগুণ জরিমানা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ষ্ট্যাম্পশূন্য বা কম মুল্যের ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিলও আদালতে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু ঐ দশগুণ জরিমানা যদি ৫৲ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ৫৲ টাকাই দিতে হইবে, যেহেতু ৫৲ টাকার কম জরিমানা হয় না। আদালত ষ্ট্যাম্পবিহীন ও কম ষ্ট্যাম্পের দলিল সকল আটক করেন।

যদি কেহ ষ্ট্যাম্পের খরচ বাঁচাইবার জন্য রসিদ না দেন, অথবা যে পরিমাণ টাকায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না, এরূপ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রসীদ দেন, অর্থাৎ কোন রকমে গবর্ণমেণ্টকে ঠকাইতে চেষ্টা করেন। এরূপ জানা যায়, তাহা হইলে ১০০৲

একশত টাকা হইতে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

যে যে দলিলে ষ্ট্যাম্প দেওয়া আবশ্যক।—কোন একটি বিষয়ের অনেকগুলি দলিল থাকিলে তাহার মধ্যে যে খানি প্রধান তাহাতেই নিয়মিত ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, অপর গুলিতে ১৲ টাকা পরিমাণে দিলেই চলিবে।

চালান বিষয়ের যদি এক খানা দলিল থাকে, সেই সকল বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ লেখা পড়া করিলে তাহাদের এক এক খানিতে যে পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত, তাহাদের সমষ্টি যত হয় সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

যদি কোন দলিলে দুইটী বিষয়ের লেখা পড়া হয়, তবে যে উহাদের মধ্যে যে বিষয়ের লেখাপড়া জন্য অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প লাগে তাহাই দিতে হইবে।

ষ্ট্যাম্পদিবার উপযুক্ত সময়।—কোন নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য যদি সময়ে সময়ে টাকা পাওয়া যায়, এরূপ দলিলে সেই নির্দ্ধারিত সময়ের যত টাকা হইবে, তাহার সমষ্টির উপর ষ্ট্যাম্প দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে ২০ বৎসরের সমষ্টি করিয়া যত টাকা হইবে, সেই টাকার উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন যদি উহা কাহারও যাবজ্জীবন আবশ্যক হয়, তবে ১২ বৎসরের সমষ্টির পরিমাণানুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

যদি কোন দলিলে ষ্ট্যাম্প না দেওয়ার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কারণ দলিলে লিখিত থাকা আবশ্যক।

কোন দলিলে ভিন্নদেশীয় টাকা লিখিত থাকিলে।—বিলাতী

পাউণ্ড ১০৲ টাকা, ১০০ ফ্রাঙ্ক ৪০৲ টাকা, মেক্সিকান বা চীনের ডলার ২।০ আনা। তদ্ভিন্ন অন্য দেশীয় টাকা কোন দলিলে লিখিত থাকিলে ভারতবর্ষে তাহার যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই টাকা অনুসারেই ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

যদি কোন দেনা পরিশোধের জন্য কোন কিছু হস্তান্তর করা যায়, তবে তাহাতে সেই দেনার পরিমাণে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

কোন্ দলিলে কত ষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত।

১। কুড়ি টাকার উপর ঋণ স্বীকার পত্রে ৵০ আনা।

২। হলফনামায় ১৲ টাকা

৩। যে চুক্তিপত্র বা গিরিমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট সেয়ার বিল বিক্রয়ের জন্য, তাহাতে ৵০ আনার, অপরাপর গিরিমেণ্ট যাহার কোন পৃথক্ নিয়ম না থাকে তাহাতে ॥০ আনা।

৪। অংশীয় নিয়োগপত্রে ১৫৲ টাকা।

৫। কোন কোম্পানীর কড়ারপত্রে ২৫৲ টাকা।

৬। উকীল হইবার কেরাণীর নিয়োগপত্রে ২৫০৲ টাকা।

৭। সালিশ নিষ্পত্তির আজ্ঞাপত্রে হাজার টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ॥০ আনা, তদূর্দ্ধে ৫৲ টাকা।

৮। হুণ্ডি (Bill of Exchange), হ্যাণ্ডনোট (Promissory note) বিনা মুদ্দতে ৵০ আনা। এক বৎসর পর্য্যন্ত যাহার মুদ্দত, ১৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ২০০৲ টাকায় ৵০ আনা। ১৬০০৲ টাকা হইতে ২৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ১॥০ টাকা। প্রতি ২৫০০৲ (দশহাজার টাকা পর্য্যন্ত) ১॥০ টাকা। ১০,০০০৲ হইতে ৩০,০০০৲ পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০০৲ টাকায় ৩৲।

৩০,০০০ হইতে প্রতি ১০,০০০ টাকায় ৬৲ টাকা। এক বৎসরের অধিক মুদ্দত হইলে বণ্ডের নিয়মে ষ্টাম্প দিতে হইবে।

৯। বিল অফ লেডিংএ।০ আনা।

১০। বন্ধকী খতে শতকরা ॥০ আনা, হাজারের উর্দ্ধে ৫৲ টাকা।

১১। ২০৲ টাকার অধিক মূল্যের চেকে ⁄০ আনা।

১২। বন্দোবস্ত পত্র অর্থাৎ উত্তমর্ণের পাওনা টাকা যে দলিলে বজায় হয় ১০৲ টাকা।

১৩। বিক্রয়পত্র ১৲ হইতে ৫০৲ টাকায় ॥০ আনা, ১০০৲ হইতে ১০০০৲ পর্য্যন্ত শতকরা ১৲ টাকা। এবং ১০০০৲ উপর প্রতি ৫০০৲ টাকায় ৫৲ টাকা।

১৪। আদালতের দলিলের নকল, আসল দলিলে যদি ১৲ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প না হয় তবে ॥০ আনা, তদ্ভিন্ন ১৲ টাকা।

১৫। অপর দলিলের নকলে, আসলে যে ষ্ট্যাম্প তাই, কিন্তু ১৲ টাকার অধিক নহে।

১৬। ট্রষ্টিপত্রে (উইল নয়) ১৫৲ টাকা।

১৭। মাল দিবার আদেশপত্রে ⁄০ আনা।

১৮। হাইকোর্টে উকীল অথবা এড্‌ভোকেটের নাম রেজিষ্ট্রীর সময় ৫০০৲ টাকা।

১৯। ঐ উকীলের নাম রেজিষ্ট্রী সময় ২৫০৲

২০। আটর্নির কেরাণী হওয়া ভিন্ন অন্য প্রকার শিক্ষানবিশের দলিলে ১০৲ টাকা।

২১। অংশীনামায় ৫৲ টাকা।

২২। অংশীর ফারখৎপত্রে ৫৲ টাকা।

২৩। পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতিপত্রে ১০৲ টাকা।

২৪। ইজারা, পাট্টা, বা খাজনা ভাড়া প্রভৃতির দলিল, এক বৎসরের কম সমুদয় টাকার উপর বণ্ডের নিয়মে ষ্ট্যাম্প। এক বৎসরের উপর ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কনভেয়ান্সের নিয়মে ষ্ট্যাম্প। যথা সময় নিরূপিত না থাকে, দশ বৎসরের খাজনার উপর কনভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প। যেখানে ভাড়া ব্যতীত অন্য বন্দোবস্ত থাকে, সেখানে দলিলের লিখিত টাকার উপর কনভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প। ভাড়া কি খাজনার সহিত যদি অতিরিক্ত কিছু দিবার নিয়ম থাকে, তাহাতে সমস্ত টাকার উপর কনভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প। কিন্তু একখানি দলিল বর্ত্তমানে যদি অতিরিক্ত দলিল প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে ॥০ আনা মাত্র দিতে হইবে।

২৫। কোন কোম্পানীর নিয়মপত্রে ১৫৲ টাকা।

২৬। বন্ধকী দলিলে যদি বন্ধকী সম্পত্তির দখল দেওয়া হয়, কিম্বা দখল দিবার স্বীকার করা হয়, তবে টাকা অনুসারে কনভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প। দখল না দেওয়া হইলে বণ্ডের ষ্ট্যাম্প।

২৭। হুণ্ডি প্রোটেষ্টে ১৲ টাকা।

২৮। এজেন্টের বা দালালের খরিদ বিক্রয়ের নোটীশে ৵০ আনা।

২৯। পেটেণ্ট করিবার দরখাস্তে ১০০৲ টাকা।

৩০। বিমানামা—সমুদ্রপোত সম্বন্ধে প্রতি ১০০০৲ বা তন্ন্যূন টাকায় ।০ আনা, নকলে ৵০ আনা।

৩১। পাওয়ার অফ এটর্নি।—একটী বিষয়সম্বন্ধে দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য ॥০ আনা, একটী বিষয়ে অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমতাপত্র দিলে ১৲ টাকা, ৫ জনের অনধিক লোককে একত্র হইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতা দিলে ৫৲ টাকা, ৫ জনের অধিক কিন্তু ১০ জনের অধিক না হয়, এমত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইলে ১০৲ টাকা, অন্যান্য ক্ষমতা প্রত্যেক জনের প্রতি ১৲ টাকা।

৩২। ২০৲ টাকার উপর রশীদে ⁄০ আনা।

৩৩। বন্ধক খালাসপত্র ১০০০৲ টাকার উপর না হইলে কনভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প, এতদ্ভিন্ন ১০৲ টাকা।

৩৪। ফারখতপত্র ১০০০৲ টাকার অধিক না হইলে বণ্ডের ষ্ট্যাম্প। তদতিরিক্ত হইলে ৫৲ টাকা।

৩৫। বাতিলকরণপত্রে ১০৲ টাকা।

৩৬। শিপিং অর্ডারে ⁄০ আনা।

৩৭। ট্রান্সফার অংশ সম্বন্ধে হইলে কনভেয়ান্সের সিকি। সুদ সম্বন্ধে দলিল যদি ৫৲ টাকার অধিক না হয়, দলিলে যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে সেই ষ্ট্যাম্প। অন্য প্রকার ৫৲ টাকা। এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারলের অধীন সম্পত্তি ১০৲ টাকা। একজন ট্রষ্টির হস্ত হইতে হস্তান্তর করিতে হইলে ৫৲ টাকা।

৩৮। মালের ওয়ারেণ্ট ।০ আনা।

৩৯। খতের ষ্ট্যাম্প ১০৲ পর্য্যন্ত ৵০ আনা, ১১ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত ।০ আনা, ৫১ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত ॥০ আনা, ১০১৲ হইতে ১০০০৲ পর্য্যন্ত প্রতি শত বা তন্যূন টাকায়

॥০ আনা, ১০০১৲ হইতে ৫০,০০০৲ হাজার পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০৲ বা তন্যূন টাকায় ২॥০ টাকা।

৪০। বিক্রয় কোবালা বা হস্তান্তরপত্রে ৫০৲ পর্য্যন্ত ॥০ আনা, ৫১৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত ১৲ টাকা, ১০১৲ হইতে ১০০০৲ পর্য্যন্ত প্রতি শতে বা তন্যূন টাকায় ১৲ টাকা, ১০০১৲ হইতে ৫০,০০০৲ পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০৲ বা তন্যূন টাকায় ৫৲ টাকা।

৪১। এক বৎসর মুদ্দতি হুণ্ডী ও প্রমিসরী নোট।—২০০৲ পর্য্যন্ত ৵০ আনা, ২০১৲ হইতে ৪০০৲ পর্য্যন্ত।০ আনা, ৪০১৲ হইতে ৬০০৲ পর্য্যন্ত ।৵০ আনা, ৬০১ হইতে ১০০০৲ পর্য্যন্ত ।৶০ আনা, ১০০১৲ হইতে ১২০০৲ পর্য্যন্ত ৸০ আনা, ১২০১৲ হইতে ১৬০০৲ পর্য্যন্ত ১৲ টাকা, ১৬০১৲ হইতে ২৫০০৲ পর্য্যন্ত ১॥০ টাকা, ২৫০১৲ হইতে ৫০০০৲ পর্য্যন্ত ৩৲ টাকা, ৫০০১৲ হইতে ৭৫০০৲ পর্য্যন্ত ৪॥০ টাকা, ৭৫০১৲ হইতে ১০,০০০৲ পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা, ১০,০০১৲ হইতে ১৫,০০০৲ পর্য্যন্ত ৯৲ টাকা, ১৫০০১৲ হইতে ২০,০০০৲ পর্য্যন্ত ১২৲ টাকা, ২০,০০১৲ হইতে ২৫,০০০৲ পর্য্যন্ত ১৫৲ টাকা, ২৫,০০১৲ হইতে ৩০,০০০৲ পর্য্যন্ত ১৮৲ টাকা, ৩০,০০১৲ হইতে ৪০,০০০৲ পর্য্যন্ত ২৪৲ টাকা, ৪০,০০১৲ হইতে ৫০,০০০৲ পর্য্যন্ত ৩০৲ টাকা, ৫০,০০১৲ হইতে ৬০,০০০৲ পর্য্যন্ত ৩৬৲ টাকা, ৬০,০০১৲ হইতে ৭০,০০০৲ পর্য্যন্ত ৪২৲ টাকা, ৭০,০০১৲ হইতে ৮০,০০০৲ পর্য্যন্ত ৪৮৲ টাকা, ৮০,০০১৲ হইতে ৯০,০০০৲ পর্য্যন্ত ৫৪৲ টাকা, ৯০,০০১৲ হইতে ১,০০,০০০৲ পর্য্যন্ত ৬০৲ টাকা।

কোন্ কোন্ দলিলে ষ্ট্যাম্প লাগে না।

১। নিম্নলিখিত স্থলে এফিডেফিট বা প্রতিজ্ঞা পত্র দিলে,—

(ক) ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ বিষয়ক বিধিমতে পল্টনে ভর্ত্তি হইবার স্থলে।

(খ) কোন আদালতে বা আদালতের কর্ম্মচারীর সম্মুখে দাখিল করিতে হইলে।

(গ) কোন ব্যক্তি পেন্সন বা কোন প্রকার বৃত্তি পাইতে পারেন তন্মর্ম্মের লিখিত ঐরূপ পত্র।

২। নিয়ম পত্র বা তাহার মর্ম্মাত্মক পত্র।

(ক) কেবল মাল বা বণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় জন্য বা তৎসম্পর্কে লিখিত পত্র।

(খ) ভারতবর্ষের লোকেরা ব্রিটিশাধিকৃত ব্রহ্মদেশে কার্য্য করিতে গিয়া তদ্দেশস্থ প্রধান কমিশনর সাহেবের অধীনে কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর নিকট চুক্তি পত্র।

(গ) গবর্ণমেণ্টের জন্য পোস্তের চাস করণার্থ রায়তদের চুক্তি পত্র।

(ঘ) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে ঋণদিবার প্রস্তাব পত্র।

(ঙ) ইং ১৮৬৫ সালের বোম্বাই প্রদেশের ১ আইনের বলে জরিপী নক্সাযুক্ত ভূমির দখল করিবার ও তাহার রাজস্ব দিবার সম্পর্কে লিখিত পত্র।

(চ) ইউরোপীয় বেটুয়াগিরি বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ১৭ ধারা ক্রমে লিখিত পত্র।

৩। ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞাপনার্থে যে মূল্য নিরূপণ পত্র করা যায়, নিয়ম পত্র কিম্বা আইনের বলে উভয় পক্ষ কোন প্রকারে তাহাতে যদি আবদ্ধ না থাকে তবে তদ্রূপ পত্র।

৪। ভূম্যধিকারীকে কত খাজনা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশে শস্যের মূল্য বিবরণ পত্র।

৫। ১৮৪৭ সালের ২০ আইনের ৫ ধারা মতে গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় পত্র।

৬। ১৮৭৩ সালের বোম্বাই প্রদেশের ৩ আইনের ১৮ ধারাক্রমে মীমাংসা পত্র।

৭। বিল অফ্ লেডিং যদি তন্নির্দ্দিষ্ট মাল ১৮৭৫ সালের ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক আইনের বর্ণনানুযায়ী কোন বন্দরের সীমার মধ্যে অন্য কোন স্থানে অর্পিত হয়, এই মর্ম্মের লিখিত পত্র।

৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নিষিদ্ধ পত্র করিতে হইলে,—

(ক) মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিরা অর্থাৎ নম্বরদার বা খৎদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত পোস্তের চাস করিবার জন্য আগাম টাকা লইলে তাহাদের জামিনদার।

(খ) ১৮৭৬ সালের বঙ্গদেশীয় ৩ আইনের ৯৯ ধারা মতে যে সর্দ্দারেরা মনোনীত হয়েন, উক্ত আইন মতে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহকরণ জন্য যে কড়ার পত্র লিখিয়া দেন।

(গ) দাতব্য ঔষধালয় বা সাধারণের উপকারজনক অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে চাঁদা আদায় হয়, তদুৎপন্ন

স্থানীয় আয় প্রতি মাসে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম হইবে না ইহার জন্য যিনি জামিনস্বরূপ থাকেন।

৯। রাজকীয় কোন কার্য্যালয়ের কাগজ পত্রের মধ্যে রাখিবার জন্য, কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যের জন্য কোন কার্য্য-কারকের প্রতি আইন মতে যে পত্রাদি নকল করিয়া দিতে স্পষ্ট আদেশ থাকে তাহার নকল।

১০। ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের বিদেশগমনবিষয়ক আইনের ২৭ বা ২৯ ধারানুসারে প্রদত্ত বিদেশগামীদের রেজে-ষ্টরীর নকল।

১১। রাজকীয় সনন্দ বলে কোন হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার পরে, কোন এড্‌ভোকেট্, উকীল বা এটর্ণির অন্য কোন হাই-কোর্টে প্রবেশ পত্র।

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে আর্টিকৃল্ ক্লার্ক-রূপে আবদ্ধ হইয়া কোন হাইকোর্টের এটর্ণি হইবার প্রবেশ পত্র।

১২। নিদর্শন পত্র অর্থাৎ—

(ক) কোন ব্যক্তি ১৮৭১ সালের ভূমিকর্ষণ বিষয়ক আইন মতে স্বয়ং বা জামিন নামা দ্বারা টাকা আদায় লইয়া তাহা ফিরিয়া দিবার প্রতিভূস্বরূপ নিদর্শন পত্র।

(খ) গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা আপনাদের কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিবার অথবা তাহার বলে যে টাকা প্রাপ্ত হয়েন, তাহার নিকাশ দেওয়ার নিদর্শন পত্র তাঁহারা স্বয়ং অথবা জামিন দ্বারা সম্পাদন করিয়া দিলে তদ্রূপ লিখিত পত্র।

(গ) ১৮৫০ সালের ১৯ আইনের বলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট

কর্ত্তৃক অথবা সাধারণের উপকারার্থে কোন তহবিল হইতে কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম শিখাইবার বিষয়ে নিদর্শন পত্র।

১৩। তোলানুমতি পত্র ও কবুলিয়ত অর্থাৎ—

(ক) ১৮৭৫ সালের ব্রহ্মদেশীয় জলকর বিষয়ক আইন মতে জলকরে যে পাট্টা দেওয়া যায়।

(খ) জরিমানা বা সেলামী দেওয়া ভিন্ন কোন ভোগানুমতি পত্র কোন কৃষক সম্বন্ধে সম্পাদিত হইলে, আর তাহাতে এক বৎসরের অনধিক মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, কিম্বা তাহার নির্দ্ধারিত বার্ষিক খাজনা ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সেই ভোগানুমতি পত্র।

(গ) কৃষককে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহার কবুলিয়ত।

১৪। পত্র অর্থাৎ—

(ক) বিমা পত্র দিবার পত্র কি তদ্বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পত্র। কিন্তু ঐ বিমা পত্রের উপর এই আইনমতে যত ষ্ট্যাম্প লাগে, ঐ পত্রে বা ঐরূপ প্রতিজ্ঞা পত্রে সেই ষ্ট্যাম্প না থাকিলে তদনুসারে টাকা আদায় করা যাইতে পারিবেনা ও তদুল্লিখিত বিমা পত্র দেওয়াইবার কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাহার ফল দর্শিবেনা এই মর্ম্মের লিখিত পত্র।

(খ) বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের সহিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার পত্র।

১৫ রসীদ অর্থাৎ ;—

(ক) নিয়মিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত অথবা এই তফশীলের (১৮ নং) ধারার বলে মাসুল হইতে মুক্ত যে নিদর্শন পত্রে মূল্যের টাকা ব্যক্ত আছে ও যদ্দারা কোন আসল টাকা বা সুদ বা বার্ষিক

বৃত্তি কি সাময়িক দেয় কোন টাকা রাখা যায়, তাহার পৃষ্ঠে বা ভিতরে উক্তটাকা প্রাপ্তিস্বীকারের কথা থাকিলে তৎ নামার্থ পত্র।

(খ) বিনা সুদে দেওয়া কোন টাকার রসীদ।

(গ) কৃষক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দান যোগ্য ভূমির কিম্বা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের ইনাম ভূমির খাজনা দিলে কৃষককে যে রসীদ দেওয়া যায়।

(ঘ) শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর পণ্টনের কিম্বা তাঁহার ভারতবর্ষীয় পল্‌টনের সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদাদারেরা বা সিপাহী স্বরূপ কর্ম্ম করিবার সময়ে বেতন পাইয়া যে রসীদ দেয়।

(ঙ) যাঁহারা অন্য কোন পদে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম না করিয়া কেবল সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদাদার বা সিপাহীস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া যে পেন্সন বা বৃত্তি পাইতে পারেন, তাহা পাইয়া যে রসীদ দেন।

(চ) রসিদের উল্লিখিত টাকা যাহার বেতন বা বৃত্তি হইতে নিরূপণ করা যায়, সেই ব্যক্তি উক্ত কোন এক পল্‌টনের সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদাদার বা সিপাহী হইয়া সেই পদের কর্ম্ম করিতে থাকিলে পরিবারের সার্টিফিকেটধারী তাহার যে রসীদ দেন।

(ছ) কোন মণ্ডল বা নম্বরদার ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া তজ্জন্য যে রসীদ দেন।

(জ) কোন কুঠিয়ালের কাছে যাহার হিসাব লওয়া যাইবে এমন গচ্ছিত টাকার কিম্বা টাকার সিকিউরিটীর জন্য যে রসীদ দেওয়া যায়।

অধিকন্তু এমন স্থলে আবশ্যক যে, ঐ টাকার হিসাব যে

ব্যক্তিকে দিতে হইবে, তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও স্থানে কি হাতে ঐ টাকা পাইবার কথা ব্যক্ত না হয়।

সেয়ার নিরূপণপত্রের জন্য বা তাহার উপর কোন কোম্পানীর বা সমাজের কিম্বা প্রস্তাবিত বা ভাবী কোন কোম্পানীর কি সমাজের কোন স্কুলের বা সেয়ায়ের উপর টাকা দিবার আদেশ হইলে, তৎসম্পর্কে যে টাকা দেওয়া যায় বা গচ্ছিত করা হয়, তাহার রসীদের বা পাইবার স্বীকারপত্রের প্রতি এই বিধান বর্ত্তিবে না।

১৬। যে ভোগানুমতিপত্র মাসুল হইতে মুক্ত তাহা ত্যাগকরণ পত্র।

১৭। পৃষ্ঠলিপি ক্রমে হস্তান্তর পত্র অর্থাৎ—

(ক) বিল অফ একশ্চেঞ্জের বা চেকের অথবা প্রমিসরী নোটের।

(খ) বিল অফ লেডিঙ্গের।

(গ) বিমাপত্রের।

(ঘ) ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচলিত কোন আইনের বলে যে কর ও ট্যাক্স ধার্য্য হয় তাহার বন্ধকপত্রের।

(ঙ) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটীর এবং কোন গদি, বা আড়ত অথবা ঘাটে যে দ্রব্য থাকে, সেই দ্রব্যে যে নিদর্শনপত্রক্রমে তন্নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বা তাহার প্রতি পুরুষের কিম্বা ঐ পত্রের অধিকারিত্ব স্বত্ব প্রমাণ হয়, সেই দ্রব্য যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকে, সেই নিদর্শনপত্র তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত বা শংসিত হইলে মাল প্রাপ্তির ওয়ারেণ্টের হস্তান্তরপত্র।

১৮। "বর্জ্জিত হইবার" এই কথা না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বা তৎপক্ষে কিম্বা তদনুকুলে সম্পাদিত যে নিদর্শন পত্রের যোগ্য মাসুল দিতে হইত তাহার মাসুল সর্ব্বত্র বর্জ্জিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দলিল রেজেষ্টরী।

১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইন অথবা এই ১৮৭৭ সালের ৩ আইন যে তারিখে যে প্রদেশে প্রচলিত হইল কিম্বা হইবে, সেই তারিখে কি তাহার পরে সেই প্রদেশের অন্তর্গত সম্পাত্তিবিষয়ক যে যে দলিল লিখিত পঠিত হয়, তাহা রেজেষ্টরী করিতেই হইবে। বিশেষতঃ —

(ক) স্থাবরসম্পত্তির দানপত্র।

(খ) উইল ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফল-স্বরূপে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎকালে একশত টাকার অথবা তদূর্দ্ধ মূল্যের বর্ত্তমান ভোগ্য কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব অধিকার, সম্পর্ক, অর্থাৎ দায়স্থষ্ট হয়, বা নির্দ্দেশ, সমর্পণ সম্ভোগকারী অথবা বিলোপ করা যায়, সেই নিদর্শনপত্র।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকার, স্বত্ব, অথবা সম্পর্ক স্বষ্ট, নির্দ্দেশ, সমর্পণ, সঙ্কোচ বা বিলোপ করা প্রযুক্ত যে পারিতোষিক

গ্রহণ, বা দান করা যায়, উইল ভিন্ন তাহা পাইবার বা দিবার স্বীকার পত্র।

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির প্রতিবৎসরের বা এক বৎসরের অধিক কলের পাট্টা, বার্ষিক খাজনা বা ভাড়া নিরূপণের পাট্টা।

কিন্তু কোন জেলায় কিম্বা জেলার কোন বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত যে পাট্টামতে ৫ বৎসরের অধিক কালের নিয়ম না করা যায়, এবং বার্ষিক খাজনা বা ভাড়া ৫০৲ টাকার অধিক না হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেট অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া সেই ধারায় পূর্ব্বভাগের কথার মধ্যে সেই পাট্টা না ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারেন।

সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র।—

(ঙ) কোন সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রতি ও ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত কোম্পানীর সেয়ার ও ঋণদানপত্রের হস্তান্তরকরণ পত্র না ধরিবার কথা।

(চ) জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর সমুদয় মূলধন বা তাহার একাংশ স্থাবর সম্পত্তি হইলে ও সেই কোম্পানীর সেয়ার সম্পর্কীয় কোন দলিলের প্রতি,

(ছ) তদ্রূপ কোন কোম্পানীর দত্ত কোন ঋণ দানপত্রের পৃষ্ঠলিপির প্রতি বা ঐ পত্র হস্তান্তর করণ পত্রের প্রতি,

(জ) যে দলিল দ্বারা স্থাবর সম্পত্তিতে একশত টাকার বা তাহার অধিক মূল্যের বা কোন স্বত্ত্বের, অধিকারের, অথবা সম্পর্কের সৃষ্টি, নির্দ্দেশ, নিরূপণ সঙ্কোচ বা বিলোপ না হইয়া অন্য যে দলিল সম্পাদিত হইলে সেই স্বত্ত্বের অধিকারের, অথবা সম্পর্কের সৃষ্টি, নির্দ্দেশ, নিরূপণ, সঙ্কোচ বা বিলেপ হয়,

সেই দলিল পাইবার স্বত্বমাত্র যে দলিলের দ্বারা সৃষ্ট হয় তাহার প্রতি।

(ঝ) আদালতের ডিক্রী, আজ্ঞা ও মীমাংসার প্রতি।

(ঞ) গবর্ণমেণ্টের স্থাবর সম্পত্তি দান পত্রের প্রতি।

(ট) রাজস্বের কার্য্যকারকদের কৃত বণ্টন পত্রের প্রতি।

(ঠ) ১৮৭১ সালের ভূমির উৎকর্ষসাধক বিষয়ক আইন-মতে প্রতিপোষক প্রতিভূর যে যে সার্টিফিকেট ও দলিল দেওয়া যায় তৎপ্রতি।

এই ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণের কোন কথা খাটেনা।

১৮৭২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিনের পর পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিবার যে অনুমতি পত্র সম্পাদিত হয়, কিন্তু উইল ক্রমে দেওয়া না যায়, তাহাও রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দলিল রেজিষ্ট্রী করা ইচ্ছাধীন।

দলিল রেজেষ্ট্রী খরচা।

সম্পত্তি হস্তান্তর পত্র, অর্থাৎ বিক্রয়ের কোবলা, দান বা যৌতুক পত্র, বাটোয়ারা পত্র, পাট্টা, বন্ধকী ও অন্যান্য খত, ইন্‌সিউরেন্স পলিশি, বিল অফ একশ্চেঞ্জ, হ্যাণ্ডনোট ইত্যাদির টাকা অনুসারে রেজিষ্ট্রী খরচ দিতে হয় যথাঃ—

১০০৲ টাকার অনধিক ৸০ আনা, ১০০৲ টাকার অধিক ২৫০৲ টাকার অনধিক ১৲ টাকা, ২৫০৲ টাকার অধিক ১০০০৲ টাকার অনধিক ৩৲ টাকা, হাজার টাকার উপর প্রতি হাজার বা তাহার ন্যূন হইলেও ১৲ টাকা। যদি কোন দলিলে টাকা নির্দ্ধারিত না থাকে, তাহা হইলে ১০৲ টাকা ফি লাগে।

কোন দলিলসংক্রান্ত টাকা দেনা পাওনার রশীদ, যদি সেই দলিল পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর ২৲ টাকার অধিক নহে।

যদি শীলযুক্ত বন্ধ করা উইলে বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র আমানত করা যায়, তাহাতে ২৲ টাকা, উহা ফেরত লইতে হইলে ২৲ টাকা, মোড়ক হইতে উইল খোলার ফি ২৲ টাকা, তদ্ব্যতীত নকলের পৃথক খরচা দিতে হইবে।

খোলা উইল বা পোষ্যপুত্রগ্রহণের অনুমতিপত্র ৪৲ টাকা।

আদালতের মঞ্জুর করা ডিগ্রীর নকল ১৲ টাকা, চাকরী গ্রহণের এগ্রিমেণ্ট ॥৹ আনা। উপরোক্ত দলিল ভিন্ন অন্য দলিল (যদি তাহা রেজিষ্ট্রী বহির এক পৃষ্ঠা পরিমিত হয়) তবে ১৲ টাকা. তদপেক্ষা বড় হইলে ২৲ টাকা।

যদি এক দলিলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সবরেজিষ্ট্রারের এলাকাস্থিত ভূমি সম্বন্ধের লেখাপড়া হয়, তবে তাহাদের যে কোন আপিসে রেজিষ্ট্রী হইতে পারে, কিন্তু নিদর্শনপত্রের নকল কিম্বা মর্ম্মাত্মক লিপি আসলের তুল্য কিন্তু নকলের নিমিত্ত ১০৲ টাকার অধিক নহে, এবং মর্ম্মাত্মক লিপির জন্য ১৲ টাকার অধিক লাগিবে না।

রেজিষ্ট্রী আপিসে কোন দলিলের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে যদি তজ্জন্য প্রথম বৎসরের খাতা দেখিতে হয়, তবে ১৲ টাকা, তৎপরে প্রতি বৎসরের খাতা ।৹ আনা অনুসারে দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ ফি ৫৲ টাকার অধিক হইবে না।

রেজিষ্ট্রী আপিস হইতে কোন লেখার নকল লইতে হইলে

দেশীয় ভাষার প্রতি ১০০ কথায় ৵০ আনা, ইংরেজী ভাষায় প্রতি ১০০ কথায় ৶০ আনা দিতে হয়।

*কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ভিন্ন অন্য কোন রেজিষ্ট্রার কর্তৃক কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে অতিরিক্ত ফি সাধারণের সমান কিন্তু ৫৲ টাকার অধিক নহে।

কলিকাতার রেজিষ্ট্রার দ্বারা তাঁহার এলেকার বহির্ভূত সম্পত্তির কোন দলিলে রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে তাহার ফি ১০৲ টাকা।

কোন ব্যক্তির বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া যদি রেজিষ্ট্রী আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে বা রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার জন্য অতিরিক্ত ফি ১০৲ টাকা লাগে।

মোক্তারনামা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অথবা রেজিষ্ট্রী আপিসে উপস্থিত হইতে গেলে কায়িক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রাণাশংকা বা গুরুতর কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিম্বা কারারুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিলে, অথবা যাহারা রেজিষ্ট্রী আপিসে উপস্থিত না হইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এরূপ স্থলে রেজিষ্ট্রী কর্ম্মকারক আপনি তাঁহার বাটীতে বা কারাগারে গিয়া তাঁহাদের কর্তৃক সম্পাদিত দলিল রেজিষ্ট্রী করিবেন। কিন্তু তজ্জন্য ৫৲ টাকা অতিরিক্ত ফি দিতে হইবে।

উপরোক্ত ব্যতীত অন্য কারণে রেজিষ্ট্রী আপিসে উপস্থিত হইতে না পারিলে রেজিষ্ট্রী কর্ম্মকারককে বাটীতে আনিয়া রেজিষ্ট্রী করাইতে হইলে তাহার ফি ১০৲ টাকা।

ঐ সকল ফি গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য, কিন্তু রেজিষ্ট্রী আপিসের যে কর্ম্মকারক এইরূপে রেজিষ্ট্রী করিতে যান, যদি সেই স্থল তাঁহার আপিস হইতে ১ মাইলের অধিক দূর হয় তবে পাথেয়-স্বরূপ তাঁহাকে প্রত্যেক মাইলে।০ আনার হিসাবে দিতে হইবে।

নিয়মিতকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হয়, তবে উক্ত সময়ের ৭ দিন মধ্যে হইলে সেই দলিলে যে ফি লাগিত তাহার দ্বিগুণ, ১ মাসের মধ্যে হইলে ৪ গুণ, এবং ৪ মাসের মধ্যে হইলে ১০ গুণ ফি দিতে হয়।

খাসমোক্তারনামা রেজিষ্ট্রীর ফি ১৲ টাকা, এবং আম-মোক্তারনামার ফি ২৲ টাকা দিতে হয়।

চলিত ফি ভিন্ন দলিলের দীর্ঘতানুসারে দুই পৃষ্ঠার উপর হইলে (৩০০ কথায় পৃষ্ঠা ধরিয়া) প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত ফি।০ আনা লাগে।

গ্রন্থস্বত্ব রেজিষ্ট্রীর ফি ২৲ টাকা, ট্রেডমার্ক এক পাতায় হইলে তাহার ফি ১৲ টাকা, তদতিরিক্ত হইলে ২৲ টাকা লাগে।

রেজিষ্ট্রী আপিসে রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য কেহ দলিল দাখিল করিলে তাহার জন্য যে ব্যক্তি দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন, তাঁহাকে একখানি রসীদ দেওয়া হয়। সেই রসীদ ফেরত দিয়া দলিল ওয়াপোষ লইতে হয়। যদি কোন গতিকে ঐ রসীদ হারাইয়া যায়, তবে তাহার জন্য ১৲ টাকা দণ্ড দিতে হয়।

যে তারিখে দলিল রেজিষ্ট্রী হয় তাহার এক মাস মধ্যে দলিল ওয়াপোস না লইলে যতদিন দলিল রেজিষ্ট্রী আপিসে

পড়িয়া থাকিবে, তাহার জন্য প্রতি মাসে ।০ আনার হিসাবে দণ্ড দিতে হয়।

ভূমি বিক্রয় কোবলার জন্য দলিলে লিখিত প্রত্যেক গ্রামের জমির রোডসেস্ বহীতে নাম খারিজের জন্য ১৷৷০ টাকা ফি দিতে হয়।

ফি দিবার সময়ের কথা।—রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য যখন রেজিষ্ট্রী আপিসে দলিল দাখিল করা হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য ফি জমা দিতে হইবে। দলিলে কাট্কুট্ থাকিলে বা কোন স্থলে ফাঁক থাকিলে, যদি ঐ কাট্কুটের উপরে বা সাদা জায়গায় দলিলসম্পাদক আপন স্বাক্ষর দিয়া না দেন, তবে রেজিষ্ট্রী কর্ম্মচারী তাহা রেজিষ্ট্রী না করিতে পারেন, যদি করেন তবে তাঁহার যে বহীতে সমস্ত দলিলের নকল রাখা হয়, তাহাতে ঐরূপ কাট্কুট্ বা ফাঁক রাখার কথা লিখিয়া রাখিবেন।

দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার সময়ের কথা।—উইল ভিন্ন সকল দলিল লিখিত ও দস্তখৎ হইবার তারিখ হইতে ৪ মাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রী করা আবশ্যক, না করিলে যে দণ্ড দিতে হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু কোন দলিলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বাক্ষর করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর করিবার তারিখ হইতে ক্রমশঃ ৪ মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্ট্রী ও পুনঃ রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য উপস্থিত করা যাইতে পারে।

কোন্ স্থানে দলিল রেজিষ্ট্রী করা যাইতে পারিবে।—যে স্থানের ভূমিসম্বন্ধের দলিল লেখাপড়া হয়, সেই স্থান যে

সবরেজিষ্ট্রারের এলাকাভুক্ত, তাঁহার নিকট বা সেই স্থান যে জেলার অন্তর্গত সেই জেলার স্পেস্যাল সবরেজিষ্ট্রারের নিকট রেজিষ্ট্রী করা যাইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন সবরেজিষ্ট্রারের এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভূমি যদি এক দলিলে লেখাপড়া হয়, তবে ঐ সকল স্থানের যে কোন স্থানের সবরেজিষ্ট্রারের নিকট দলিল রেজিষ্ট্রী করা যায়, কিন্তু তাহাতে অতিরিক্ত ফি লাগে, তাহার নিয়ম পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

দলিল দাখিল করিলে রসীদ পাইবার কথা।—রেজিষ্ট্রী আপিসে দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে এক এক খানি রসীদ পাওয়া যায়। সেই রসীদে যত ফি দেওয়া গেল, যে দিনে রেজিষ্ট্রী হইল ইত্যাদি বিষয় লিখিত থাকে। দলিল ওয়াপোষ আনিবার সময় ঐ রসীদ না দেখাইলে ফেরত পাওয়া যায় না। দলিল ওয়াপোষ লইয়া রসীদের পৃষ্ঠে তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া নাম দস্তখৎ করিয়া দিতে হয়। স্বয়ং হাজির হইয়া দলিল ওয়াপোষ লইতে না পারিলে যে ব্যক্তিকে দিয়া আনাইবার ইচ্ছা হইবে, তাহার নাম রসীদে লিখিয়া দিলেই চলিবে।

রেজিষ্ট্রী না করিলে তাহার কথা।—যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রী করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা রেজিষ্ট্রী না করা হইলে স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে ঐ দলিলের কোন ফল হইবে না।

পোষ্যপুত্র গ্রহণবিষয়ক দলিল হইলে তাহা মঞ্জুর হইবেনা। যদি সেই দলিল কোন ব্যাপারের প্রমাণস্বরূপ হয়, তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

দণ্ডের কথা।—এই আইনমতে রেজিষ্ট্রী কার্য্যকারক বা তাঁহার আমলাগণ যদি দলিলসম্বন্ধীয় কোন বিষয় অশুদ্ধ জানিয়া—যাহাতে কোন পক্ষের ক্ষতি হইতে পারে এমন জানিয়া—রেজিষ্ট্রী করেন, বা তাঁহার বহীর মধ্যে এমন বিষয় লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাঁহার সাত বৎসর কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করিলে উহার ৭ বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা ঐ উভয় দণ্ডই হইবে।

(ক) কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কার্য্য করিবার কালে এই আইনের আনুষ্ঠানিক বা অনুসন্ধানকার্য্যে কোন ব্যক্তি শপথ করিয়া বা না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মিথ্যা বর্ণনা করিলে তাহা লিপিবদ্ধ হউক বা না হউক, তাহাকে মিথ্যা বর্ণনা বলিয়া দণ্ডনীয় জ্ঞান করিতে হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন রেজিষ্ট্রী কার্য্য-কারককে কোন দলিলের অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ দিলে তাহাও অপরাধযোগ্য।

(গ) আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া সেই কাল্পনিকভাবে কোন কর্ম্ম স্বীকার বা বর্ণনা করিলে কিম্বা কোন সমন বাহির করাইলে অথবা আমিন পাঠাইলে বা অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম করিলে, তাহা অপরাধ বলিয়া জানিতে হইবে।

(ঘ) দণ্ডবিধি আইনে সহায়তা করা শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে, এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন কার্য্যের সাহায্য করিলে তাহাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই আইনানুসারে অপরাধের বিচার দ্বিতীয় শ্রেণীর কম ক্ষমতার কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তমাদি।

সকল প্রকার মোকদ্দমা মামলা, ক্রয় বিক্রয়, দানাদি বিষয়কর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি ও অপরাধসম্বন্ধীয় অন্যান্য মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। সেই সময় অতীত হইলে তৎসম্পর্কে যদি আদালতের আশ্রয় লওয়া যায়, তবে আদালত তাহার বিচার করা অযোগ্য জ্ঞান করেন। যত প্রকার মোকদ্দমা মামলা আছে, সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথা লিখিতে হইলে আমাদের ক্ষুদ্র পুস্তকে স্থান সংকুলান হওয়া সঙ্গত নহে, তবে আমাদের গৃহস্থ-মাত্রেরই যাহা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিকের মধ্যে সেই গুলিই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। অপরাপর বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে তমাদি বিষয়ক ইং ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন পাঠ করা আবশ্যক।

সাত দিনে তমাদি।—সেসন্ জজ কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই ব্যক্তি ৭ দিন মধ্যে আপীল করিতে পারে।

৩০ দিনে তমাদি।—১৮৬৩ সালের ২৩ আইনানুসারে রেভিনিউ বোর্ডের আজ্ঞার বিরুদ্ধে পতিত জমি সম্বন্ধে নালিশ, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে জেলার জজসাহেবের নিকট আপীল, ঐ আইনের ৬০১ ধারামতে হাইকোর্ট আপীল করিবার অনুমতি প্রার্থণা ও ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইলে তাহা অসিদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা ত্রিশ দিন মধ্যে না করিলে আদালতে গ্রাহ্য হয় না।

৩ মাসে তমাদি।—কোন চলিত আইনমত কোন কার্য্য করা বা না করা জন্য যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণজন্য মোকদ্দমা ৩ মাস মধ্যে করিতে হইবে।

৬ মাসে তমাদি।—ডিক্রীর টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া দিবার প্রার্থনা, স্থাবর সম্পত্তি পুনর্দ্দখল, রেলওয়ে বা অন্য পবলিক ওয়ার্কের কারীকরগণের সহিত তাহাদের নিয়োগ কর্ত্তাদের বিবাদ নিস্পত্তি অথবা বিল অফ একৃশ্চেঞ্জ বা প্রমিসরী নোটের নালিশ যখন বেদখল হয়, তাহার ছয় মাস মধ্যে করিতে হইবে।

১ বৎসরের তমাদি।—দণ্ডাজ্ঞা বিষয়ে কোন আইনের প্রতিবাদ, গৃহভৃত্যগণের, মজুরদারদের, ও শিল্পীগণের বেতন সম্বন্ধে হোটেলের পাওনা, বাসাভাড়া, অগ্রে ক্রয়করণের অধিকার বিষয়ের পুনর্দ্দখল, একৃজিকিউটার, এডমিনিষ্ট্রেটর, বা অন্য প্রতিনিধির পক্ষ বা বিপক্ষ আমলা আদালত বা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সকল প্রকার নালিশ, অপবাদ, লায়েবল, দ্রব্যাদির অপহরণ বা নষ্টকরণ, কোন ব্যক্তির ভৃত্য বা কন্যা ভুলাইয়া লওন, কর্ম্মচ্যুত হওন, কণ্ট্রাক্টের খেলাপ করণ,

অন্যায়রূপে দ্রব্যাদি ক্রোক করা প্রভৃতির নালিশ একবৎসর মধ্যে না করিলে তমাদি হয়।

২বৎসরে তমাদি।—দ্রব্যাদি হারান, খোয়ান, বা বিলম্বের জন্য মোকর্দ্দমা ২বৎসর মধ্যে করিতে হইবে।

৩ বৎসরে তমাদি।—১৮২২ সালের ৭ আইন, ১৮২৫সালের ৯ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯আইনানুসারে এ ওয়ার্ডের প্রতিবাদ, খোয়া বিষয় পুনঃপ্রাপ্তি, যানবাহনের ভাড়া, অগ্রিম টাকা পাওনা, বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য, কোন কার্য্যের বেতন বা খরচ, ধার দেওয়া টাকা, একজনের নিমিত্ত অন্যের দেয় টাকা, পাওনা সুদ, হিসাব নিকাশান্তে পাওনা টাকা, কোন সাময়িক কার্য্যকরণের অঙ্গীকার, খতের নালিশ, খত বা বিল অফ এক্‌স্‌চেঞ্জ, উকীলের খরচা, ড্যামেজ, ভাড়া ইত্যাদি যত প্রকার দেনা পাওনা আছে, কড়ার থাকিলে কড়ারের পর ৩ বৎসর মধ্যে না থাকিলে দেনা পাওনার তারিখ হইতে ৩ বৎসর মধ্যে, স্থল ও জল পথ বন্ধ করিবার, ক্ষতি পূরণের নালিশ, ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের, ৩২০ ও ২১ ধারা প্রমাণের নালিশ, নাবালকের অলি কর্ত্তৃক তাহার বিষয় বিক্রয় হইলে নাবালক সাবালক হইয়া পুনর্দ্দখলের নালিশ ৩বৎসর মধ্যে করিতে হইবে।

৬ বৎসরে তমাদি।—ভিন্ন রাজ্যের বিচার নিষ্পন্ন বিষয় লেখা, কণ্ট্রাক্টবা স্বীকারনামা, রেজিষ্ট্রীস্বীকার নামার ক্ষতি-পূরণের নালিশ, পোষ্যপুত্র সাব্যস্ত করিবার নালিশ, ও অন্যান্য নালিশ যাহাদের বিষয় তমাদি আইনে উল্লিখিত নাই, সমস্তই ৬ বৎসরান্তে তমাদি হইয়া থাকে।

১২ বৎসরে তামাদি।—পুরুষানুক্রমিক পদ প্রাপ্তির নালিশ, পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তির অংশের নালিশ, ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের বিচার বা মুচলকার নালিশ, পৌষ্যপুত্র সম্বন্ধে নিষ্কর ভূমির কর স্থাপনের নালিশ, সাময়িক স্বার্থ্যভোগের নালিশ, যথা মালিকান ইত্যাদি, বন্ধকী দ্রব্য ক্রয় করার পর দখলের নালিশ, দখল বা পুনরুদ্ধারের নালিশ, বন্ধকী দ্রব্যের উত্তমর্ণের (মহাজনের) অধিকার, খরিদা স্থাবর বিষয়ের দখল, ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির যাবতীয় নালিশ ১২ বৎসর মধ্যে করিতে হইবে।

৩০ বৎসরে তমাদি।—বন্ধকী অস্থাবর বিষয় পুনরুদ্ধারের নালিশ, বন্ধকী স্থাবর বিষয়ের বন্ধকদাতার নিকট হইতে বন্ধক, ক্রেতার রাজাজ্ঞায় স্থাপিত দেওয়ানী বিচারালয়ে পুনরুদ্ধারের নালিশ ৩০ বৎসর মধ্যে করা আবশ্যক।

৬০ বৎসরে তমাদি।—বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ত্ব রহিত করিবার বা বিক্রয় করিবার জন্য বন্ধকগ্রহীতার নামে মোকদ্দমা, ও বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিবার বা তাহার অধিকার পাইবার নিমিত্ত বন্ধকগ্রহীতার নামে মোকর্দ্দমা ৬০ বৎসর মধ্যে না করিলে তমাদি হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অপরাধ সম্পর্কীয় মোকর্দ্দমার কর্ত্তব্যতা।

সংসারে থাকিতে হইলে সংসারী মাত্রেরই রাজনিয়ম অবগত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সময় আমাদের অদ্ধি-

বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে আমরা গর্হিত কর্ম্ম করিয়া থাকি, এমন কি সেই সকল কাজ যে অপরাধজনক তাহা কখন হয়ত কল্পনাও করি নাই। আমাদের দেশে প্রাচীন কালের ব্যবহার শাস্ত্রে অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যার পর নাই লঘু ছিল, স্থলবিশেষে অজ্ঞানকৃত সামান্য অপরাধ গুলি অপরাধ মধ্যে গণ্যও হইত না, কিন্তু আজি কালি জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত উভয়বিধ অপরাধই প্রায় সমান দণ্ডার্হ। একজনের নিকট আমার কিছু প্রাপ্য আছে, বারম্বার তাহাকে তাগাদা করিয়াছি, সে ব্যক্তি তাহার ঋণ পরিশোধ করিল না। একদিন তাহাকে এমন একটা দ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিলাম যে, সেইটা লইলে আমার দেওয়া টাকা আদায় করিতে পারি। এই ভাবিয়া সেই জিনিষ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলাম। কিম্বা আমি একজন ঘড়ীওয়ালাকে আমার ঘড়ী মেরামত করিতে দিয়াছি। সে আমাকে বলিল মেরামতের খরচা না পাইলে সে ঘড়ী দিবে না, কিন্তু যদি আমি তাহাকে মেরামতী খরচা না দিয়া বলপূর্ব্বক আমার আপনার ঘড়ী তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লই, তবে এ উভয় স্থলেই যে আমি চুরীর অপরাধ করিলাম তাহা হয়ত আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রথম স্থলে ভাবিলাম আমি আপনার পাওনা আদায়ের জন্য তাহার জিনিষ আটক করিলাম, দ্বিতীয় স্থলে মনে করিলাম আমার নিজের ঘড়ী লইলাম, ঘড়ীওয়ালা আমার নামে ছোট আদালতে মেরামতী খরচা যেরূপে পরে আদায় করুক, আমার হাতে টাকা নাই, দশদিন পরে যখন হইবে তখন দিব, তাহাতে আমার অপরাধ কি? কিন্তু বাস্তবিক ইংরেজী ব্যবহার শাস্ত্র

তজ্জন্য আমার দুই বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই রূপ অনেক কাজ আছে, যাহাতে আমার অপরাধ বলিয়া স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, কিন্তু আইনের চক্ষে তাহা ঘোরতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এজন্য গৃহীমাত্রেরই ব্যবহার শাস্ত্রের স্থূল স্থূল মর্ম্ম অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য আমরা দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সাধারণের জ্ঞাত হইবার জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সাত বৎসরের ঊর্দ্ধ বার বৎসরের কম বয়স্ক বালকে যদি কোন অপরাধ করে তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। (দঃ বিঃ আইনের ৮৩ ধারা)।

তদ্রূপ কোন বিকৃতমনা ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে তাহাও অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। (দঃ বিঃ আইনের ৮৪ ধারা)।

যদি কোন ব্যক্তি সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবনে কোন অপরাধ-জনক কাজ করে, তবে তাহাও অপরাধ মধ্যে ধর্ত্তব্য হয় না — যদি সে ব্যক্তি অপরাধজনক কাজ করিবার উদ্দেশে মাদক দ্রব্য সেবন না করিয়া থাকে, প্রত্যুত যদি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অজ্ঞাতসারে কেহ তাহাকে তদ্রূপ দ্রব্য সেবন করাইয়া থাকে। (দঃ বিঃ আইনের ৮৫ ধারা)।

নিম্নোক্ত অপরাধ ঘটনার অথবা তাহাদের ঘটিবার উদ্দেশ্য অবগত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিকটবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ কর্ম্মচারীকে তত্তৎ বিষয় অবগত করিবেন।

প্রত্যেক গ্রাম্য মণ্ডল, পঞ্চায়েত, চৌকিদার, পুলিশ, ভূম্যধিকারী, গৃহস্বামী অথবা তাঁহাদের কর্ম্মচারী কোর্ট অফ ওয়ার্ড

কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সরকারী ভূমির কর অথবা ভাড়ার আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী পুলিশ থানার কর্ম্মচারীকে নিম্নোক্ত বিষয়ের সংবাদ গুলি অতি অবশ্য অবশ্য প্রদান করিবেন।—

(ক) যদি তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে, বাড়ীতে অথবা এলাকা মধ্যে কোন ব্যক্তি স্থায়ী অথবা অস্থায়ী রূপে চুরির মাল ক্রয় বিক্রয় করে।

(খ) যদি তাহাদের এলাকা মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বাস করে কিম্বা গতিবিধি করে যাহাদিগকে চোর, দস্যু, পলায়িত অথবা ঘোষিত অপরাধী বলিয়া জানা যায়।

(গ) যদি উপরোক্ত প্রকারের গ্রাম বা স্থানমধ্যে কোন ব্যক্তি জামিন না লইবার যোগ্য এমন কোন অপরাধ বা তাহার উদ্যোগ করে।

(ঘ) যদি সেই গ্রাম বা স্থান মধ্যে কোন ব্যক্তির আকস্মিক, অসম্ভাবিক অথবা সন্দেহজনক মৃত্যু সংঘটিত হয়।

উপরোক্ত সংবাদ গুলির বিষয় অবগত হইয়া উপরোক্ত ব্যক্তিগণ যদি নিকটবর্ত্তী পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা মাজিষ্ট্রেট্কে তাহার সংবাদ না দেয়, তবে তাহাদের বিনাশ্রমে একমাস কারাবাস বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারে। আবার যদি কোন পলাতক আসামী গ্রেপ্তার, কোন অপরাধ ঘটনা অথবা তাহার নিবৃত্তি করিবার সংবাদ হয়, তবে বিনাশ্রমে ছয় মাস কয়েদ বা হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ১৭৬ ধারা)।

যদি কোন মাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কর্ম্মচারী কোন আইন মতে

কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, খাল অথবা অন্য কোন সাধারণ সম্পত্তির ক্ষতি করিতে কোন ব্যক্তি উদ্যত হইলে তাহা নিবারণের জন্য, যাহাতে শান্তি ভঙ্গ না হইতে পারে এজন্য, অথবা কাহার উপর ওয়ারেণ্ট জারি করিবার জন্য কাহার সাহায্য চাহেন, তবে সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপযুক্ত মত সাহায্য দান করা। সাহায্যের প্রার্থণা অবশ্য ন্যায় সঙ্গত হওয়া চাই। এরূপ অবস্থায় সাহায্য না করিলে ১ মাস বিনাশ্রমে কারাবন্ধ বা ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ১৮৭ ধারা)।

কোন পুলিশ কর্ম্মচারী, মাজিষ্ট্রেট, বা অন্য কোন বচারকের নিকট হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার বা কোন কাগজ পত্র দাখিল করিবার জন্য লিখিত অনুমতি (সমন ও নোটীশাদি) প্রাপ্ত হইবামাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। উপরোক্ত প্রকারের অনুমতি প্রাপ্তির স্বীকার করিয়া আদালতে উপস্থিত না হইলে, অথবা তদ্রূপ অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে এক বৎসর বিনা শ্রমে কারারোধ বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ১৭২ ধারা)।

কোন বে আইনী কার্য্য করিবার জন্য যে সকল লোক একত্রিত হয়, তাহাদের সংস্রবে থাকিলেও দণ্ডার্হ হইতে হয়। (দঃ বিঃ আইনের ১৪৩ ধারা)।

পুলিশ বা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য

কার্য্য সমাধা করিবার বিষয়ে বাধা দিলে বিশেষ অপরাধ হয়।

যদি কেহ আপনাকে সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার ক্ষমতানুযায়ী কোন কাজ করে, তবে সে ব্যক্তির ২ বৎসর কারাবরোধ বা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় বিধ দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ১৭০ ধারা)।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগের জন্য যে সকল পোষাক চাপরাস বা তাঁহাদের পদের পরিচায়ক অন্য কোন সামগ্রী অপর কেহ ব্যবহার করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ৩ মাস কয়েদ, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হইয়া থাকে।

যদি কেহ আইনানুসারে কোন অপরাধ বা অশান্তি ঘটনার অথবা আকস্মিক অপমৃত্যুর সংবাদ দিতে বাধ্য হইয়া পুলিশ অথবা মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদ্বিষয়ক মিথ্যা সংবাদ দেয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আদালতে দণ্ড পাইবার যোগ্য।

কোন সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক শপথ গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তির ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস বা ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ১৭৮ ধারা)।

সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়া কেহ কোন আদালত বা সরকারী কর্ম্মচারীর জিজ্ঞাসা মত তাঁহার প্রশ্নের উত্তরদানে অস্বীকার করে, তবে সেই ব্যক্তিও উপরোক্ত প্রকারে দণ্ডিত হইবার উপযুক্ত।

ঐরূপ যদি কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট কোন বিষয়ের এজেহার দিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার

করে, তবে সেই ব্যক্তির ৩মাস বিনাশ্রমে কারাবাস এবং ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

. কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবার কালে বাধা দিলে ৩ মাস কারাবাস বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অথা উভয় দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ১৮৬ ধারা)।

কোন মোকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অথবা মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করিলে ৭ বৎসর কারাবাস বা অর্থ দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ১৯৩ ধারা)।

উৎকোচ গ্রহণে কোন অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিলে উক্তবিধ দণ্ডভোগ করিতে হয়। (দঃ বিঃ আইনের ২১৩ ধারা)।

কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করা, প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র বা উপকরণ দখলে রাখা, উক্তবিধ মুদ্রা বিক্রয় করা বা তাহার সাহায্য করা অথবা শঠতা পূর্ব্বক মুদ্রার ওজন কম করা, কিম্বা তাহাকে বিকৃত করা, গবর্ণমেন্টের সকল প্রকার ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করা, ঐরূপ কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা, দখলে রাখা, বিক্রয় করা, অথবা যদ্বারা সেইরূপ ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত হইতে পারে তাহার উপকরণ বা যন্ত্রাদি দখলে রাখা, এবং একবার ব্যবহার করা ষ্ট্যাম্প পুনর্ব্বার তাহা ব্যবহার করা যার পর নাই অপরাধজনক। দণ্ডবিধি আইনের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এতৎ বিষয়ক দণ্ডের বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

বিক্রয়ের জন্য কোন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত কোন প্রকার কুদ্রব্য মিশ্রিত করিলে ৬ মাস কারাবরোধ ও ১০০০

এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ২৭২ ধারা)।

কাহাকেও ঠকাইবার জন্য যদি কেহ কৃত্রিম দাঁড়ী ও বাট-খারা ব্যবহার করে, তবে তাহা অপরাধজনক বলিয়া জানিতে হইবে। ওজন করিবার জন্য তদ্রূপ জিনিষ দখলে রাখিলেও অপরাধ হয়।

সাধারণ লোকে যে জলাশয়ের জল ব্যবহার করে, তাহা ময়লা করিলে ৩ মাস কারাদণ্ড বা ৫০০৲ পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ডও হইয়া থাকে। বায়ুকেও ঐরূপে সাধারনের পীড়াজনক করিলে ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন ভগ্ন বাড়ী পতিত হইয়া মনুষ্য-জীবনের বিপদজনক হইতে পারিবে জানিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া না ফেলেন, অথবা তাহা মেরামত না করেন, তবে তাঁহার ৬ মাস কারাবাস বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে। (দঃ বিঃ আইনের ২৮৮ ধারা)।

ঐরূপে যদি কেহ আপনার দখলে থাকা কোন জন্তু কর্ত্তৃক মনুষ্য জীবনের বিপদ বা গুরুতর আঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা জানিয়া সেই জন্তুর উপযুক্ত সাবধান না লয়, তবে সে ব্যক্তিও উপরোক্ত প্রকারে দণ্ডিত হইবে। (দঃ বিঃ আইনের ২৮৯ ধারা)।

অশ্লীল পুস্তক বা ছবি দখলে রাখা, বিক্রয় জন্য সাধারণের সম্মুখে বাহির করা অপরাধজনক। ঐরূপ অপরাধ করিলে ৩ মাস কারাবাস বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

প্রকাশ্য স্থানে কেহ অশ্লীল গীত গান করিলে সে ব্যক্তিও উক্তরূপে দণ্ডার্হ হইয়া থাকে।

১২ বৎসর বা তন্ন্যূন বয়স্ক কোন বালক বা বালিকার পিতা মাতা অথবা অভিভাবক, যাঁহার উপর ঐরূপ বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, তিনি যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্থানে ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার ৭ বৎসর কারাবাস বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে। (দঃ বিঃ আইনের ৩১৭ ধারা।)

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকারে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য কোন স্ত্রীলোককে ব্যবহার করে তবে সেই ব্যক্তিকে বলাৎকারের অপরাধী বলিয়া জানিতে হইবে।

১ম। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

২য়। তাহার সম্মতি ব্যতীত।

৩য়। মৃত্যু অথবা আঘাত জন্মাইবার ভয় প্রদর্শনে তাহার সম্মতি লইয়া।

৪র্থ। আপনাকে তাহার স্বামী নয় জানিয়া যদি তাহার সম্মতি লাভ করে এবং সেই স্ত্রীলোক সম্মতি দিবার কালে আপনাকে অপরের ধর্ম্মপত্নী বলিয়া বিশ্বাস করে।

৫ম। দশ বৎসর বা তন্ন্যূন বয়সের কোন বালিকার সম্মতির সহিত বা সম্মতি ব্যতিরেকে।

এইরূপ অপরাধ করিলে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন, শ্রমসহিত দশ বৎসর কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইয়া থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে এরূপে বিশ্বাস জন্মায় যে সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী

হইয়া সেই স্ত্রীলোক তাহার সহিত সহবাস করে তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসর কারাবাস ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য (৪৯৩ ধারা)।

যদি কোন পুরুষ অন্যের বিবাহিতা জানিয়া তাহার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত কোন স্ত্রীতে উপগত হয়, তবে সে ব্যক্তি ৫ বৎসর কাল কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড ভোগ করিবার উপযুক্ত। বলা বাহুল্য যে, এরূপ স্থলে স্ত্রীর সম্মতি থাকিলেও অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড হইবার বাধা জন্মে না। (৪৯৭ ধারা।)

যদি কোন ব্যক্তি বিবাহিতা জানিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য কোন স্ত্রীলোককে তাহার স্বামী অথবা অন্য কোন অভিভাবকের নিকট হইতে কুপ্রবৃত্তি দিয়া লইয়া যায়, তবে তাহার ২ বৎসর কারাবাস ও অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে। (৪৯৮ ধারা)।

এতদ্ব্যতীত চুরি, ডাকাইতি, নরহত্যা, দস্যুহত্যা, জাল-জালিয়াতী ইত্যাদি সাধারণ অপকর্ম্ম যে দণ্ডনীয় একথা কাহারও অবিদিত নাই এজন্য এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়।

যে সকল অপরাধ করিলে পুলিষ কর্ম্মচারীরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট না লইয়া অপরাধীকে গ্রেপ্তার

করিতে পারে, সেই সকল অপরাধকে পুলিষ ধর্ত্তব্য মোকর্দ্দমা বলে। আর যে সকল অপরাধ করিলে মাজিষ্ট্রেটের বিনা অনুমতি বা ওয়ারেণ্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করিতে না পারে, তাহাকে পুলিষ অধর্ত্তব্য অপরাধ বলে। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২ নং তালিকায় তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বাহুল্যপ্রযুক্ত এস্থলে তাহাদের প্রত্যেকটী পৃথকরূপে দেখান হইল না।

দণ্ডবিধি আইনে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অপরাধের জন্য অপরাধীকে বিচারাধীনে রাখিবার কালে জামিন দেওয়া হয় এবং কতকগুলি অপরাধের জন্য ঐরূপ জামিন দেওয়া যাইতে পারে না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অপরাধগুলিকে জামিনের যোগ্য, এবং শেষোক্ত গুলিকে বেজামিনী মোকর্দ্দমা বলা গিয়া থাকে। আর ঐ অপরাধগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি অপরাধ আছে, যে গুলির জন্য অপরাধীর গ্রেপ্তার জন্য একবারে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, তাহাদিগকে ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা, আর কতকগুলিতে অপরাধীকে বিচারালয়ে হাজির আনিবার জন্য প্রথমতঃ সমন দিতে হয়, সে গুলিকে সমনের মোকর্দ্দমা বলা যায়। কোন্ গুলি জামিনযোগ্য ও কোন্ গুলি বেজামিনী, এবং কোন্ গুলি ওয়ারেণ্টের ও কোন্ গুলি সমনের মোকর্দ্দমা তাহাও কার্য্যবিধি আইনের উপরোক্ত তালিকায় বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থলে পুলিষ কর্ম্মচারীরা বিনা ওয়ারেণ্টে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারে।

১ম। যদি কোন ব্যক্তি পুলিস ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে সংশ্লিষ্ট থাকে, কিম্বা যদি তাহার বিরুদ্ধে উক্তবিধি অপরাধের বিশ্বাসযোগ্য নালিশ হইয়া থাকে।

২য়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট আইনসঙ্গত ওজর ব্যতীত ঘরে সিঁদ দিবার, তালাভাঙ্গিবার কোন অস্ত্র থাকে।

৩য়। এই আইনানুসারে অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামত কোন ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হয়।

৪র্থ। যদি কোন ব্যক্তির দখলে চোরা সন্দেহের দ্রব্য পাওয়া যায়।

৫ম। যদি কোন ব্যক্তি পুলিষ কর্ম্মচারীকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা জন্মায় কিম্বা যে ব্যক্তি আইনানুসারে গ্রেপ্তার হইয়া পলায়িত হয়, অথবা পলাইবার উদ্যোগ করে।

৬ষ্ঠ। যদি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর সৈন্যদল অথবা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলায়ন করে।

৭ম। যদি কোন ব্যক্তি পুলিষ ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার জন্য লুক্কায়িতভাবে থাকে।

৮ম। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের সদুপায় না থাকে কিম্বা আপনার সম্বন্ধে সন্তোশজনক পরিচয় না দেয়।

৯ম। যে ব্যক্তি দস্যুতা ব্যবসায়ী, সিঁধাল, চোর, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া চোরামালের ব্যবসা করে, অথবা ক্ষতি করিবার ভয়প্রদর্শনে পরপীড়ক বলিয়া বিখ্যাত।

যখন কোন ব্যক্তি পুলিষ কর্ম্মচারীর সম্মুখে পুলিষের অধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিয়া পুলিষ কর্ম্মচারীর জিজ্ঞাসামতে আপনার নাম ধাম বলিতে অস্বীকার করে, বা তৎসম্বন্ধে এরূপ

পরিচয় দেয় যে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, তাহা হইলে তাহার নাম ধাম নিশ্চয় পরিচয় জন্য উপরোক্ত পুলিষ কর্ম্মচারী উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৪ ঘণ্টা মধ্যে নিকটবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দিতে পারেন।

যদি কোন ব্যক্তির সমক্ষে অপর কোন ব্যক্তি পুলিষ ধর্ত্তব্য ও বেজামিনী অপরাধ করে, তবে সেই ব্যক্তি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে নিকটবর্ত্তী পুলিষ কর্ম্মচারী অথবা পুলিষ থানায় লইয়া যাইতে পারে।

মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন পুলিষ কর্ম্মচারীই কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৪ ঘণ্টায় অতিরিক্ত কাল রাখিতে পারেন না। গ্রেপ্তারের সময় হইতে উক্ত সময় মধ্যে অপরাধীকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে।

ঘরতল্লাসী—পুলিষ বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী কোন পলায়িত অপরাধী বা অপহৃত দ্রব্য অনুসন্ধানের জন্য যে কোন ব্যক্তির গৃহ অনুসন্ধান করিতে পারেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসজনক কারণ থাকা চাই।

যে ঘর তল্লাস করা হইবে যদি তাহা বন্ধ থাকে তবে তাহার মালিক সেই ঘর খুলিয়া দিবে, না দিলে অনুসন্ধানকারী তাহা ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিতে পারেন। ঘরতল্লাসের সময় সাক্ষী থাকা আবশ্যক, এবং যাহার ঘর তল্লাস হইবে তাহাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে।

যদি কোন লোকের অন্তঃপুরে ঐ প্রকার অনুসন্ধান করিতে

হয়, তবে দেশের রীতি অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম রক্ষায় রাখিবার উপায় করিতে হইবে। যদি অন্তঃপরস্থিতা স্ত্রীলোকের অঙ্গ তল্লাস করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্বস্তা স্ত্রীলোক দিগের দ্বারা করিতে হইবে।

মোকর্দ্দমা রুজু করিবার নিয়ম।—যদি কেহ কাহার উপর এরূপ অত্যাচার করে যে তজ্জন্য যে অপরাধ হয় তাহা পুলিশ ধর্ত্তব্য, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী পুলিশ কর্ম্মচারির নিকট তাহার প্রতি অত্যাচারের বিশেষ বিবরণ কথায় বলিয়া কিম্বা লিখিত করিয়া নালিশ করিবে। সেইরূপে নালিশ করিলে পুলিশ কর্ম্মচারী তাহার বিবরণ লিখিত করিয়া তাহাতে বাদীর দস্তখৎ করাইয়া লইবেন এবং সম্ভাবিত সময়ে তাহার তদন্ত করিবার জন্য ঘটনাস্থলে যাইবেন। তথায় বাদীর কথিত মত প্রমাণ গ্রহণ করিবেন। বাদী তাহার সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিতে না পারিলে তদন্তকারী পুলিশের নিকট জানাইলে তিনি সমন দিয়া সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিতে পারেন। পুলিশ কর্ম্মচারী এইরূপে সাক্ষীর এজেহার লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার যত্নে ও বাদীর কথামত অপহৃত দ্রব্য অথবা অপরাধ-ঘটিত অস্ত্রাদির উদ্ধার করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন, এবং মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য করিয়া সাক্ষীদিগকে ধার্য্যদিনে বিচারালয়ে হাজির হইবার জন্য উপদেশ দিয়া তাহাদের নিকট এই অভিপ্রায়ে মুচলিকা লইবেন যে, বিচারাদালতে নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত না হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দণ্ড দিতে হইবে। তাহার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ জামিনযোগ্য হইলে তাহার

জামিন লইয়া এবং বেজামিনী অপরাধ হইলে তাহাকে উপযুক্ত প্রহরীর জেম্মায় বিচারাদালতে প্রেরণ করিবেন।

পুলিশ তদন্তে সাক্ষীর জবানবন্দী।—পুলিশের প্রশ্নমতে সাক্ষী আপনার জ্ঞানগম্য সকল কথাই বলিতে বাধ্য। এইরূপে কথিত বৃত্তান্ত পুলিশকর্ম্মচারী লিখিয়া লইবেন কিন্তু তাহাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন না, অথবা সাক্ষীকে শপথ করাইবেন না। সে ক্ষমতা বিচারপতি ভিন্ন আর কাহারও নাই।

কেহ কোন মিথ্যা মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছে আদালতের এরূপ হৃদ্বোধ হইলে, বাদীকে তজ্জন্য বিচারাধীনে আনিয়া আসামীর বিরুদ্ধে কে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল তাহা সপ্রমাণিত হইতে তাহার যে দণ্ড হইত বাদীকে সেইরূপে দণ্ড দিতে পারেন। এইরূপ মিথ্যা নালিশ করার জন্য বাদীর যে অপরাধ হয়, তাহা দঃ বিঃ আইনের ২১১ ধারানুযায়ী বিচার্য্য। কিন্তু যে বিচারক প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া বাদীর নালিশ মিথ্যা বলিয়া স্থির করেন, তিনি বাদীর বিরুদ্ধে ২১১ ধারার মোকর্দ্দমা করিতে পারেন না, অন্য বিচারকের দ্বারা তাহার বিচার হইয়া থাকে।

তদন্তকালে অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য পুলিশ কিম্বা অন্য কোন তদন্তকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ, তাড়না ও প্রহারাদি করিতে পারিবেন না, করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আসামী কর্তৃক দঃ বিঃ আইনের ৩৮৪ ধারা মতে মোকর্দ্দমা চলিতে পারে। অথবা বাদীকে তাহার অপরাধ-স্বীকার করাইবার জন্য তাহাকে প্রলোভন দেওয়াও উচিত নহে।

এরূপ প্রমাণ হইলে আসামীর অপরাধস্বীকার গণ্য করা যায় না।

পুলিশধর্ত্তব্য মোকর্দ্দমায় আসামী ও সাক্ষীগণকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য সমন ও ওয়ারেণ্ট প্রভৃতির খরচ লাগে না।

যে সকল মোকর্দ্দমা পুলিশধর্ত্তব্য নহে, যদি পুলিশের নিকট সেই সকল মোকর্দ্দমার নালিশ রুজু হয়, তবে পুলিস কর্ম্মচারী তাহার অভিযোগের সারাংশ রোজনামক বহীতে লিখিত করিয়া মাজিষ্ট্রের নিকট নালিশ করিবার জন্য বাদীকে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট অনুমতি করিলে তাহার তদন্ত করিয়া চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে পারিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফৌজদারী আদালত।

পুলিশধর্ত্তব্য ও পুলিশ অধর্ত্তব্য সকল প্রকার মোকদ্দমাই একবারে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের নিকট রুজু করা যাইতে পারে। কিন্তু পুলিশধর্ত্তব্য মোকর্দ্দমা গুলি এইরূপে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রথম দায়ের হইলে মাজিষ্ট্রেটেরা প্রায়ই তদন্তের জন্য পুলিশ পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।

পুলিশ থানায় কোন প্রকার অপরাধের নালিশ করিতে

হইলে একটী পয়সাও ব্যয় নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের আদালতে যে কোন নালিশ করিতে যাইবে, দরখাস্তের জন্য ষ্ট্যাম্প ৷৷৹ আনা, কার্টিজ ৫ এক পয়সা, মোক্তারনামার জন্য ঐরূপ ষ্ট্যাম্প ৷৷৹ আনা ও কার্টিজ কাগজ ৫ এক পয়সা, মোট ১৲ টাকা দুই পয়সা মাত্র খরচ। এতদ্ব্যতীত মোক্তারের উপযুক্ত ফি আছে, স্থান বিশেষে ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকার মধ্যে। মোকর্দ্দমা রুজু করিবার সময়েই যে মোক্তার বা উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে এমন নয়, তবে সাধারণ লোকে নাকি দরখাস্ত লিখিবার পদ্ধতি বা আদালতে কি প্রকারে দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে,এই জন্যই প্রথমতঃ উকীল মোক্তারের প্রয়োজন হয়, নতুবা স্বয়ং দরখাস্ত লিখিতে সমর্থ হইলে তাহা আদালতে দাখিল করিবার জন্য অধিক কিছু করিতে হয় না। জেলার সদর ষ্টেশনের এলাকা মধ্যে কোন অপরাধ ঘটনা হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের এলাকাভুক্ত স্থানে হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে হয়। আমরা ফৌজদারী আদালতে দাখিল করিবার জন্য একখানি আবেদন পত্রের আদর্শ নিম্নে লিখিয়া দিতেছি, বুদ্ধিমান লোকে তাহা দেখিয়া আবশ্যক মত যে যে স্থানে ঘটনার সময় ব্যবস্থা ও অপরাধের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থল এক আধ টুকু পরিবর্ত্তিত করিয়া সকল প্রকার মোকদ্দমাতেই এইরূপে দরখাস্ত লিখিয়া বিচারাদালতে দাখিল করিতে পারেন।

মহামহিম শ্রীযুক্ত হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব
বাহাদুর বরাবরেষু।

বাদী—শ্রীত্রিলোচন রায়। আসামী—নং১। শ্রীরামদাস দে।
সাং বজ্রাঙ্কুশপুর, ২। দ্বিজবর সাঁতরা।
থানা ধনেখালী। ৩। হংসধ্বজ সামন্ত।
সর্ব্ব সাং বজ্রাঙ্কুশপুর।

শ্রীত্রিলোচন রায়

সাক্ষী—নং ১। শ্রীরামশঙ্কর মণ্ডল।
২। শ্রীধনঞ্জয় পাল।
৩। শ্রীরাজ চন্দ্র বেরা।
৪। শ্রীকৃত্তিবাস পালিত।
সর্ব্ব সাং বজ্রাঙ্কুশপুর।

দরখাস্তকারী শ্রীত্রিলোচন রায়। অধীনের নিবেদন এই যে, গত ১৫ই কার্ত্তিক বেলা আন্দাজ চারিদণ্ড থাকিতে ১নং আসামীর গোরুতে অধীনের কলম তছরূপ করা সূত্রে বাদ প্রতিবাদ হইতে থাকার কালে উক্ত আসামীর আদেশ মত ২নং ও ৩নং আসামীগণ অধীনকে মারপিট করিতে আশায় অধীন প্রাণভয়ে বাটী প্রবেশ করায় ১নং ২নং ও ৩নং আসামী সকলেই অধীনের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অধীনকে কীলে চড় ও লাথি মারিতে থাকার কালে সাক্ষীগণ আসিয়া পৌঁছিলে পলায়ন করে। অতএব অত্রদ্বারা প্রার্থিত যে, আসামীগণের প্রতি দণ্ড বিধি আইনের ৪৪৮ ও ৩৫২ ধারা মত বিচার করিবার পক্ষে যথানুমতি হয়। হুজুর মালিক নিবেদন ইতি তাং ১৬ই কার্ত্তিক ১২৯৩ সাল।

কার্টিজ কাগজে এই রূপে দরখাস্ত লিখিয়া তাহার উপরি

ভাগে ॥০ আনার কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তাঁহার যে আমলা থাকেন, তাঁহার হাতে দিলে যখন বাদীকে ডাক হইবে, তখন অদালতে উপস্থিত হইয়া শপথ করিয়া বাচনিক এজেহার দিতে হইবে।

পুলিশধর্ত্তব্য ও ওয়ারেণ্টের মোকর্দ্দমা হইলে আসামী সাক্ষীকে সমন করাইবার জন্য কোন খরচ লাগেনা। নতুবা প্রত্যেক আসামী ও সাক্ষীর বাস এক গ্রামে হইলে, প্রথম ব্যক্তির প্রতি সমনের ॥০ আনা। আসামী ও সাক্ষীরা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের হইলে এক এক গ্রামের এক এক ব্যক্তির প্রতি ॥০ আনা ও সেই সেই গ্রামের দুই তিন জন থাকিলে প্রত্যেকের প্রতি ।০ আনা লাগে। যদি একগ্রামে একজনের অধিক আসামী বা সাক্ষী না থাকে, তবে তাহার জন্য ॥০ আনা মাত্র দিতে হয়।

আসামী বা সাক্ষী সমনে হাজির না হইলে ওয়ারেণ্ট করিতে হয়, তাহাতেও উপস্থিত না হইলে ইস্তাহার জারি ও মাল-ক্রোক, পরিশেষে তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পুলিশ ধর্ত্তব্য ও ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় এই সকল খরচ বাদীকে দিতে হয় না। তবে সমনের মোকর্দ্দমা হইলে সমনজারির নিয়মানুসারে ঐরূপ প্রত্যেক ওয়ারেণ্টের খরচ ১৲ টাকা ও ॥০ আনা, মাল-ক্রোকের খরচ ২৲ টাকা ও ইস্তাহার জারীর খরচ ১৲ টাকা বাদীকে দিতে হয়। এই সকল খরচ সমনের মোকর্দ্দমায় বাদীকে দিতে হয় বটে, কিন্তু আসামী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে অথবা কারাবাসের উপরও যদি তাহার অর্থদণ্ড হয়, তবে বিচার-কর্ত্তা জরিমানার টাকা হইতে অথবা জরিমানা টাকা বাদে

আসামীর নিকট হইতে বাদীর ন্যায্য মোকর্দ্দমা খরচ দেওয়াইতে পারেন।

দরখাস্ত ও মোক্তারনামা ইত্যাদি।—দরখাস্তকারী নিজে লিখিতে না পারিলে মোক্তার ও উকীলের মোহরেরা লিখিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ৵০আনা।০ আনা দিতে হয়। তদ্ভিন্ন ফৌজদারী আদালতে ন্যায্য খরচ আর কিছুই নাই; তবে সাক্ষীর জবানবন্দী বা আসামীর জবাবের নকল লইতে হইলে তাহার জন্য দরখাস্ত করিতে ষ্ট্যাম্প ও কাগজ খরচ ৷৵৫ আনা বাদে নকলের জন্য যে ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহার হয়, তাহার যত খণ্ড, লাগিবে প্রত্যেক খণ্ডের জন্য ৵০আনা হিসাবে দিতে হইবে। কেন না সাদা কাগজে নকল লইলে তাহা আদালত গ্রাহ্য হয় না এবং আদালতের আমলাদিগকেও তদ্রূপ কাগজে নকল দিতে নিষেধ আছে।

সাধারণতঃ ওকালত ও মোক্তারনামা যেরূপে লিখিতে হয়, নিম্নে তাহার একটী আদর্শ দেওয়া হইল।

মহামহিম শ্রীযুক্ত হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব
বাহাদুর বরাবরেষু—

বাদী—শ্রীত্রিলোচন রায়। আসামী—শ্রীরামদাস দে।
মোকর্দ্দমা দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৮।৩৫২ ধারা মত।

শ্রীত্রিলোচন রায়

দরখাস্তকারী শ্রীত্রিলোচন রায়। কস্য মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে নিবেদন এই যে, অত্রদ্বারা আমি এই আদালতের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রথম ভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার তরফে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। তিনি আমার পক্ষে মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য উভয়

পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী সওয়াল জবাব ও হুজুরাদালতে বক্তৃতাদি করিবেন, তাহা আমার নিজের উক্তির ন্যায় এবং আমার পক্ষে যে সকল কাগজ পত্র ও টাকা কড়ি দাখিল করিবেন ও ওয়াপোষ লইবেন, তাহা আমার নিজ কৃত বলিয়া গণ্য হইবে নিবেদন ইতি, তাং ১৬ই কার্ত্তিক, ১২৯৩ সাল।

পুলিশ থানা বা আউটপোষ্টে যে সকল নালিশ করিতে হয়, তাহা না লিখিয়া মুখে বলিলেও চলে। পুলিশ কর্ম্মচারীরা আপনাদের প্রথম এত্তেলা বহীতে তাহা অবিকল লিখিত করিয়া বাদীকে তাহা পাড়িয়া শুনাইলে তবে তাহার নীচে তাহাকে দস্তখৎ করিতে হয়।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তিনি নিজে বা কোন পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা অন্য কোন লোকের দ্বারা তাহার তদন্ত করিয়া বা না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

সমনের মোকর্দ্দমায় মাজিষ্ট্রেট যদি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, তবে স্বয়ং এবং তন্নিম্ন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া মোকর্দ্দমা চলিতে চলিতে যে কোন সময়ে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিশ্‌ করিয়া আসামীকে খালাস দিতে পারেন, কিন্তু এরূপে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিশ্‌ করিবার জন্য তাঁহাকে কারণ জানাইতে হইবে।

এরূপ মোকর্দ্দমায় মাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিনে বাদী অনুপস্থিত থাকিলে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিশ্‌ করিতে পারেন।

বাদী বিশেষ কারণ দর্শাইয়া বিচার নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বে

যে কোন সময়ে এইরূপ মোকর্দ্দমা চালাইতে ক্ষান্ত থাকিবার প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা গ্রাহ্য করেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেসন জজের নিকট সাক্ষীর যে জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়, তাহা আসামীর সমক্ষে তাহাকে পড়িয়া, কিম্বা অন্য ভাষায় জবানবন্দী লিখিত হইলে তাহা অনুবাদ করিয়া, শুনাইতে হইবে। যদি সাক্ষীর কোন কথা লিখিতে ভুল হইয়া থাকে, তবে বিচার কর্ত্তা জবানবন্দীর শেষে সেই কথা লিখিয়া তবে আপনি স্বাক্ষর করিবেন।

নিম্নোক্ত স্থলে ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় আপীল হইতে পারে না;—

কোন দায়রার জজের নিকট অথবা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া কোন ব্যক্তির দণ্ড হইলে তাহার আপীল হয় না। কেবল দণ্ডের সাঙ্গত্য ও পরিমাণ পক্ষে হইতে পারে।

যদি কোন দায়রার জন্য জজ জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট এক মাস কারাদণ্ড বা ৫০৲ টাকার অনূর্দ্ধ অর্থদণ্ড করেন, বা বেত্রাঘাতের আদেশ দেন, তবে তাহার আপীল হইবে না।

বাদী ও সাক্ষীদিগের এজেহারের স্থূল মর্ম্ম মাত্র লিখিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য কতকগুলি মাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। যদি তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে কোন মোকর্দ্দমার বিচার করিয়া আসামীকে ৩ মাস কয়েদ অথবা ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করেন, তাহা হইলেও তাহার আপীল হইতে পারেনা।

প্রেসিডেন্সি বা জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যদি সচ্চরিত্রে কালযাপন করিবার জন্য জামিন লইবার মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া আসামীর জামিন দেওয়া অবধারিত হয়, তবে তাহার আপীল নাই, তদ্ভিন্ন অন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচার হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল হইতে পারিবে।

যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারে দণ্ডিত হয়, তবে সে জেলার মাজিষ্ট্রেটর নিকট আপীল করিতে পারে।

আপীল করিবার কালে যে হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়, তাহার নকল আপীলের দরখাস্তের সহিত দিতে হয়।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের নিষ্পন্ন মোকর্দ্দমার আপীল সেসন জজের নিকট রুজু করিতে হয়।

আপীলের জন্য যে হুকুমের নকল লইতে হয়, তাহা নকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট ষ্ট্যাম্প কাগজে লইতে হয়, এবং আপীলের দরখাস্তেই ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। কেবল দণ্ডিত ব্যক্তি যদি কারাগারে থাকে, তবে তাহার আপীলের দরখাস্ত ও নকলাদি কোন কাগজে ষ্ট্যাম্প লাগে না। সে ব্যক্তি আপনার আপীলের দরখাস্ত লিখিয়া জেলের কর্ম্মচারীর নিকট দিলে তিনি তাহা উপযুক্ত বিচারাদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দায় ভাগ।

দায় শব্দে ধন, এই ধন বিভাগের নাম দায়ভাগ। প্রাচীন পণ্ডিতগণ আপনাদিগের অভিজ্ঞতানুসারে যুক্তিদ্বারা দায়ভাগ সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে পুত্র পৌত্র পৌত্রাদি উত্তর পুরুষগণ, পিতা পিতামহাদির ধনে অধিকার লাভে আপনাদিগের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া থাকেন।

যে ধনে সকল ভ্রাতারই প্রত্যেকের অংশ আছে, তাঁহাদের কেহ পৈতৃক ধন বিভাগ কালে যদি তাহার কিয়দংশ গোপন করে তবে তাহাকে চুরি করা বলে না। যাহাতে স্বত্ব আছে এমন ধন গোপন করা চুরি নহে। আত্মস্বত্ব রহিত ধন অপহরণ করাকে চুরি বলে।

সকল ধনেরই বিভাগ হইয়া থাকে, কেবল মূলধনীর যদি একটীমাত্র গো বা দেবতা প্রভৃতি থাকিলে তাহাদের বিভাগ হয় না। তাহাদের স্বত্ব কালে ভোগ হইবে।

পিতা পুত্রদিগকে আপন ধন বিভাগ করিয়া দিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। যদি সন্ন্যাস গ্রহণ না করেন তবে স্বোপার্জ্জিত ধন পুত্রদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু কিছু দিয়া আপনি সমস্ত ধনভোগী ও গৃহবাসী হইতে পারেন। যদি তাঁহার সেই ধন নষ্ট হয় তবে পুনর্ব্বার পুত্রদিগের নিকট হইতে লইতে পারেন, তাহারা অসম্মত হইলে রাজা তাহা দেওয়াইবেন।

সোপার্জ্জিত ধনে পিতার ইচ্ছাধীন সমান বা অসমান বিভাগ হয়, কিন্তু পিতামহাদির ধনে বিষম ভাগ হইতে পারে না।

পিতামহের স্থাবরাদি ধন অন্য কর্তৃক অপহৃত হইলে পিতা যদি সেই ধন পুনরুদ্ধার করেন, তবে তাহা বিভাগে পিতা সোপার্জ্জিত ধনের ন্যায় স্বীয় ইচ্ছার ইতর বিশেষ করিতে পারেন।

পিতামহের স্থাবর মণি মুক্তা স্বর্ণ রজত প্রবালাদি ধনে পিতার সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্ব থাকে, কিন্তু স্থাবরাদি ধনের প্রভু পিতা পিতামহ কেহই নহেন।

পিতামহের স্থাবরাদি ধন অন্য কর্তৃক অপহৃত হইলে যদি তাহা বহু পৌত্রের মধ্যে এক পৌত্র উদ্ধার করে, তবে তাহার চতুর্থাংশ ধন সেই ব্যক্তি সোপার্জ্জিতবৎ গ্রহণ ও অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ সমানরূপ ভাগ করিয়া ভ্রাতাদিগের সমান একাংশ গ্রহণ করিতে পারে।

পিতা কর্তৃক ধন বিভাগান্তর যদি পিতার অন্য পুত্র জন্মে, তবে সেই পুত্রের পিতৃবিভাগ ধনে অধিকার হয়। কিন্তু ভ্রাতাদিগের ধনে অধিকার হয় না, এবং পূর্ব্বে যে সকল ভ্রাতা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও আর ঐ পিতৃধনে অধিকার থাকে না।

যদি বিমাতা স্ত্রীধন না পাইয়া থাকেন এবং পিতা কর্তৃক পুত্রদিগের অংশ বিভাগ হয়, তবে বিমাতাকে সন্তানদিগের সহিত সমানাংশ দিতে হইবে। যদি স্ত্রীধন লাভ করিয়া থাকেন তবে অর্দ্ধাংশ লইবেন।

পিতামহ ধনে পিতামহী প্রভৃতিও এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ পিতামহীসত্ত্বে পৌত্র কর্তৃক পিতামহ ধনের বিভাগকালে তাঁহাকে মাতৃবৎ ভাগ দিতে হইবে।

যখন পিতার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন পিতামহের ধন পৌত্র কর্তৃক বিভাগ হইবে।

পিতা মাতার বিদ্যমানাবস্থায় ধন বিভাগ করা ধর্ম্মতঃ সিদ্ধ হয় না।

পতিত কিম্বা প্রব্রজিত অর্থাৎ সংসারাশ্রমশূন্য অথবা ধনেচ্ছারহিত পিতা বর্ত্তমান থাকিলেও পুত্রেরা ধন বিভাগ করিয়া লইতে পারে।

পিতা জীবনাবস্থায় এই ধন দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে অথবা ঋণ করিলে, পত্রেরা পিতার বিয়োগানন্তর সেই ধন রাখিয়া অবশিষ্ট ধন বিভাগ করিয়া লইবেন। যদি পিতার ধন না থাকে, তথাপি পত্রেরা আপনাদিগের ধনে পিতার ঋণাদির পরিশোধ করিবেন।

মাতা বর্ত্তমান থাকিলে যদি ধন বিভাগ হয়, তবে পুত্রেরা আপনাদিগের সমান অংশ মাতাকে দিয়া অংশ করিয়া লইবেন। কিন্তু প্রাপ্ত স্ত্রীধনে পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধাংশ পাইবেন।

অপ্রাপ্ত বয়স্থ বালকের ধন অথবা বিদেশস্থ ব্যক্তির ধন কোন বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিবে।

যে ব্যক্তি কৃতী, স্বীয় ক্ষমতায় উপার্জ্জন করে এবং পিতৃধনে স্পৃহারহিত হয়, তাহার পত্রের দুরন্ততা নিরাশের নিমিত্ত তণ্ডুল গ্রস্থাদি দিয়া বিভাগ করিবে। অর্থাৎ কিঞ্চিদ্দিয়া অংশ নিরস্ত করিবে।

অসংস্কৃত ভ্রাতা কি ভগিনী যদি থাকে তবে পৈতৃক ধন দ্বারা সংস্কার করিয়া তবে অবশিষ্ট ভাগ হইবে। পিতৃধনের অভাবে স্বীয় ধন দ্বারা তাহাদিগের সংস্কার করিবে, অনূঢ়া দুহিতার বিবাহোচিত বস্তু দান করিয়া ধন বিভাগ করিবে।

পৈতৃকধনে অনধিকারীণো ব্যবস্থা।

ধর্ম্মযুক্ত পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী হয়, অধার্ম্মিকের ধনাধিকার হয় না। মৃতজনের শ্রাদ্ধাদি না করিয়া তাঁহার ধন হরণ করিলে গৃহীতা চতুর্ব্বর্ণ বধের যে পাপ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিয়তই করিবে।

পিতার মরণানন্তর ক্লীব, কুষ্ঠী, উন্মত্ত, জড়, জন্মান্ধ, পতিত-পুত্র, সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণশীল, পিতৃধন প্রাপ্ত হয় না। কেবল অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু পতিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রেলওয়ের নিয়ম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সকল ষ্টেশনেই মান্দ্রাজের অনুরূপ সময় রাখা হয়, এবং সেই অনুসারে রেলওয়ের ঘড়ী মিলান থাকে। আমাদের কলিকাতার সময় অপেক্ষা উহা ৩৩ মিনিট কম অর্থাৎ যখন আমাদের কলিকাতার ঘড়ীতে ১০টা বাজে তখন মান্দ্রাজ সময়ের ৯টা ২৭ মিনিট।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ভাড়া মাইলে প্রতি ১ম শ্রেণীর জন্য ৴১০ আনা, ২য় শ্রেণীর জন্য ৲১৫ তিন পয়সা, মধ্যবর্ত্তী শ্রেণার জন্য ৲৭॥ দেড় পয়সা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ইংরেজী ৲২॥ পাই। ইংরেজী ১২ পাইয়ে এক আনা হয়।" ৩ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর ভাড়া লাগে না, তদূর্দ্ধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক বালিকার ভাড়া উপরোক্ত ভাড়ার অর্দ্ধেক।

ঘোড়ার ভাড়া আরোহীর গাড়ীতে প্রতি মাইলে ৵০ আনা, ২টীর ৶০ আনা, তিনটীর ।০ আনা, ৪টীর ।৵০ আনা, ৫টীর ।৶০ আনা, এবং ৬টী হইলে ॥০ আনা, অর্থাৎ একই ব্যক্তি একটীর অধিক লইয়া যাইলে উক্তরূপ ভাড়ার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঘোড়ার সহিত একজন করিয়া চাকর বিনা ভাড়ায় লইয়া যাওয়া যায়।

কুকুর গাড়ীতে লইয়া যাইলে প্রতি ৫০ মাইলে ।০ আনা। আরোহীর সহিত লইয়া যাইলে উহার দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হয়। কুকুর ভিন্ন বিড়াল, বাঁদর, খরগস ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জন্তুর ভাড়াও ঐরূপ।

যদি কেহ টিকিট না লইয়া গাড়ীতে উঠেন, কিম্বা টীকিট হারাইয়া ফেলেন, তবে যেখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়াছে তাঁহাকে সেখান হইতে ভাড়া দিতে হইবে।

কোন্ কোন্ ষ্টেশনে গিয়া আরোহীদিগকে গাড়ী বদল করিতে হয় যথা,—বরাকর যাইতে সীতারামপুরে, রাজমহল যাইতে তিন পাহাড়ে, মুঙ্গের যাইতে জামালপুরে, কাশী যাইতে মোগল সরাইয়ে, জব্বলপুর যাইতে এলাহাবাদে, আগরা যাইতে ঢোলপুরে এবং গোয়ালিয়র যাইতে টুণ্ডলায়, গিরিডি যাইতে

মধুপুরে, ত্রিহুত যাইতে মোকামায়, গয়া যাইতে বাঁকীপুরে, অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলপথে যাইতে কানপুর বা আলিগড়ে, পঞ্জাব যাইতে গাজিয়াবাদে, এবং তারকেশ্বর যাইতে সেওড়াফুলিতে গাড়ী বদল করিতে হয়।

কলিকাতা হইতে যাঁহারা প্রথম, দ্বিতীয়, বা মধ্যশ্রেণীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে কোথাও যাইবেন, তাঁহার উক্ত কোম্পানীর কলিকাতাস্থ ফেয়ার্লীপ্লেশে যে আপিস আছে সেখান হইতেও টীকিট লইতে পারেন।

এক শ্রেণীর টীকিট লইয়া উপরের শ্রেণীতেও যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে যাইবার যে অতিরিক্ত ভাড়া তাহা ধরিয়া দিতে হইবে।

যাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে গমন করেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়া ৩ জন চাকর বা চাকরাণীকে এবং যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে গমন করেন তাঁহারা ২ জন ঐরূপ ব্যক্তিকে আপনাদের গাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন।

কোন গাড়ীর একটী খণ্ড বা সমস্ত ভাড়া লইতে হইলে ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে সংবাদ দিতে হয়। ঐরূপ এক একটী খণ্ডের জন্য ৮ জনের ভাড়া দিলে সমস্ত খণ্ডটী একচেটিয়া করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সাধারণ রিটারণ টিকিট।—প্রথম দ্বিতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর আরোহীকে যাতায়াতের টিকিট একবারে লইতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের জন্য রিটারণ টিকিট পাওয়া যায় না। যিনি যে শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সেই শ্রেণীর পুরা ভাড়া ও তহার তিন ভাগের এক ভাগ

দিয়া উক্তরূপ টীকিট লইতে হইবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ফিরিয়া আসিতে না পারিলে সে টীকিট ব্যবহার করা যাইতে পারিবে না। যথা—১৫০ অথবা তাহার কম দূর যাইবার জন্য ৫ দিন, ২৫০ মাইলের অধিক ৫০০ মাইলের ন্যূন ৮ দিন, ৫০০ মাইলের অতিরিক্ত দূরের জন্য ১২ দিন।

উক্তবিধ রিটারণ টিকিট ৪ মাসের জন্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ১৩০ মাইলের কম দূরে যাইবার জন্য পাওয়া যায় না। ভাড়ার নিয়ম এই, যে শ্রেণীতে যাইবার ইচ্ছা হইবে তাহার দেড়া ভাড়া লাগিবে। এইরূপ টীকিট লইয়া, যেখানে ইচ্ছা নামিতে পারা যায় কিন্তু একদিকে একবারের অধিকবার যাওয়া যায় না অর্থাৎ কলিকাতা হইতে কাশী যাইবার জন্য টীকিট বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়া হুগলী আসিয়া তাহার পর আবার কাশী যাওয়া যাইতে পারে না।

প্রথম শ্রেণীর আরোহী বিনা ভাড়ায় দেড় মন, দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ত্রিশ সের, মধ্য শ্রেণীর আরোহীরা ২০ সের, তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ১৫ সের এবং বালক উহাদের অর্দ্ধেক ভাড়া লইয়া যাইতে পারেন। তদূর্দ্ধ প্রত্যেক মাইলে অর্দ্ধ পয়সা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়।

পৃথক্ পার্শেল পাঁচ সের ওজনে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইলে ৶০ আনা, অতিরিক্ত ১০০ প্রতি ১০০ মাইলে ⁄০ আনা; দশ সেরে ।⁄০ আনা, অতিরিক্ত প্রতি ১০০ মাইলে ৶০ আনা; কুড়ি সেরে ।৶০ আনা অতিরিক্ত প্রতি ১০০ মাইলে ।⁄০ আনা; চল্লিশ সেরে ৵০ আনা, অতিরিক্ত ১০০ মাইলে ।৶০ আনা ভাড়া লাগে।

রেলওয়ে গাড়ীতে মৃতদেহ লইয়া যাইতে হইলে মাইল প্রতি ।৶৹ ভাড়া লওয়া হয়, কিন্তু ভাড়া ৫৲ টাকার যত কম হউক পুরা ৫৲ টাকা দিতে হইবে।

কতকগুলি নিয়ম।—গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিবে তখন কেহ তাহাতে উঠিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা যেখানে যখন টীকিট দেখিতে চাইবেন দেখাইতে হইবে।

সংক্রামক রোগ যথা, বসন্ত, ওলাউঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া কেহ গাড়ীতে উঠিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত ব্যক্তিকেও গাড়ীতে যাইবার নিষেধ আছে।

রেলওয়ে কোম্পানীকে ঠকাইবার উদ্দেশে যে কোন কাজ করিবে তাহাতেই দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

সহযাত্রিদিগের সম্মতিক্রমে গাড়ীর মধ্যে ধূমপান করা যাইতে পারে।

গাড়ীতে কোন অসুবিধা বা বিপদ উপস্থিত হইলে গর্ড সাহেব বা ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইতে হইবে। তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তারের সংবাদ।

টেলিগ্রাফের সুবিধা।—ডাকের সৃষ্টি হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে দেশ বিদেশে পত্র পাঠাইবার যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে আরও শীঘ্র সংবাদ পাঠান যাইতে পারে। এমন কি টেলিগ্রাফ আপিসে বসিয়া যতদূর হউক না কেন, আমাদের দেশের অন্য কোন স্থানের লোকের সহিত কথা বার্ত্তা, কাহারও মত, সংবাদ দেওয়া ও লওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে কিছু অধিক খরচ লাগে।

সংবাদের শ্রেণী ভাগ।—তারে সংবাদ পাঠাইবার খরচ তিন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—জরুরী (urgent), সাধারণ (ordinary) এবং বিলম্বিত (deferred)।

জরুরি সংবাদ।—আটটী কথায় দুইটী টাকা এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক কথায় ।০ আনা খরচ লাগে। এই সংবাদ পাইবা মাত্র টেলিগ্রাফ অপিশের কর্ম্মচারীরা তৎক্ষণাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া থাকেন।

সাধারণ সংবাদ।—আটটী কথায় ১৲ টাকা এবং অতিরিক্ত একটী কথায় ৵০ আনা খরচ দিতে হয়। টেলিগ্রাফের কর্ম্মচারীরা আপনাদের জরুরী কাজ সারিয়া এই রূপ সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন। এজন্য কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভবনা।

বিলম্বিত সংবাদ।—এই সংবাদ উপরোক্ত দুই প্রকার

সংবাদের পরে প্রেরিত হয় বলিয়া বিলম্ব অধিক হয়। সচরাচর যে দিন সংবাদ রওনা করা যায়, তাহার পর দিন প্রাতে ঠিকানায় পৌঁছিয়া থাকে। ইহার খরচ অটটী কথায় ‌॥৹আনা, অতিরিক্ত প্রত্যেক কথায় ⁄৹আনা হিসাবে দিতে হয়।

যেমন ডাকঘরে চিঠি খানি ॥৹ তোলার কম ওজনের হইলেও ৵৹ আধ আনা দিতে হয়, তেমনি আট্‌টীর কম কথার সংবাদ দেওয়া হইলেও আটটী কথারই মাসুল দিতে হয়।

যাহাকে সংবাদ পাঠান যায়, তাহার নাম ও ঠিকানা এবং যে ব্যক্তি পাঠায় তাহার কেবল মাত্র নামটীর জন্য খরচ দিতে হয় না। যদি কোন সংবাদ প্রেরক আপনার ঠিকানা সংবাদ স্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার জন্য উপরোক্ত হিসাবে খরচ দিতে হইবে।

সংবাদ পাঠাইবার সময় ফরমে লিখিয়া দিতে হয়—সেই সংবাদটী উপরোক্ত তিনটীর মধ্যে কোন শ্রেণীর।

সংবাদ কোন্ ভাষায় কি অক্ষরে লিখিতে হয়।—সকল সংবাদই ইংরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে। কিন্তু সকল ভাষাতে দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজী অক্ষরে, বাঙ্গালা, হিন্দি, পারসী, উর্দ্দু সকল ভাষায় সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজী ভাষার ছয়টী বাক্যাংশ (syllable) অপেক্ষা যদি কোন কথা অধিক হয়, তবে তাহা একটী অতিরিক্ত কথার মধ্যে গণ্য হইবে।

ফরম কোথায় পাওয়া যায়।—সংবাদ পাঠাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছাপান ফরম বিনা মূল্যে সকল টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আপিশে

প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফরম না পাওয়া গেলে সাধারণ কাগজে সংবাদ পাঠাইবার উপরোক্ত বিষয় গুলি লিখিয়া দিলেও চলে।

কোন্ সংবাদ গ্রহণ করা হয়না।—ভীতি বা সন্দেহজনক কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে টেলিগ্রাফ আপিশে কর্ম্মচারীরা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর অনুমতি ব্যতীত পাঠাইতে পারেন না।

প্রেরকের স্বাক্ষর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার নিজের হওয়া চাই। তৎসম্বন্ধে টেলিগ্রাফ আপিশের কর্ম্মচারীদিগের সন্দেহ হইলে যে ব্যক্তি সংবাদ লইয়া যায়, তাহাকে সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইবে। লিখিত সংবাদের উপর কাট্‌কুট থাকিলে প্রেরককে তাহার উপর স্বাক্ষর করিতে হয়।

রসীদ খরচ সমেত টেলিগ্রাফের সংবাদ অপিশে দাখিল করিলে একখানি রশীদ পাওয়া যায়। যে জাহাজে ডাক যায়, সেই জাহাজ বা অন্য কোন জাহাজ হইতে কেবল বেয়ারিং সংবাদ গ্রহণ করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের বেয়ারিং সংবাদ দেওয়া যায় না।

প্রত্যুত্তর জাইবার খরচ।—কাহারও নিকট তারে সংবাদ দিয়া তাহার উত্তর পাইবার জন্য টেলিগ্রাফ আপিশে খরচা জমা দিতে হইলে টেলিগ্রাফের সংবাদের নীচে (Reply prepaid) "যবাবের খরচা দেওয়া গল" এই কথা লিখিয়া দিতে হয়। ঐ কথার জন্য পৃথক খরচ দিতে হয় না। কিন্তু যবাব পাইবার জন্য যে খরচ দেওয়া হইবে তাহা কোন মতে ॥০ আনার কম না হয়। এরূপ টেলিগ্রাফ বিলি না হইলে প্রেরককে তাহার খপর দেওয়া হইয়া থাকে। যে টেলিগ্রাফ বিলি হয় নাই, প্রেরক

কলিকাতা টেলিগ্রাফ চেক আপিশে দরখাস্ত করিয়া তাঁহার জমা দেওয়া টাকা ফেরত লইতে পারেন। যে ব্যক্তিকে এই রূপে সংবাদ পাঠান যায়, টেলিগ্রাফ আপিশ তাঁহাকে সংবাদ সহিত যবাবের খরচ পাঠাইয়া দেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার পর ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন।

টেলিগ্রাফের প্রাপ্তিস্বীকার।—যদি কোন টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া কেহ সেই টেলিগ্রাফ পৌঁছিল কি না তাহার খবর জানিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিরিক্ত ১৲ টাকা জমা দিতে হইবে। টাকা জমা দিলে তিনি যেখানে থাকিবেন, সেই খানে তাঁহাকে খবর পৌঁছিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে টেলিগ্রাফ আফিশে তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া দিতে হইবে।

টেলিগ্রাফ খোলা বিলি হইবার বিষয়।—প্রেরক ইচ্ছা করিলে টেলিগ্রাফ খোলা ভাবে বিলি হইতে পারে, কিন্তু তাহা ফরমে লিখিয়া দিতে হইবে।

টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটিলে, কোন কর্ম্মচারী আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, কলিকাতাস্থ টেলিগ্রাফ অপিশের প্রধান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে চিঠি দ্বারা জানাইলে তাহার প্রতিবিধান হইবে।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ডাকঘরসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

মুসলমানদিগের অধিকার কালে আমাদের দেশে ডাকে পত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিলেও অধুনা তাহার বহুল প্রচার ও সুবিধা নির্ব্বন্ধন লোকে সর্ব্বদা ডাকযোগেই পত্রাদি ও ছোট ছোট জিনিষ পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন।

সংবাদ পাঠাইবার জন্য পোষ্ট-কার্ড ও পত্র সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পোষ্ট কার্ড।—পোষ্ট-কার্ডের শিরোনামে কেবল নাম ও ঠিকানা ব্যতীত আর কোন কথা—যেমন "জরুরী," "শীঘ্র পৌঁছে" ইত্যাদি কথা, এমন কি যিনি সেই কার্ড পাঠান তাহার নাম পর্য্যন্ত লিখিলে ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা তাহার জন্য ৵১০ আধ আনা মাশুল আদায় করিয়া থাকেন। অতএব তাহা নিষিদ্ধ। এইরূপ এক পয়সার কার্ডে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং ব্রহ্মদেশে সংবাদ পাঠান যাইতে পারে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড বা আয়লণ্ড প্রভৃতি দেশে যে পোষ্ট কার্ড পাঠান যায় তাহার মূল্য ✓১০ দেড় আনা।

কার্ডে পত্র লিখিয়া কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উত্তর পাইবার জন্য "যবাবী" (Reply) কার্ড ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের জন্য যে যবাবী কার্ড ব্যবহার করা যায়, তাহার মূল্য ৵১০ আনা, এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের জন্য ৶০ আনা। যবাবী কার্ড সম্বন্ধেও উক্তরূপ নিয়ম। কেবল

সেই কার্ডের যে অংশ টুকুতে যবাব আসিবে, তাহার যে দিকে শিরোণামা দিতে হয়, সেই দিকে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিতে পারা যায়।

চিঠি।—বিস্তারিত সংবাদ লিখিবার প্রয়োজন হইলে চিঠি লিখিতে হয়। সেই চিঠি পাঠাইবার জন্য ডাকঘরে এক রকম "থাম" পাওয়া যায়। এই প্রকার থাম ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের পাওয়া যায়, যথা,—৴১০ আনা, ৴১৫ আনা, ৵০ আনা, ও।১০ আনা। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী ৮ পাই অর্থাৎ তিন পয়সা অপেক্ষা কম মূল্যেরও একপ্রকার মজবুত থাম পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই রেজিষ্ট্রী চিঠির জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

অগ্রিম মাশুল।—বাজারে সচরাচর যে থাম পাওয়া যায়, তাহার ভিতর পুরিয়াও পাঠান যায় কিন্তু খরচস্বরূপ আধতোলা ওজনের চিঠিতে ৴১০ আনার টিকিট, আধ তোলার উপর ১ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠিতে ৵০ আনা, এবং এক তোলার উপর প্রত্যেক ১ তোলা ওজনে ৵০ হিসাবে টিকিট দিতে হয়। টিকিট না দিলে সেই চিঠি পৌঁছিয়া দিয়া ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা দ্বিগুণ মাশুল আদায় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অনেকের একটা ধারণা আছে, বেয়ারিং (টিকিট না দেওয়া) চিঠি শীঘ্র যায়, বাস্তবিক তাহা নহে, বরং স্থানবিশেষে অর্থাৎ মফস্বলের ডাকঘরে ঐ রূপ পত্র দিলে অতিরিক্ত একদিন বিলম্ব হয়, কেননা আজি কালি পল্লীগ্রামের শাখা ডাকঘরের সমস্ত টাকা কড়ির কাজ যে বড় আপিসের সহিত থাকে, সেই ডাকঘরে আসিয়া মাশুলের হিসাব ভুক্ত হইবার জন্য একদিন পড়িয়া থাকে।

ইংলণ্ড স্কটলণ্ড আয়রলণ্ড প্রভৃতি দেশে চিঠি পাঠাইতে হইলে অর্দ্ধ আউন্স অর্থাৎ এক টাকা ও চারি আনা ওজনের পত্রে ।১০ আনা লাগে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট, কানেডা প্রভৃতি দেশে যদি ব্রিটন রাজ্য দিয়া চিঠি পাঠান যায়, তাহা হইলেও ঐহারে মাসুল দিতে হয়।

ইউরোপের অন্যান্য দেশে পত্র পাঠাইতে উপরোক্ত ওজনের চিঠির জন্য ৵০ আনা মাসুল লাগে। ফরাসী প্যাকেটে, লঙ্কাদ্বীপে চিঠি পাঠাইতে হইলে প্রতি এক আউন্স ওজনের পত্রে ৵০ আনা এবং যদি স্থলপথের ডাকে পাঠান যায়, তাহা হইলে ৵০ আনা দিতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশের জন্য ১ আউন্স ওজনে চিঠির মাসুল ।৵০অনা এবং ব্রিণ্ডিসি হইয়া উত্তমাশা অন্তঃরীপ ও নেটালে চিঠি দিতে হইলে যথাক্রমে ॥৵০ আনা ও ॥০ আনা মাসুল দিতে হয়।

অব্যবহার্য্য টিকিট।—একবার ব্যবহার করা হইয়াছে অর্থাৎ যাহার উপর ডাকঘরের মোহর দেওয়া হইয়াছে, এরূপ টিকিট, কিম্বা সে টিকিট (এম্বস্ট এনভেলপ) টিকিটযুক্ত খাম বা পোষ্ট-কার্ড হইতে কাটিয়া লওয়া লইলে তাহাও ব্যবহৃত হইতে পারেনা। যদি কেহ তদ্রূপ টীকিট ব্যবহার করে, তবে সে চিঠি মাসুল না দেওয়ার জন্যে বিলি করিবার সময় দ্বিগুণ মাসুল আদায় হইবে। যদি কেহ গবর্ণমেণ্টের মাসুল ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে সেরূপ কাজ করে, তবে তাহা প্রমাণিত হইলে তাহার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা বাস, অথবা অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

পত্রাদি বিলম্বে রওনার মাসুল।—ডাকঘর হইতে পত্রাদি রওনা হইবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আপিশের বাক্স হইতে পত্রাদি বাহির করা হয়, তাহার পর ডাকঘরের বাক্সে কোন পত্রাদি দিলে সে পত্র আর সেই ডাকে রওনা হয় না, কিন্তু যদি পত্রের উপযুক্ত মাসুলের অতিরিক্ত।০ আনার টিকট তাহাতে লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ডাক রওনার ১৫ মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিঠি দিলে সেই ডাকে যাইবে।

চিঠির বাক্স।—যেসকল ডাকবাক্সে "কেবলমাত্র চিঠি" (Letters only) লেখা থাকে, তাহাতে কেবল পত্র ও পোষ্ট-কার্ড দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কাগজ পত্র রওনা করিলে তাহা পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া থাকে।

রওনা করা দ্রব্য ফেরত লেওয়া।—কোন পত্র, পোষ্টকার্ড, বুক প্যাকেট বা পার্শেল ডাকঘরে দিয়া ফিরাইয়া লইতে হইলে, কোন বিভাগের উচ্চতন কর্ম্মচারী, ডিরেক্টর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অথবা গবর্ণরজেনেরলের অনুমতি ও এক টাকা ফি ব্যতীত পাওয়া যায় না। ঐ ফি প্রত্যেক দরখাস্তের জন্য জানিতে হইবে। যদি একখানি দরখাস্তে ঐরূপে তিন চারি খানি চিঠি বা কোন কাগজ পত্র ফেরত লইবার প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলেও অধিক দিতে হইবে না।

একখানি চিঠির ভিতর একজনের অধিক ব্যক্তির জন্য পৃথক শিরোণামাযুক্ত পত্র দেওয়া নিষিদ্ধ।

চিঠিতে যে অগ্রিম মাসুল (টিকিট-যোগে) দেওয়া যায়, তাহা যদি ওজনের উপযুক্ত না হয়, তবে ওজনের পরিমাণ যত

হইবে তাহার দ্বিগুণ মাস্থল চিঠি বিলি করিবার সময় আদায় হইয়া থাকে।

ব্যারিং পত্রাদির মাস্থল ফেরত পত্রের গ্রাহককে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার উদ্দেশে যদি কেহ ঐ পত্র লেখে এমন প্রমাণ হয়, তবে তাহার মাস্থল ফেরত পাওয়া যায়।

নালিশ।—পোষ্ট আপিশের কোন ক্রুটীসম্বন্ধে নালিশ করিতে হইলে "পোষ্টাপিশের বিরুদ্ধে নালিশ" এই কয়টী কথা লিখিয়া চিঠির উপর প্রেরকের পুরা নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিলে তাহার মাস্থল দিতে হয় না। এরূপ নালিশ পোষ্টমাষ্টার জেনা-রেলের নিকট পাঠাইতে হয়।

কাহারও অপেক্ষায় ডাকঘরে পত্র জমা রাখিবার বিষয়।—পত্রের উপর "পোষ্টাপিশে থাকিবে, গ্রাহক ডাকঘরে আসিয়া লইয়া যাইবে" এইরূপ লিখিয়া ডাকে পাঠাইলে সেই লোকের অপেক্ষায় ৩ সপ্তাহ কাল সেই পত্র যে ডাকঘরে পাঠান যায় সেই খানে থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে না লইলে লেখকের নিকট ফেরত পাঠান হয়।

ফেরত চিঠি কোন চিঠির মালিকের ঠিকানা না হইলে সেই চিঠি লেখকের নিকট ফেরৎ যায়, তাহার জন্য লেখককে মাস্থল দিতে হয় না। আর যদি মালিক চিঠি পাইয়াও না লন, আর সেই চিঠি যদি ব্যারিং হয়, তবে তাহার মাস্থল দিতে হয়। চিঠির উপরে যদি প্রেরকের ঠিকানা লেখা থাকে, তবে ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা সেই চিঠি না খুলিয়া ফেরত পাঠান, আর যদি তাহা না থাকে তবে প্রেরকের ঠিকানা জানিবার জন্য সেই চিঠি খুলিয়া ফেরত দেন।

বুক প্যাকেট ও সংবাদ পত্রাদি।—সকল রকম কাগজ ও বহী

ডাকে পাঠান যায়। উপরে "প্যাকেট পোষ্ট" এই কয়টী কথা লিখিয়া উভয় দিক খোলা রাখিয়া বন্ধ করিতে হয়। বুক প্যাকেট ২ ফিট লম্বা, ১ ফুট চৌড়া এবং এক ফুট পুরু হওয়া চাই, উহার অধিক বড় হইলে ডাকে যায় না। মাসুল, প্রতি আধ তোলায় ৴১০ আনা। ব্যারিং দিলে তাহার দ্বিগুণ মাসুল দিতে হয়। বিলাত পাঠাইতে হইলে প্রতি ৫৲ তোলায় ৴১০ আনা দিতে হয়।

প্যাটারণ পোষ্ট বা নমুনার ডাক।—এই ডাকে সকল প্রকার জিনিষের নমুনা পাঠান যায়। সকল ব্যবস্থাই পুস্তকের ডাকের মত, কেবল ভূষীমাল পাঠাইতে হইলে কৌটার মধ্যে এরূপভাবে মাল পুরিয়া দিতে হয় যে, মনে করিলেই যেন খুলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এমন কোন জিনিষ পাঠাইতে হয় যে, বাতাস লাগিলেই খারাপ হইয়া যায়, তবে তাহা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া কি জিনিষ পাঠান হইতেছে তাহার উপর লিখিয়া প্রেরকের পুরা নাম ধাম লিখিয়া দিতে হয়। ৪০ তোলার অধিক জিনিষ নমুনার ডাকে পাঠান যায় না। বলা বাহুল্য যে, প্যাকেটের উপর "প্যাটারণ পোষ্ট" এই কথা লিখিয়া দিতে হয়।

পার্শেল বা বাঙ্গী ডাক।—পার্শেল ২৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের হইলে ডাকে যাইতে পারে। কাপড় বা মোমজামায় উত্তমরূপে মুড়িয়া সেলাই করিয়া বন্ধ করিতে হয়। মাসুলের নিয়ম ২০৲ তোলার কম ওজনের হইলে।০ আনা, ৪০৲ তোলা পর্য্যন্ত ॥০ আনা, তদূর্দ্ধ প্রতি ৪০৲ তোলায়।০ আনা দিতে হয়। পার্শেলের মাসুল অগ্রিম দিলেও যত পশ্চাৎ দিলেও তত। অন্যান্য জিনিষের ন্যায় ব্যারিং হইলে দ্বিগুণ দিতে হয় না। অগ্রিম

দিলে নগদ দিতে হয়, টীকিট দিলে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে।

রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবার নিয়ম।—কোন প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহা রেজিষ্ট্রী করা কর্ত্তব্য। রেজিষ্ট্রী করিলে পত্রাদি নষ্ট হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা। চিঠি, পোষ্ট কার্ড ও বুক প্যাকেট সকলই রেজিষ্ট্রী করা যাইতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত মাসুলের উপর কেবল রেজিষ্ট্রী ফিঃ ৵০ আনা মাত্র লাগে। কেবল পার্শেল রেজিষ্ট্রী করা যায় না। কারণ রেজিষ্ট্রী করিয়া কিছু পাঠাইলে তাহার জন্য ডাকঘর হইতে এক খানি রসীদ পাওয়া যায়, কিন্তু পার্শেল মাত্রেই রসীদ পাওয়া গিয়া থাকে।

রেজিষ্ট্রী পত্র বিলি করিবার সময় গ্রাহকের নিকট রসীদ লওয়া হয়। সেই রসীদ পোষ্ট আপিশে থাকে, আর যদি প্রেরক রসীদ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ⁄০ আনার টীকিট অতিরিক্ত দিয়া "রসীদ প্রাপ্য" (acknowledgment due) লিখিয়া দিলে গ্রাহকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি রসীদ পাওয়া যায়। নোট, টীকিট প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য ডাকে পাঠাইতে হইলে রেজিষ্ট্রী করিয়া পাঠান উচিত। রেজিষ্ট্রী করা পত্রাদি ও পার্শেলে গালা দিয়া শীল মোহর করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ভ্যালুপেয়েবল।—পোষ্টকার্ড ছাড়া, সকল প্রকার চিঠি, প্যাকেট ও পার্শেল ডাকে পাঠাইয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যের মূল্য আদায় করিবার জন্য পোষ্ট আপিশের উপর ভার দেওয়া যাইতে পারে। ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে কিছু পাঠাইতে হইলে তাহার উপরে "ভ্যালুপেয়েবল" এই কথাটী লিখিয়া, ডাকঘর

হইতে, তজ্জন্য যে একখানি ফরম বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, তাহাতে আপনার ও গ্রাহকের নাম ধাম এবং কত আদায় হইবে বিস্তারিত লিখিয়া দিতে হয়। আদায় করিবার উপযুক্ত ১০৲ টাকা বা তাহার কম হইলে ৵০ আনা, ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ।০ আনা, ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত ॥০ আনা, এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক ২৫৲ টাকায় ।০ আনা অতিরিক্ত যোগ করিয়া দিতে হয়, কারণ ডাকঘর টাকাদি আদায় করিয়া পাঠাইবার জন্য ঐরূপ ফিঃ লইয়া থাকেন। ভ্যালুপেয়েবল বিনা রেজিষ্ট্রীতেও যাইতে পারে। কেবল রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে পার্শেল ব্যতীত সকল প্রকার ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টেই উপযুক্ত মাসুলের উপর ৵০ আনা রেজিষ্ট্রী ফিঃ অতিরিক্ত লাগে। ইহাতে ৬০০৲ টাকার অতিরিক্ত মূল্যের জিনিষ পাঠান যায় না।

ইন্‌সিওর বা বিমা।—চিঠি পার্শেল ইত্যাদি ইনসিওর করা যায়। তবে কথা এই যে, উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া তাহাতে সীল মোহর করিতে হইবে। বিমা করিবার সময় কত টাকার দ্রব্য পাঠান হইতেছে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে।

বিমা করিলে যদি প্রেরিত দ্রব্য খোয়া যায়, তবে পাঠাইবার ৩ মাস মধ্যে দরখাস্ত করিলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। এইরূপে নগদ টাকা, নোট, সোণা রূপার গহণা, বহুমূল্য প্রস্তরাদি পাঠাইবার মাসুল ৫০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যের উপর ৵০ আনা, একশত টাকা মূল্যের দ্রব্যের উপর ।০ আনা এবং তদূর্দ্ধ প্রত্যেক এক শত টাকায় ।০ আনা দিতে হয়, ইহা ব্যতীত চিঠির মাসুল এবং রেজিষ্ট্রীখরচও দেওয়া চাই।

মনিঅর্ডর বা ডাকঘরের হুণ্ডী।—কাহাকেও টাকা পাঠাইতে হইলে ডাকঘরে তাহা জমা দিলে পোষ্টাপিশ হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে টাকা পাঠাইবার জন্য সকল ডাকঘরে বিনা খরচে এক রকম ছাপান ফরম পাওয়া যায়, তাহাতে প্রেরক ও মালিকের নাম ধাম ও কত টাকা পাঠান হইতেছে ইত্যাদি লিখিয়া দাখিল করিলেই ঐ টাকার এক খানি রসীদ পাওয়া যায়। তাহার পর ডাকঘর হইতে ঐ টাকা যাহার নামে পাঠান হয় তাহার স্বাক্ষরযুক্ত একখানি রসীদ বিনা খরচে আনাইয়া দেন। মণি-অর্ডারের জন্য ১০৲ টাকার অনধিকের জন্য ৵০ আনা। ১০৲ টাকার অধিক ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ।০ আনা, ২৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ॥০ আনা, তাহার পর প্রত্যেক ২৫৲ টাকায় ।০ আনা লাগে। এক খানা মণিঅর্ডরে ১৫০৲ টাকার অধিক পাঠান যায় না। মণিঅর্ডারের টাকা তিন মাস মধ্যে না লইলে বাজেআপ্ত হইয়া যায়। বিলাতে মণিঅর্ডার করিতে হইলে সেখানকার কত পাউণ্ড, সিলিং বা পেন্স পাঠাইতে হইবে কেবল মাত্র মণিঅর্ডর ফরমে লিখিয়া দিলে, এখানকার কত টাকা কত আনা দিতে হইবে তাহা পোষ্টমাষ্টার লিখিয়া দিবেন, তদনুসারে টাকা ও ফি দাখিল করিতে হইবে।

সেবিং ব্যাঙ্ক।—টাকা জমাইবার জন্য পোষ্টাপিশে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পল্লীগ্রামের প্রায় সকল পোষ্ট আপিশেই টাকা জমা রাখিবার পদ্ধতি আছে। ইহার জন্য কোন খরচ নাই। এককালে ।০ আনার ন্যূন জমা দেওয়া

যাইতে পারেনা। রবিবার ভিন্ন সকল বারেই টাকা দেওয়া যাইতে পারে। ইচ্ছা হইলে সপ্তাহের মধ্যে একবার আবশ্যক মত টাকা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ডাকঘরের সহিত এইরূপ হিসাব খুলিতে হইলে সর্ব্ব অগ্রে কিছু জমা দিতে হয়। জমা দিলে তাহার রসীদ পাওয়া যায় এবং ২।৩ দিন মধ্যে একখানি ছাপান খাতা পাওয়া যায়। তাহার পর যখন যাহা সংস্থান হইবে, বহী খানির সহিত ডাকঘরে গিয়া জমা দিলেই সেই বহীতে পোষ্টমাষ্টারের স্বাক্ষরযুক্ত প্রাপ্তিস্বীকার পাইবে।

ঐ টাকার সুদ বৎসরে শতকরা ৩৷৹ আনা পাওয়া গিয়া থাকে। অসঞ্চয়ী লোকদিগের সঞ্চয় করিবার একটী প্রধান উপায়। কিছু কিছু করিয়া জমা দিতে গায়ে লাগে না, অথচ অল্প দিনেই বেশ দশ টাকা জমিয়া যায়, তাহাতে একটা মহৎ কাজ সাধন করা যাইতে পারে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানী আদালত।

ফৌজদারী, দেওয়ানী আইন কানুন অনেক। তাহাদের সমুদয় অংশ বিস্তৃত রূপে লিখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্থান সংকুলান হওয়া দুরূহ, এজন্য যেগুলি গৃহস্থ-মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহাই হেমচন্দ্রের পিতা আপন স্মারকলিপিতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, আমরাও তদনুযায়ী

এই গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

দেওয়ানী আদালতে কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে অগ্রে খরচের সংস্থান করিতে হয়। এই আদালতে অর্থ ব্যতীত কোন মোকর্দ্দমা চালান যায় না। সত্য বটে অসঙ্গতিপন্ন লোকদিগের খরচ হইতে অব্যাহতি দিবার পক্ষে আদালত বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে অনেক অনুষ্ঠান, নানান্ ঝঞ্ঝাট আছে; তবে যাহারা নিতান্ত অসমর্থ তাহাদের উপায়ান্তর নাই, অগত্যা সেই সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যাহাতে খরচ আছে এমন কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তৎসম্বন্ধে অগ্রে বিবেচনা করিতে হয়। এজন্য আমরাও দেওয়ানী আদালতের খরচের বিষয় সর্ব্বাগ্রে পাঠকবার্গকে অবগত করাইতে ইচ্ছা করিয়া তৎসম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল স্থূল নিয়ম নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। অধুনা আদালতের খরচ সম্বন্ধে ১৮৭০ সালের ৭ আইন প্রবল আছে। তাহারই নিদেশানুসারে আদালতের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়।

১। বিবাদীয় টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ৫৲ টাকার অধিক না হইলে ।৵০ আনা।

২। ঐ টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ৫৲ টাকার অধিক লইলে, ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৫৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি ৫৲ টাকা কিম্বা তাহার ন্যূন অংশের জন্য ।৵০ আনা।

৩। ঐ টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ১০০৲ টাকার অধিক হইলে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি ১০৲ টাকা বা তাহর ন্যূনাংশের জন্য ৸০ আনা।

৪। ঐ টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে, ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।—১০০০৲ টাকার অধিক হইলে ৫০৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত ১০০০৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি একশতের বা তাহার ন্যূনাংশের জন্য ৫৲ টাকা।

৫। ঐ টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ৫০০০৲ টাকার অধিক হইলে ১০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি ২৫০৲ টাকা বা তাহার ন্যূনাংশের জন্য ১০৲ টাকা।

৬। টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে, ২০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ১০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি ৫০০৲ টাকা কিম্বা তাহার ন্যূনাংশের জন্য ১৫৲ টাকা।

৭। ঐ টাকা বা সম্পত্তির মূল্য ২০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে ৩০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত, ২০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি সহস্রের বা তাহার ন্যূনাংশের জন্য ২০৲ টাকা।

আদালতের নির্দ্দিষ্ট খরচ দিয়া মোকর্দ্দমা চালাইবার পক্ষে অসমর্থতা জানাইয়া (পপাররূপে) যদি জেলার আদালতে দরখাস্ত করিতে হয়, তবে তাহার জন্য ১৲ টাকা, এবং কমিশনর সাহেব বা হাইকোর্টে তদ্রূপ দরখাস্ত দিতে হইলে তাহাকে খরচ স্বরূপ ২৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

আদালতে ফ্রী পাইবার জন্য আবেদন পত্র বা তদ্রূপ মোকর্দ্দমার আপীল সংক্রান্ত দরখাস্ত যদি হাইকোর্টে বা কমিশনর সাহেবকে দিতে হয়, তবে ৫৲ টাকা ফি দিতে হয়।

সাক্ষী প্রতি সমন, ওয়ারেণ্ট, ইস্তাহার, মালক্রোকী পরওয়ানা ইত্যাদির জন্য ফৌজদারী আদালতে যেরূপ খরচ দিতে হয়, দেওয়ানী আদালতেও ঠিক সেইরূপ। এই সকল খরচ

সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল পরিবর্ত্তন বিষয়ক বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে নিয়মিত রূপে প্রচার করা হয়।

অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালত যে মোকর্দ্দমা করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত, প্রথমতঃ সেই আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা উচ্চ আদালতে কোন মতে একবারে নালিশ চলিতে পারে না।

যে স্থানে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার মোকর্দ্দমা করিতে হইলে, ঘটনাস্থল যে আদালতের অধীন সেই আদালতে নালিশ করিতে হইবে।

একই ঘটনা এবং একই সম্পত্তি লইয়া একাধিক ব্যক্তির সাহিত যদি স্বার্থ সম্বন্ধীয় তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া মোকর্দ্দমা করিতে হয়, তবে তাহাদের সকলকেই প্রতিবাদী জানিতে হইবে।

সেইরূপে একাধিক ব্যক্তি স্বার্থরক্ষার জন্য একযোগে অপর নামে নালিশ করিতে পারে।

একাধিক ব্যক্তি বাদী ও প্রতিবাদীরূপে কোন মোকর্দ্দমায় সংশ্লিষ্ট থাকিলে তাঁহারা সকলে উপস্থিত না হইয়া তাঁহাদের মধ্যে একজনকে মোকর্দ্দমার যবাব দেওয়া ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার জন্য ক্ষমতা দিতে পারেন। তাহার জন্য আদালতে আপনাদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন পত্র দাখিল করিতে হইবে।

যখন যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের নিষেধক বিধির বিরুদ্ধ না হইলে কোন পক্ষ আপনি কিম্বা স্বকীয় উকিল বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া মোকর্দ্দমা

চালাইতে পারিবেন। কিন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং যে সকল ব্যক্তিরা আদালতের সীমা বহির্ভূত স্থানে বাস করেন, তাঁহারাও আমমোক্তার বা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মোক্তারদ্বারা হাজির হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে পারিবেন।

যখন যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যায়, তৎকালে সেই বিষয় সংঘটিত কোন অংশের দাবী করিতে ভ্রম বা অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে আর সেই সম্বন্ধে মোকর্দ্দমা করিবেন না। এই সময়ে আর একটী বিবেচনা করিতে হইবে যে, তৎসম্বন্ধে যত প্রকার তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদের সকলগুলির কথাই দরখাস্তে লিখিতে হইবে, কেন না তদ্দ্বারা একবারে সকল বিষয় নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

হাইকোর্ট ভিন্ন সকল আদালতেই দেশের প্রচলিত ভাষায় আবেদন পত্র লিখিতে হইবে। ইংরেজী ভাষায় লিখিবার পক্ষেও কোন আপত্তি নাই কিন্তু প্রতিপক্ষ আপত্তি করিলে ঐরূপ অভিযোগ পত্রের অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে।

সাধারণতঃ আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হইবে।—

(ক) মোকর্দ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহার নাম।

(খ) বাদীর নাম, বর্ণনা এবং বাসস্থান।

(গ) প্রতিবাদীর নাম, বর্ণনা এবং বাসস্থান যতদূর জানা যাইতে পারে।

(ঘ) যে যে বিষয় লইয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে

হইবে তাহাদের স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং ঘটনার স্থান ও সময়।

(ঙ) বাদী যে উপকার লাভের দাবী করেন তদ্বিষয়ক প্রার্থনা।

(চ) বাদী আপন দাবী হইতে প্রতিবাদীর যে দাবী বাদ দেন, বা যে অংশ ত্যাগ করেন, তজ্জন্য যত টাকা বাদ দিলেন বা ত্যাগ করিলেন তাহার কথা।

বাদী টাকা পাইবার প্রার্থনা করিলে ঠিক কত টাকা পাই-বেন, বিষয় বিবেচনায় ইহা যতদূর জানাইতে পারা যায় আবে-দন পত্রে ততদূর লিখিতে হইবে।

ওয়াশিলাৎ পাইবার মোকর্দ্দমায় বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে হিসাব নিকাশ না হইয়া থাকিলে সেই হিসাব লইয়া বাদীর যত টাকা পাওনা দেখা যায়, তাহা পাইবার জন্য মোকর্দ্দমায়, যত টাকার প্রার্থনা হয়, আবেদন পত্রে তাহার ন্যূনাধিক রূপে লিখিলেই চলিবে।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়া নালিশ করিলে বিবাদীর বিষয়ে যে যথার্থই তাঁহার স্বার্থ আছে, আবেদন পত্রে তাঁহার এইমাত্র প্রকাশ করিতে হইবে না, কিন্তু তদ্বিষয়ক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক তাহা করিয়াছেন তাহাও লিখিতে হইবে।

বাদী ও তাঁহার উকীল থাকিলে উভয়েই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। তন্নিম্নে সাক্ষীগণের নাম ও তৎসম্বন্ধে সত্য-পাঠ লিখিতে হইবে।

আবেদন পত্রের পৃষ্ঠে মোকর্দ্দমা ঘটিত কোন দলিল থাকিলে

তাহার তালিকা লিখিয়া দিতে হইবে। আবেদন পত্র গ্রাহ্য হইলে আদালত প্রতিবাদীগণের নাম ও মোকর্দ্দমা ঘটিত এক-খানি সংক্ষেপ বর্ণনা পত্র দাখিল করিবার জন্য বাদীকে অনুমতি দিলে তিনি সাদা কাগজে তদ্রূপ পত্র একখানি লিখিয়া দাখিল করিবেন।

বাদীর অধিকারে দলিল না থাকিলে যাঁহার অধিকারে তাহা আছে, যতদূর জানিতে পারা যায় তাহা লিখিয়া দিতে হইবে।

ক্রয় বিক্রয়ের নিদর্শন পত্র মূলক মোকর্দ্দমা লইলে, ও সেই নিদর্শন পত্র হারাইয়া গেলে, যদি তাহা সপ্রমাণিত হয়, তবে আদালত তজ্জন্য বাদীকে যে নিষ্কৃতি পত্র দেন, সেই নিষ্কৃতি পত্র আবেদনের সহিত দাখিল করা যাইতে পারিবে।

যদি কোন দোকানের খাতা লইয়া কোন মোকর্দ্দমা উপ-স্থিত হয়, তবে ঐ খাতা আদালতে দাখিল করিবার সময় মোক-র্দ্দমা ঘটিত অংশের একটী নকল তাহার সহিত দিলে আসলের সহিত মিলাইয়া আদালত খাতার আসল অংশে দস্তখৎ করিয়া তাহা ফেরত দিবেন।

নালিশ উপস্থিত করিবার সময় যদি দলিলের তালিকা না দেওয়া হয় তবে তাহা প্রমাণমধ্যে গ্রাহ্য হয় না।

আদালতে আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইবামাত্র যদি প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া বাদীর দাবী স্বীকার করে, তবে আর তাহার নামে সমন বাহির হইবে না, নতুবা তাহার নামে সমন জারী এবং তৎসঙ্গে বাদীর দাখিলী সংক্ষিপ্ত বর্ণনাপত্রের অনুলিপি একখানি প্রদত্ত হইবে।

যে আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার সীমার বাহিরে বা দূরবর্ত্তী স্থানে কাহারও নামে সমন বা নোটীশ জারী করিতে হইলে তাহার ন্যায্য ডাকমাশুল ও রেজিষ্ট্রী করিবার খরচ আদালতে জমা দিতে হয়।

প্রতিবাদীর প্রতি সমনজারী খরচ না দেওয়ার জন্য যদি তাহার প্রতি সমনজারী করা না হয়, ও তজ্জন্য সে ধার্য্য দিনে উপস্থিত না হয়, তবে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইতে পারিবে। ধার্য্য দিনে উভয় পক্ষ হাজির না থাকিলেও মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপে মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইলে যদি বাদী সমনের খরচ দিবার বা ধার্য্যদিনে অনুপস্থিত থাকিবার বিশেষ কারণ দর্শাইবার ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি করে তবে মোকর্দ্দমা পুনর্ব্বিচারের জন্য আদালত গ্রাহ্য হইবে।

নিয়মিতরূপে সমনজারী হইলেও যদি প্রতিবাদী উপস্থিত না হয়, তবে আদালত সমনজারীর বিলক্ষণ প্রমাণ লইয়া এক তরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। আর সমনজারী না হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হইলে প্রতিবাদীর নামে দ্বিতীয়বার সমন জারী হইতে পারিবে। সমনজারী হইলেও যদি জানিতে পারা যায় যে, যে সময় সমনজারী হইয়াছিল সে সময়মধ্যে প্রতিবাদীর উপস্থিত হইবার উপযুক্ত অবকাশ ছিল না, তাহা হইলেও আদালত দ্বিতীয়বার নোটীশজারী করিবার আদেশ দিতে পারেন। যদি বাদীর ত্রুটীবশতঃ সমনজারীতে বিলম্ব হইয়া থাকে, তবে অন্য দিন ধার্য্যের জন্য যে খরচ লাগিবে তাহা বাদীকেই দিতে হইবে।

প্রতিবাদর অনুপস্থিতিতে যদি একতরফা ডিক্রী হয় এবং আদালতের বিশ্বাসজনক প্রমাণ দেখাইয়া প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইবারপক্ষে তাহার বিশেষ বাধা ছিল বা নিয়মিতরূপে সমনজারী হয় নাই, তবে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিয়া আদালত সেই মোকর্দ্দমা চালাইবার আদেশ দিবেন।

আইন বা বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে অনৈক্য না হইলে মোকর্দ্দমার প্রথম শ্রবণ কালেই আদালত একবারেই চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

সাক্ষীকে আদালতে হাজির করিবার জন্য সমনাদির খরচ বাদে তাহার যাতায়াত ও আহারাদির খরচ সাধারণতঃ প্রত্যেক দিনের জন্য ।৶০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। বহুদূর দেশাগত ও সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর যাতায়াতের ও আহারাদির খরচসম্বন্ধে আদালত বিবেচনামতে অনুমতি দিলে, যিনি সাক্ষী মানিয়াছেন তাঁহাকে দিতে হইবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করিয়া টাকা আদায়ের জন্য আদেশ দিতে বা সাক্ষীর জবানবন্দী না লইয়া তাঁহাকে বিদায় দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। সাক্ষীর নামে সমন হইলে যদি সে তাহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করে, তবে যে ব্যক্তি সমনজারী করে তাহাকে হলফ দিয়া এজেহার গ্রহণান্তে সাক্ষীর নামে ঘোষনাপত্র প্রচার করিয়া তাহার বাসগৃহে লটকাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতেও আদালতে উপস্থিত না হইলে উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশ হইয়া থাকে। কিন্তু

সে ব্যক্তি যদি উপস্থিত হইয়া এমন প্রমাণ দেয় যে, সে সমন-জারী বা ঘোষণা প্রচারের কোন কথা অবগত ছিলনা, তবে আদালত তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

মোকর্দ্দমার খরচসম্বন্ধে আদালত যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন সেইরূপ আদেশ দিতে পারেন।

মোকর্দ্দমায় বাদী আপন স্বার্থসাধন ও জয়লাভ করিতে পারিলে আপন দাবী আদায় করিবার জন্য পুনরায় আদালতের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন।

আদালত যে পক্ষকে খরচ পাইবার অনুমতি দিবেন, সেই খরচের উপর শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকার অধিক সুদ দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন না।

আদালতের অনুমতি পাইবার পর পরাজিত পক্ষ যদি আপনার দেয় না দেন, তবে যিনি জয়লাভ করেন তিনি আপনার ডিক্রীজারী করিবেন এবং প্রতিপক্ষের সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম দ্বারা আপনার প্রাপ্য আদায় করিবেন। কিন্তু আপীলযোগ্য মোকর্দ্দমায় আপীলের কাল অতীত না হইলে ডিক্রীজারী হইবে না।

ডিক্রীজারীর জন্য যে প্রার্থণা করা যায় তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিত করিতে হইবে।

(ক) মোকর্দ্দমার নম্বর।

(খ) উভয় পক্ষের নাম।

(গ) ডিক্রীর তারিখ।

(ঘ) ডিক্রীর উপর আপীল করা গেল কি না।

(ঙ) ডিক্রী হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীর

বিষয়ের কোনরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না, ও যেরূপ নিষ্পত্তি হইল তাহার কথা।

(চ) ইতিপূর্ব্বে ঐ ডিক্রীজারী করা হইয়াছে কি না এবং কি কি প্রার্থনা হইয়াছে ও তাহার কি কি ফল হইয়াছে।

(ছ) ডিক্রীমতে ঋণের বা ক্ষতিপূরণের টাকা ও সুদের আজ্ঞা হইয়া থাকিলে যত টাকা সুদ বা তদ্বারা অন্য কোন আজ্ঞা হইলে তাহা।

(জ) খরচার আজ্ঞা হইলে তাহা কত।

(ঝ) যে ব্যক্তির উপর ডিক্রীজারী হইবে তাহার নাম।

(ঞ) আদালতের নিকট যেরূপ সাহায্যের প্রার্থনা করা হয়, অর্থাৎ যে সম্পত্তির স্পষ্ট ডিক্রী হইল, সেই সম্পত্তি দেওয়ান, কিম্বা প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারা-বদ্ধ করা, অথবা ডিক্রী অনুযায়ী অন্য কোন প্রকারের প্রার্থনা।

খাতকের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে ডিক্রীদার প্রার্থনাপত্রের সহিত ঐ সম্পত্তির সঙ্গতরূপে যথার্থ বর্ণনাযুক্ত একটী তালিকা সংযোগ করিয়া দিবেন। যদি কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়, তবে তাহার এরূপ বর্ণনা দিতে হইবে যেন সহজে তাহা চিনিয়া লওয়া যায় এবং ঐ সম্পত্তি যদি খাতকের সমস্ত না হইয়া আংশিক হয়, তবে তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে।

ডিক্রীজারীর প্রার্থনাপত্র উপরোক্ত প্রকারে করা হইয়াছে কি না দেখিয়া আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। দরখাস্ত যথা-বিধি না হইলে সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। দরখাস্ত গ্রাহ্য

হইলে ডিক্রীদারের প্রার্থনানুযায়ী আদালত ডিক্রীজারীর আদেশ দিবেন।

কেবল টাকার ডিক্রী হইলে ও এক সহস্র টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে ও ডিক্রীমত খাতক আদালতের সীমার মধ্যে থাকিলে, আদালত ঐ ডিক্রী করিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে খাতককেই ধরিবার কিম্বা সেই সীমার অন্তর্গত তাহার অস্থাবর সম্পতি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়া অগৌনেই ডিক্রীজারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেওয়া হয় তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে।—

(ক) ডিক্রীজারী করা যে আদালদের কর্ত্তব্য সেই আদালতে, কিম্বা

(খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী করেন তিনি অন্য যেরূপে আজ্ঞা করেন সেইরূপে।

যে আদালত ডিক্রী দেন তাঁহার অনুমতি না হইলেও উক্ত আদালত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান না করিলে ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে সময় দিবার যে প্রত্যেক চুক্তি করা যায় তাহা অসিদ্ধ হইবে।

ডিক্রী অনুসারে যত টাকা পাওনা হয়, ঐ ডিক্রীমতে ঋণ পরিশোধার্থে স্পষ্টরূপে বা তদ্বিপরীতে তদতিরিক্ত টাকা দিবার প্রত্যেক চুক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি না লইয়া করা গেলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন টাকা দেওয়া গেলে,

ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে, এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে, ডিক্রীমত খাতক তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

ডিক্রীমতে দেয় কোন টাকা আদালতের বাহিরে দেওয়া গেলে কিম্বা ডিক্রীদারের হৃদ্বোধমতে ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য প্রকারে মিটাইয়া দিলে, ঐ ডিক্রীজারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য, ডিক্রীদার সেই আদালতে ঐ টাকা পাইবার সার্টিফিকেট দিবেন। খাতকও আপনার দেনা মিটাইয়া দেওয়ার সংবাদ আদালতে দিয়া ডিক্রীদারের প্রতি এই মর্ম্মের নোটীশ জারী হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারী ক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম হইতে পারিবে, অর্থাৎ ভূমি, পাকা বা কাঁচা ঘর, মাল, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, নোট, চেক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডী, প্রমিসরী নোট, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী; খত কিম্বা টাকার অন্য প্রতিভূ পত্র, ঋণ, কোন রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, বা প্রকাশ্য অন্য কোম্পানীর অথবা কোন সমাজের বা সংযুক্ত ধনের সমুদায় বা অংশ। নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি ভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিম্বা যে সম্পত্তিতে অথবা যাহার উপস্বত্বের উপর খাতকের বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, সেই সম্পত্তি।

নিম্নলিখিত দ্রব্য উক্তরূপে ক্রোক বা নিলাম হইতে পারিবে না।—

(ক) খাতকের ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি।

(খ) কারিকরদিগের অস্ত্র, কৃষিকার্য্যসংক্রান্ত যন্ত্র ও ডিক্রীমত খাতকের কৃষাণরূপে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আদালতের বিবেচনায় তাঁহার যে গবাদির আবশ্যক তাহা।

(গ) কৃষকদের অধিকারে তাঁহাদের যে গৃহাদি থাকে সেই গৃহাদির সরঞ্জাম।

(ঘ) খাতা, বহী।

(ঙ) ক্ষতিপূরণ পাইবার নালিশের স্বত্ব মাত্র।

(চ) নিজে ভোগ করিবার স্বত্ব।

(ছ) সৈনিক ও সিবিল সার্বিশের যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনসান পান তাঁহাদের সেই বৃত্তি।

(জ) রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ২০৲ টাকার কম হইলে তাহার সমুদায়, ও ২০৲ টাকার অধিক হইলে তাহার অর্দ্ধেক বেতন।

(ঝ) সিপাহীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন যে ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে তাঁহাদের বেতন ও উপরি টাকা।

(ঞ) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন।

(ট) অন্যের মরণান্তে জীবিতকালে উত্তরাধিকারিত্বের ভাবী আশা কিম্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি সম্ভাবিত অন্য প্রকার স্বত্ব বা স্বার্থ।

(ঠ) উত্তরকালীন ভরণপোষণের অধিকার।

ডিক্রীজারী ক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, তাহা ক্রোক হওয়ার যোগ্য নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া, কিম্বা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আপত্তি উপস্থিত

করা হইলে, আদালত সেই দাওয়ার বা আপত্তির অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

ক্রোক করা যে সম্পত্তির উপর ঐরূপ দাওয়া বা আপত্তি হয়, সেই আপত্তির মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোক করা সম্পত্তি নীলাম হইবে না।

আদালতের কোন এক জন কার্য্যকারকদ্বারা কিম্বা আদালতের নিযুক্ত মতে অন্য ব্যক্তি দ্বারা ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

এইরূপে সম্পত্তি নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে আদালতের চলিত ভাষায় ঐ নীলামের কথা ঘোষণা করা যাইবে। যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম হইবে তাহা স্পষ্টরূপে ঘোষণা পত্রমধ্যে উল্লেখ করিতে হইবে। ঘোষণা পত্র লিখিত নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি লিখিত থাকা উচিত :—

(ক) যে সম্পত্তি নীলাম হইবে।

(খ) ঐ সম্পত্তি যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার যোগ্য সম্পত্তি বা তাহার কিয়দংশ হয়, তবে তাহার কত রাজস্ব দেয়।

(গ) ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায় আছে কিনা।

(ঘ) যত টাকা আদায়ের জন্য নিলামের আজ্ঞা হয়।

(ঙ) সম্পত্তির ভাব ও মূল্য বুঝিয়া লইবার জন্য আদালতের বিবেচনায় ক্রেতার আর যে যে কথা জানা প্রয়োজন হয়।

সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা যায়, উপরোক্ত প্রকারে সেই স্থানে ঘোষণা করিতে হইবে, ও তাহার এক খণ্ড অনুলিপি আদালত গৃহে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। আদালত আদেশ করিলে স্থানীয় কোন সংবাদ পত্রেও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ক্রোক করা স্থাবর সম্পত্তি ঘোষণা পত্র প্রচারের তারিখ হইতে অন্যূন ৩০ দিন ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যূন ১৫ দিন গত না হইলে বিক্রয় করা হইবে না। তবে যদি এমন কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায় যে, নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, তাহা সত্বর নীলাম করা যাইবে।

ঐরূপ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলামে ডাকিয়া যদি কেহ তাহার মূল্য দিতে না পারে, তবে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার বিক্রয় করা হইবে। পুনর্ব্বার বিক্রয়ের মূল্য যদি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, তবে যে ব্যক্তি অগ্রে ডাকিয়া ছিল তাহার নিকট বাকী টাকা আদায় হইবে।

আদালতের অনুমতি না পাইলে ডিক্রীদার ক্রোক করা সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন না। যদি কেহ আদালতের অনুমতি না লইয়া ক্রয় করেন, তবে খাতকের বা অন্য ব্যক্তি এইরূপ ক্রয় বিক্রয়ে যাহার স্বার্থ আছে, তাহার প্রার্থনা মতে বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে। ডিক্রীর অতিরিক্ত টাকায় কোন সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইলে, ডিক্রীদার উদ্বৃত টাকার দাবী করিতে পারিবে না।

এইরূপ নীলামে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে, আদালত ক্রেতাকে তাহার জন্য এক খানি সার্টিফিকেট দিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে খাতককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা যাইতে পারে। খাতককে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে উপস্থিত করিলে, আদালত তাঁহার কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন। সূর্য্যাস্তের পর বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এরূপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিতে পারা যায় না। কিন্তু খাতক যদি বাড়ীতে থাকে, গ্রেপ্তারকারী কর্ম্মচারী নিয়মমত সেই

বাড়ীতে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে তাহার গৃহের দ্বার বন্ধনমুক্ত করিয়া খুলিতে পারিবেন।

যে ডিক্রীমতে খাতককে গ্রেপ্তার করা যায়, যদি ঐ ডিক্রী টাকার জন্য হয়, তবে খাতক গ্রেপ্তার হইবা মাত্র ডিক্রীর টাকা মায় গ্রেপ্তারী খরচ দিলে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবে।

ডিক্রীমত খাতককে গ্রেপ্তার করিবার প্রত্যেক পরওয়ানায় এই আজ্ঞা থাকিবে যে, খাতক ডিক্রীমত টাকা না দিলে তাঁহাকে সুবিধামত সত্বর আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।

ডিক্রীমত খাতকের বংশ জাতি ও পদ বিবেচনায় মাসে তাঁহাকে যে হারে খোরাকী দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তালিকা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে খাতকের পদমর্য্যদা ও অবস্থা বিবেচনায় তাঁহার মাসিক খরচ অবধারিত করিয়া দিবেন।

ঐ খোরাকীর টাকা ডিক্রীদারকে মাসে মাসে অগ্রিম দিতে হইবে, কিন্তু উহা মোকর্দ্দমার খরচস্বরূপ গণ্য হইতে পারিবে। এরূপ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই টাকা আদায়ের জন্য পুনরায় তাহাকে ধৃত বা কারাবদ্ধ করা যাইতে পারে না। খাতক কারাবদ্ধ হইবার পর নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারে তাহার মুক্তিলাভ হইতে পারে।—

(ক) কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টে যে টাকা লিখিত থাকে, জেলের অধ্যক্ষকে সেই টাকা দিলে।

(খ) অন্য প্রকারে ডিক্রীর সমস্ত টাকা পরিশোধ হইলে।

(গ) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা যায়, তাহার প্রার্থনা মতে।

(ঘ) ডিক্রীদার আজ্ঞা মত খোরাকীর টাকা দিতে ত্রুটি করিলে।

(ঙ) বিশেষ কারণে খাতককে ঋণ পরিশোধে অক্ষম জানিতে পারিলে।

(চ) কারাবদ্ধ থাকার নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে, ডিক্রীজারী ক্রমে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ থাকিতে পারে না। পঞ্চাশ টাকার কমের ডিক্রী হইলে ছয় সপ্তাহের অধিক কাল কারাবদ্ধ থাকিবে না।

ডিক্রীজারী ক্রমে খাতককে ধৃত বা কারাবদ্ধ করা গেলে, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে, তিনি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষমতা জানাইয়া নিম্নোক্ত প্রকারে আবেদন করিতে পারেন।—

(ক) ঐ ব্যক্তি ধৃত বা কারাবদ্ধ কিনা, তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে কিনা, যদি কারাবদ্ধ থাকেন তবে কোন্ স্থানে আছেন।

(খ) তাঁহার যত ও যে যে প্রকারের সম্পত্তি আছে তাহার বিশেষ কথা ও টাকা ভিন্ন তদ্রূপ কোন সম্পত্তির মূল্য।

(গ) যে যে স্থানে ঐ সম্পত্তি পাওয়া যাইবে।

(ঘ) তাঁহার সেই সম্পত্তি আদালতের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা।

(ঙ) তাহার উপর যে সকল টাকার দাওয়া থাকে, তাহা সর্ব্ব সুদ্ধ কত টাকা।

(চ) তাঁহার মহাজনদের নাম ও বাসস্থান, যতদূর জানা যায়।

এই দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিয়া দিতে হইবে। আদালত দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া মহাজনদিগকে নোটীশ দিবেন এবং তাঁহাদের কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহা শ্রবণ করিবেন। তাহার পর নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয়ের বিচার করিয়া যদি তাঁহার এমন বোধ হয় যে, খাতক বাস্তবিকই ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম, তবে আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহার সম্পত্তির রিশিভর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

উভয় পক্ষ প্রার্থনা করিলে মোকর্দ্দমা শালিশ দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারিবে। উভয় পক্ষ হইতে আবেদন করা হইলে কোন্ কোন্ বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া শালিশীদিগের নিকট পাঠাইবেন।

উভয় পক্ষ একমতে যে যে ব্যক্তিকে মনোনীত করেন তাঁহাদিগকেই শালিশ নিযুক্ত করা যাইবে। নিম্নোক্তস্থলে আদালত শালিশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।—

শালিশব্যক্তিগণকে উভয় পক্ষ মনোনীত না করিলে, মনোনীত ব্যক্তিগণ শালিশের কর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকার করিলে, অথবা উভয় পক্ষই যদি প্রার্থনা করেন যে আদালত শালিশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

ক্রীড়া অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তাসখেলা।

এক এক জোড়া তাসে চারি প্রকারে চিহ্নিত কাগজ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চারি প্রকারের চিহ্নকে এক একটী রং কহে।

হরতন।—পান পত্রের ন্যায় লালবর্ণ চিহ্ন গুলিকে হরতন রং কহে।

ইস্কাবন।—ঐরূপ পান পত্রের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ চিহ্ন গুলিকে ইস্কাবন্ রং কহে।

রুইতন।—লাল রংঙ্গের চতুষ্কোণ বিশিষ্ট চিহ্ন গুলিকে রুইতন রং কহে।

চিড়িতন।—কৃষ্ণ বর্ণের ত্রিপত্রবৎ চিহ্ন গুলিকে চিড়িতন কহে।

চারি রঙ্গের ১৩ খানি করিয়া ৫৪ খানি তাস থাকে।

এক রঙ্গের দুইটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "দুরী" এক রঙ্গের সেই রূপ তিনটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "তিরী," চারিটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "চৌকা," পাঁচটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে

"পঞ্জা," ছয়টী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "ছক্কা," সাতটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "সাতা," আটটী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "আটা", নয়টী চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "নহলা", দশটি চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "দহলা", দণ্ডায়মান চিত্র গুলিকে "গোলাম," স্ত্রীচিত্র গুলিকে "বিবি," অবশিষ্ট পুরুষের উপবিষ্ট চিত্র গুলিকে "সাহেব" এবং একটী কেবল মাত্র রঙ্গের একটী মাত্র চিহ্ন বিশিষ্ট কাগজকে "টেক্কা" বলে। চারিটী রঙ্গেই 'দুরী' হইতে 'টেক্কা' পর্য্যন্ত কাগজগুলি যথাক্রমে একটী হইতে অপরটী অধিক ক্ষমতা বিশিষ্ট বা বড় জ্ঞান করিতে হইবে। যথা—"দুরী" অপেক্ষা "তিরী" বড়, "গোলাম" অপেক্ষা "বিবি" বড়, "বিবি" অপেক্ষা সাহেব বড়, এবং সাহেব অপেক্ষা "টেক্কা" বড়। এখন দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক রঙ্গের ১৩খানি কাগজের মধ্যে টেক্কা সকল অপেক্ষা বড় এবং "দুরী" সর্ব্বাপেক্ষা ছোট।

আমাদের দেশে তাসের গ্রাবু খেলাই সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ। এজন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে গ্রাবুখেলার বিষয়ে কিছু বলিয়া তাহার পর অন্যান্য প্রকার খেলা সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে বলিব।

গ্রাবুখেলায় প্রত্যেক রঙ্গেরই "দুরী" হইতে "ছক্কা' পর্য্যন্ত ৫ খানি করিয়া কাগজকে পরিত্যাগ করিয়া ৩২ খানি কাগজ লইয়া খেলিতে হয়। আর প্রত্যেকে রঙ্গের ৫ খানি করিয়া যে কুড়ি খানি কাগজ রাখিতে হয়, সে গুলি উভয় পক্ষের জয় পরাজয় জানাইবার জন্য দুই পক্ষের আপনাপন দক্ষিণ দিকে থাকে। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

এখন খেলা সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। চারি জনে চারি দিকে দুইজন পরস্পরের সম্মুখে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বসিতে হইবে। পরস্পর সম্মুখস্থ দুইজন ব্যক্তিকে 'এক সম্প্রদায় বলিয়া জানিতে হইবে। দুই সম্প্রদায়স্থ যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বত্রিশ খানি কাগজ লইয়া অপর পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিবেন "আপনাদের লাল কি কাল রং" তাহার পর তিনি যাহাই বলুন, তাস গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে (কাটাইতে) বলিবেন। যদি কাটান তাস খানি তাঁহার বলা মত লাল বা কাল হয় তবে তাঁহারা তাস দিবেন, নতুবা তদ্বি-পরীত পক্ষ দিবেন।

এইরূপে তাস দিবার অধিকার লাভ করিয়া পুনরায় অপর পক্ষের ও আপন দক্ষিণদিকস্থ ব্যক্তিকে কাগজ কাটাইতে দিবেন। তিনি যে রং কাটাইবেন, তাহাকে "তুরুপ বা রং" কহে। সেই বারের খেলা উঠা পর্য্যন্ত সকল তাসের উপর "রং" প্রাধান্য লাভ করিবে। গ্রাবু খেলায় রং বলিলে এইরূপে কাটান রং বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে তাস গুলির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য সম্বন্ধে যেমন বড় ছোট ভেদ করিয়া আসিয়াছি, কাটান রঙ্গে সেরূপে বড় ছোট ভেদ করা হইবে না,—রঙ্গের গোলাম সকল অপেক্ষা বড়, তাহার পর নহলা, তন্নিম্নে টেক্কা, তাহার নীচে সাহেব, তাহার নীচে বিবি, বিবির নীচে দশ, দশের নীচে আটা, আটার নীচে সাতা।

কাগজ দুইখণ্ড কাটাইয়া রং করা হইলে, নীচের খণ্ডটী লইয়া যিনি কাটাইলেন অগ্রে তাঁহাকে দুইখানি, তাহার পর

আপনার সহক্রীড়ককে (যাঁহার সহিত আপনি এক দলস্থ তাঁহাকে) দুইখানি, এইরূপ বামাবর্ত্তে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে আপনা পর্য্যন্ত দুই দুইখানি একবার লইয়া, সেই রূপে তিন তিন খানি করিয়া আর দুই বার কাগজ দিলেই আপনার হাতে তিন খানি কাগজ আসিয়া ফুরাইবে।

কাগজ বণ্টন হইলে এক এক রঙ্গের যত গুলি কাগজ পাওয়া গিয়াছে, সকল গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ গুছাইয়া দেখিতে হইবে এক রঙ্গের পর্য্যায়ক্রমে বড় তিন খানি কাগজ হাতে আসিয়াছে কিনা,—অর্থাৎ সাতা আটা নহলা, আটা নহলা দশ, নহলা দশ গোলাম, দশ গোলাম বিবি, গোলাম বিবি সাহেব, অথবা বিবি সাহেব টেক্কা একত্র হইয়াছে কিনা। যদি এরূপে একত্রিত হয়, তবে এইরূপ মিলনকে "বিস্তি" কহে, এবং প্রতিপক্ষকে শুনাইতে হইবে যে "বিস্তি" আছে। এই কথায় প্রতি পক্ষেরও যদি কেহ ঐরূপে "বিস্তি" ডাকেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, তাঁহার "বিস্তির" কোন কাগজ বড় অর্থাৎ কি বড় "বিস্তি।" একথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, সাতা আটা নহলায় যে বিস্তি হয়, তাহাকে নহলা বড়, এইরূপে দশ বড়, গোলাম বড়, বিবি বড়, সাহেব বড় ও টেক্কা বড় বিস্তি কহা যায়। দুই পক্ষের মধ্যে যাঁহার বিস্তি বড় তিনই বিস্তির যে উপকারিতা টুকুর কথা পশ্চাৎ লিখিত হইবে তাহা পাইবেন।

বিস্তির ন্যায় উপর্য্যুপরি চারি খানি উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট এক রঙ্গের কাগজ এক হাতে মিলিত হইলে সেই মিলনকে পঞ্চাশ বলে। পঞ্চাশ ও বিস্তির ন্যায় ছোট বড় আছে যথা,—সাতা,

আটা, নহলা, দশ—দশবড় পঞ্চাশ; আটা, নহলা, দশ, গোলাম—গোলাম গোলাম বড় পঞ্চাশ; নহলা, দলহা, গোলাম, বিবি—বিবি বড় পঞ্চাশ; দশ, গোলাম, বিবি, সাহেব—সাহেব বড় পঞ্চাশ এবং গোলাম, বিবি, সাহেব, টেক্কা—টেক্কা বড় পঞ্চাশ। এইরূপ পঞ্চাশের উপকারিতা পশ্চাৎ কথিত হইবে।

পঞ্চাশের ন্যায় সাতা, আটা, নহলা, দহলা ও গোলাম এইরূপ উপর্য্যুপরি ৫ খানি কাগজ ঐরূপ মিলিত হইলে "হন্দর" বা "শ" কহে। ঐরূপ "হন্দর" হইলে খেলা নিষিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত চারিটী গোলাম, চারিটী বিবি, চারিটী সাহেব এবং চারিটী টেক্কা একত্র মিলিত হইলেও "হন্দর" হয়, এরূপ হন্দরেও খেলা নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত প্রকারের পাঁচ খানি কাগজে হন্দর অপেক্ষা চারি খানি কাগজে যে "হন্দর" হয় তাহার সম্মান অধিক।

এতদ্ব্যতীত রঙ্গের সাহেব বিবি এক হাতে আসিলে তাহাকে "ইস্তক" বলে। ইস্তকের উপর রঙ্গের গোলাম বা টেক্কা মিলিত হইলে "ইস্তক বিন্তি" হয়। সাধারণ বা বদ রঙ্গের বিন্তি অপেক্ষা ইস্তক বিন্তির প্রাধান্য অধিক। সেই-রূপ বদ রঙ্গের পঞ্চাশ অপেক্ষা ইস্তক পঞ্চাশের সম্মান অধিক, এবং বদ রঙ্গের "হন্দর" অপেক্ষা ইস্তক শয়ের ক্ষমতা অধিক। "ইস্তক শ" অপেক্ষা চারি খানি কাগজের শয়ের সম্মান অধিক, কিন্তু সকল স্থানে সেরূপ প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না। যে স্থানে যেরূপ খেলা প্রচলিত আছে, সেই স্থানে সেই রূপেই খেলা হইয়া থাকে।

এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রঙ্গের বিন্তি পঞ্চাশ-

আদি মিলন হইবার সময় গোলাম নহলা টেক্কা ইত্যাদি তিন চারি খানি উপর্য্যুপরি বড় কাগজে হয় না। রঙ্গের বিন্তির সময় বদ রঙ্গের বিন্তির ন্যায় তিন খানি কাগজের মিলন হওয়া চাই। পঞ্চাশ ও হন্দরের বেলাও সেইরূপ।

হাতে বিন্তি পঞ্চাশ আসিলে খেলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই প্রতি পক্ষকে তাহা জানাইতে হইবে। "হন্দর" হইলে আর সে হাত খেলা হয় না, ইস্তক পঞ্চাশেও খেলা নিষিদ্ধ। যে পক্ষের হন্দর হইয়াছে সে বার সে পক্ষেরই জয়, তাঁহারা সেইরূপ জয়ের চিহ্নস্বরূপ একখানি কাগজ উপড় করিয়া আপনাদের দক্ষিণ পার্শে রাখিবেন।

যিনি কাগজ কাটান, তাঁহাকে অগ্রে খেলিতে হয়। তাহার পর যে ক্রম অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ হইতে বাম দিকের ব্যক্তিকে কাগজ বণ্টন হয়, প্রথমে সেইরূপে খেলা হয়, তাহার পর যিনি চারি জনের খেলা চারি খানি কাগজের মধ্যে বড় কাগজ দিবেন, তিনিই সেই কাগজ চারি খানি পাইবেন। এই রূপে প্রত্যেক বারের চারি চারি কাগজকে "পিট" কহে। একবার খেলার পর দ্বিতীয় বারে যিনি পিট পাইবেন তিনি অগ্রে খেলিবেন। যিনি অগ্রে একখানি কাগজ খেলিবেন, সে খানি যে রঙ্গ তাঁহার পর পর ব্যক্তিরা ও সেই সেই রঙ্গের কাগজ দিবেন, সেই কাগজ গুলির মধ্যে যাঁহার কাগজ বড় তিনিই সেই পিট পাইবেন।

যে রঙ্গের খেলা হয়, তাহা না দিয়া অন্য রঙ্গ দিলে তাহাকে "পাশ" দেওয়া বলে। যে রঙ্গের খেলা সে রঙ্গ না থাকিলেই কেবল পাশ দেওয়া চলে, তদ্ভিন্ন পাশ দিতে পারা যায় না।

কিন্তু যে রঙ্গের খেলা, সে রঙ্গ থাকুক বা নাই থাকুক সকল অবস্থাতেই ভুরুপ করা যাইতে পারে।

যিনি পাশ দেন তাঁহার পিট পাইবার কোন প্রত্যাশা থাকে না। এমন কি যে টেক্কা সকলের বড় তাও যদি পাশ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও পিট পাওয়া যায় না।

এইরূপে কাগজ বণ্টন হইতে সমস্ত কাগজ উক্ত রূপে খেলিয়া শেষ হইলে, সেই বারের জয় পরাজয় অবধারিত করিবার জন্য যে পিট পাওয়া যায়, তাহার কাগজ লইয়া গণনা করিতে হইবে। গণনা করিবার রীতি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রঙ্গের নহলা ভিন্ন সাতা, আটা, নহলা গুলি গণনার মধ্যে আইসেনা, কেবল রঙ্গের নহলায় ১৪ফোঁটা গণনা করা যায়। তদ্ভিন্ন সকল রঙ্গের দশে দশ, রঙ্গের গোলামে দশের দ্বিগুণ কুড়ি, তদ্ভিন্ন অপর রঙ্গের গোলামে এক ফোঁটা, সকল বিবি দুই ফোঁটা, সকল সাহেব তিন এবং সকল টেক্কা ১১ ফোঁটা গণনা হইয়া থাকে। এবং যে পক্ষ শেষ পিট পান তাঁহারা তজ্জন্য ৫ অধিক পাইয়া থাকেন, তাহাকে "হাতেরপাঁচ" বলা যায়। যে পক্ষ হাতের পাঁচ পান, পর হাত তাঁহাদেরই বণ্টনের অধিকার লাভ হয়।

এইরূপে গণনা করিয়া উভয় পক্ষকে দুই কুড়ি সাত দেখাইতেই হইবে। যদি কোন পক্ষের উক্ত সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তবে সেই পক্ষের পরাজয় অবধারিত হইবে এবং তাঁহাদের প্রতি পক্ষ জয়ের চিহ্নস্বরূপ এক খানি কাগজ হন্দরে যেরূপ করিয়া ধরিতে হয়, সেইরূপে উপড় করিয়া ধরিতে হইবে।

কিন্তু যদি কোন পক্ষের বিন্তি থাকে, তবে তাঁহাদের প্রতি-

পক্ষকে তিন কুড়ি সাত, ইস্তকবিন্তি থাকিলে চারি কুড়ি সাত এবং ইস্তক থাকিলে তিন কুড়ি দেখাইতে হয়। না দেখাইতে পারিলে তাঁহাদের পরাজয় এবং তজ্জন্য এক খানি কাগজ হারিবেন। যে পক্ষের পঞ্চাশ থাকে, সে পক্ষ খেলা চলিবার মধ্যে আপনার পিটের হিসাব রাখিয়া ৫০ ফোঁটা দেখাইতে পারিলেই তাঁহাদের জয় লাভ হয়, এবং সেই সময়েই খেলা বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু পঞ্চাশের খেলা করিবার জন্য যদি শেষ পিট পর্য্যন্ত খেলিতে হয়, তবে যাঁহাদের পঞ্চাশ থাকে তাঁহারা তিন কুড়ি দেখাইয়া কাগজ ধরিবেন। কোন্ কোন স্থানে শেষ পিটেও পঞ্চাশ ফোঁটা দেখাইয়া কাগজ ধরিবার রীতি আছে। এক পক্ষের এক হাতে যদি ইস্তক আর সেই পক্ষের অপর হাতে বদ রঙ্গের কিম্বা রঙ্গের বিন্তি থাকে, তবে প্রতিপক্ষকে ইস্তকবিন্তির জন্য ৪ কুড়ি ৭ দেখাইতে হইবে।

ইস্তকের ডাক বিন্তি পঞ্চাশ সকলের উপরেই চলে। এক পক্ষের যদি বদ রঙ্গের টেক্কা বড় বিন্তি থাকে, অপর পক্ষের সাহেব বড় ইস্তক বিন্তি বা শুধু ইস্তক থাকে, তবে যাঁহাদের বদ রঙ্গের টেক্কা বড় বিন্তি থাকে তাঁহাদিগকে ইস্তকের সম্মান জন্য তিন কুড়ি এবং অপর পক্ষকেও অর্থাৎ যাঁহাদের ইস্তক আছে তাঁহাদিগকেও বিন্তির সম্মান জন্য তিন কুড়ি সাত দেখাইতে হইবে। উভয় পক্ষেরই যদি খেলা থাকে, তবে খেলা ভাঙ্গিয়া আর কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইবে না।

পঞ্চাশের বেলায়ও ঐরূপ। যদি এক পক্ষের ইস্তক এবং অপর পক্ষের পঞ্চাশ থাকে, তবে যে পক্ষের পঞ্চাশ থাকে সে পক্ষ খেলায় যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় তিন কুড়ি দেখাইতে

পারিলেই কাগজ ধরিবেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খেলিয়াও যদি তিন কুড়ি সাত দেখাইতে না পারেন তবে সেই পক্ষ এক খানি কাজগ হারিবেন।

এক পক্ষের এক জনের হাতে বদ রঙ্গের পঞ্চাশ এবং সেই পক্ষের অপরের হাতে যদি ইস্তক থাকে তবে তাঁহারা খেলিবার মধ্যে ৩০ ফোঁটা দেখাইয়া, আর যদি শেষ পিট পর্য্যন্ত খেলিতে হয় তবে দুই কুড়ি সাত দেখাইয়া কাগজ ধরিতে পারিবেন। কোন পক্ষ পঞ্চাশ ডাকিয়া যদি কাবার করিতে না পারেন, তবে ২ কুড়ি ৭ দেখাইলে সমান খেলা হইবে, তাহা না হইলে তাহাদিগকে একখানি কাগজ হারিতে হইবে।

বিন্তি অপেক্ষা পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ অপেক্ষা হন্দরের ডাক বড় এ কথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

উপরোক্ত প্রকারে প্রত্যেক বার জয় লাভে এক এক খানি করিয়া কাগজ জিতিয়া পাঁচবারে এক খানি "পঞ্জা" হয়, একখানি পঞ্জা লইয়া চিৎ ভাবে ধরিতে হয়। কিন্তু পঞ্জা না হওয়া পর্য্যন্ত যদি ১।২।৩।৪ খানি কাগজ হইবার শেষে বা মধ্যে একবার খেলা না থাকে, তবে সমস্ত কাগজ গুলি একবারে উঠিয়া যাইবে, এক এক খানি করিয়া উঠিবেনা।

যদি কোনবারে কোন পক্ষ সমস্ত পিটগুলি অধিকার করিতে পারেন, তবে সেইরূপ জয়লাভের চিহ্ন স্বরূপ এক খানি ছক্কা চিৎ এবং এক খানি কাগজ উপড় ভাবে ধরিতে হয়, উহাকে ছক্কার "ফিচ কাগজ" বলে। ঐরূপ পাঁচ বারে পাঁচ খানি ছক্কা হইলে ৫ খানি ফিচের কাগজে এক খানি পঞ্জা হয়। চারি খানি কাগজের পর যদি ছক্কা জিতা যায়, তবে ছক্কার ফিচ্

খানি লইয়া এক খানি পঞ্জা হইয়া থাকে, এবং এইরূপ অসাধারণ ঘটনায় যে ছক্কা পঞ্জা হয় তাহার চিহ্নস্বরূপ এক খানি চৌকা চিৎ ভাবে ধরা গিয়া থাকে। এরূপে হওয়া ছক্কা পঞ্জাকে "বোম ভেস্তা" বলা হয়। বোম ভেস্তাই গ্রাবু খেলার চুড়ান্ত জিত।

কাগজ বণ্টনের পর যখন জানিতে পারা যাইবে যে, এক পক্ষে সাত খানি রং পাইয়াছেন, তবে তাহাকে "সাততুরুপ" এবং আট খানি রং পাইলে "আট তুরুপ" কহে। সাততুরুপ আট তুরুপে খেলা নাই। সাত আট তুরুপে যে পক্ষ সাত ও আট খানা রং পান তাঁহারাই হাতের কাগজ পাইয়া পর বারের খেলায় কাগজ বণ্টনের অধিকারী হয়েন।

উপরে যেরূপ গ্রাবু খেলার পদ্ধতি ও জয় পরাজয়ের কথা লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অধিক পিট সংগ্রহ ও যাহাতে সেই পিটে থাকা কাগজের অঙ্ক সংখ্যা অধিক হয় তাহার চেষ্টা করিলেই খেলায় জয় লাভ হইবে। অতএব খেলার আরম্ভাবধি তাহারই বিশেষ চেষ্টা না করিতে পারিলে খেলায় জয় লাভ হইবে না। পিটের কাগজ সংগ্রহ ও তদ্বারা গণনার সংখ্যা বাড়াইতে হইলে ডবল কাগজ পাওয়া চাই এবং খেলিবার কৌশল জানা আবশ্যক। তজ্জন্য কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু জানা আবশ্যক যে, যিনি আপনা হইতে যত কৌশল উদ্ভাবিত করিতে পারিবেন তিনি তত পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হইবেন।

রং সকল কাগজেরই উপর চলে। এক পক্ষ বদ রঙ্গের খেলায় টেক্কা দিয়া পিট লইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অপর ব্যক্তি রঙ্গের সাতা দিয়া সেই পিট লইতে পারেন। এজন্য গ্রাবু

খেলার রঙ্গের প্রাধান্য ও আদর অধিক। অতএব কোন মতে রঙ্গের অসদ্ব্যবহার না হয়। তিন খানার কম রং হাতে না আসিলে খেলার আরম্ভে রং খেলা উচিত নয়। রং ব্যতিরেকে বদরঙ্গের যে কোন কাগজের দ্বারা পিট পাওয়া যায় তাহাকে "ফেরাই" কহে। খেলার মধ্যস্থলে বা শেষে একটা বদরং যদি কাহার এক চেটিয়া হয়, আর তাঁহার খেলিবার পালা পড়ে, তবে তিনি সেই বদ রঙ্গের, এমন কি সাতা পর্য্যন্ত খেলিয়া পিট পাইতে পারেন, বলা বাহুল্য যে অপর কাহারও হাতে রং থাকিলে তাহা দিয়া ফেরাই পিট বশীভূত করিতে পারেন, এজন্য আট খানা রং ফুরাইয়া গেলেই ফেরাই থাকিলে পিট পাইবার বিশেষ সুবিধা। ফেরাই, এবং মধ্যেবদ রঙ্গের টেক্কা, সাহেব, বিবিই উচ্চ পদস্থ, কোন একটা বদ রং এক চেটিয়া হইলে তাহার সাতা পর্য্যন্ত যে ফেরাই তাহা আর বারম্বার বলিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বদরঙ্গের বড় বড় যতগুলি হাতে থাকে, খেলার প্রথমে সেই গুলিকেই ফেরাই বলিয়া জানিতে হয়।

হাতে বেশী ফেরাই থাকিলে কেহ কেহ এক খানা রং পাইলেও খেলিয়া থাকেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যদি "সাথীর" হাতে বড় রং থাকে তবে তিনি রং কাবার করিলে ফেরাই দ্বারা সকল পিট আয়ত্ত করিতে পারিলে "ছক্কা" করা যাইতে পারে।

দুই খান রং পাইলে কোন মতে খেলার প্রথমে রং খেলা উচিত নয়। রং খেলিলে রঙ্গ দিতে হয়। না থাকিলে পাস দিবেন।

যে রঙ্গের ফেরাই হাতে থাকিবে কখন সে রং পাশ দেওয়া উচিত নয়। সময়ে সময়ে উপায়ান্তর না থাকিলে বাধ্য হইয়া দিতে হয়, সে পৃথক্ কথা।

বড় থাকিতে ছোট কাগজ খেলা বা অন্যের খেলার উপর দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে যখন খেলার পড়নে এমন বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রতিপক্ষের বাম দিকস্থ ব্যক্তি (দৃষ্টান্তস্বরূপ) হাতে সাহেব রাখিয়া ছোট তাস দিয়া গেলেন, আর আমার হাতে বিবি ও টেক্কা আছে, সেরূপ স্থলে বিবি দিয়া পিট লইলে টেক্কার আর একটা পিট পাওয়া যায়, আবার হয়ত গোলাম থাকিলে আরও একটা পিট আসিতে পারে। এরূপ স্থলে বড় থাকিতেও ছোট কাগজ দিয়া পিট লওয়া যাইতে পারে।

সাথী—(যাঁহার সহিত এক পক্ষ হইয়া খেলা যায়) প্রতিপক্ষ যখন ছক্কা করিবার আয়োজন করিতে থাকিবেন সে সময় তিনি যে রং পাশ দিবেন সেই রঙ্গের ফেরাই যদি আমার হাতে থাকে তবে তাহা পাশ দেওয়া উচিত নয়।

গ্রাবু খেলায় রং ও বদরঙ্গের যিনি যত হিসাব রাখিতে পারিবেন তিনি তত উৎকৃষ্ট খেলিতে পারিবেন। এজন্য প্রথমাবধি যখন যত রং ও বদরঙ্গের খেলা হইবে, সাধ্যানুসারে তাহাদের হিসাব রাখিবেন, অর্থাৎ রং ও বদ রঙ্গের কোন্ কোন্ তাস খেলা হইল তৎপক্ষে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

গ্রাবু খেলার অনুমান দ্বারা কাহার হাতে কোন্ কোন্ কাগজ আছে স্থির করিতে চেষ্টা করা উচিত। সত্য বটে অনুমান সর্ব্বত্র ঠিক না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা খেলায় বিশেষ পরিপক্ক তাঁহাদের কাছে প্রায়ই ভুল হয় না।

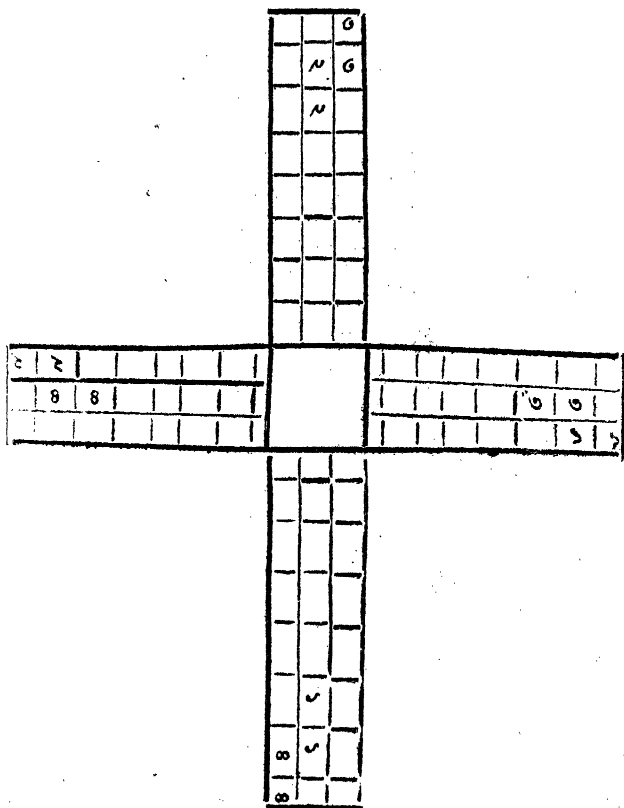
যৎকালে খেলা হইতে থাকে, কে কাহার পর কোন্ তাস দিলেন তাহার একটা হিসাব রাখিতে পারিলে পর হাতে যখন কাগজ বণ্টন হয়, তখন যে তাস খানি কাটান হইল সেখানি পূর্ব্ব হাতের খেলায় কোন্ কোন্ কাগজের সঙ্গে ছিল স্মরণ থাকিলে সেই খানে কোন্ কোন্ কাগজ আছে অনুমান দ্বারা অনেকটা জানিতে পারা যায়।

সপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কেহ বিন্তি পঞ্চাশ ডাকেন, তবে তাহা কি বড় (জিজ্ঞাসা দ্বারা) জানিতে পারিলে আপনার হাতের কাগজ গুলি দেখিয়া কোন্ রঙ্গের বিন্তি বিবেচনা করিতে পারা যায়। যদি আপনার হাতের কাগজ গুলিদ্বারা বিশেষ অনুমান না হয়, তবে এক বার খেলা হইলে তাহা স্থির করা যাইতে পারিবে। যথা,—অপর হাতে হরতনের বিবি বড় বিন্তি আছে। তিনি জানিলেন বিন্তি বিবি বড়। তাঁহার নিজের হাতে হয়ত ইস্কাবনের দশ, রুইতনের গোলাম, আর চিড়িতনের বিবি আছে। বিবি বড় বিন্তিতে দশ, গোলাম, বিবি, চাই। যদি তিনটী পৃথক্ পৃথক্ রঙ্গের বিবি গোলাম দশ আমার হাতে রহিল, তবে আর কিরূপে অপর হাতে ঐ তিন রঙ্গের বিন্তি থাকিবে? তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হরতনেরই বিন্তি হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাশাখেলা।

পাশাতে চারি রঙ্গের চারিটী করিয়া ১৬টী গুটী বা বল্ থাকে। চারি জনে চারি চারিটি করিয়া লইয়া দুই দুই জনে দলবদ্ধ হইয়া খেলিতে হয়। তাসের ন্যায় সদলস্থ দুই জন পরস্পরে সম্মুখে বসিতে হয়, এবং পাশা খেলার জন্য কাপড়ের উপর যে ঘর প্রস্তুত করা থাকে, তাহার যে অংশ আপনার দিকে থাকে, সেই অংশের মধ্যের শ্রেণীর নীচে একটী ঘর থাকিতে একটী বল ও তাহার উপরের একটী ঘরে একটী বল, এবং অপর দুইটী প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে যিনি বসেন তাঁহার ঘরের বাম পার্শ্বের ঘরের শেষ দুইটী ঘরে দুইটী গুটী বসাইতে হয়। এইরূপে সকলেই আপনাপন গুটী গুলিকে বসাইবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—



চারি রংঙ্গের গুটী গুলিকে ১।২।৩।৪ অঙ্ক দ্বারা কল্পনা কর।

পাশা খেলায় পাক্ষি'র প্রয়োজন হয়, চলিত কথায় তাহাকে ছক বলে। ছক সর্ব্ব সমেত তিন খানি। সকল গুলিই দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ। তাহাদের প্রত্যেকের এক পৃষ্ঠে একটী বিন্দু, এক পৃষ্ঠে দুইটী বিন্দু, এক পৃষ্ঠে পাঁচটী, আর এক পৃষ্ঠে ছয়টী বিন্দু

থাকে। সেই ছক তিন খানিকে এক এক বার ফেলিলে তাহাদের সকল গুলির সংখ্যা গণনায় যত হয়, তদনুসারে গুটী গুলিকে এক ঘর হইতে অপর ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া লইয়া যাইবার উপায় নাই। তাহার বিশেষ বাঁধা ধরা আছে। এক একটী গুটীর পৃষ্ঠে যত গুলি অঙ্ক উপরে পড়িবে তদনুসারে গুটী গুলি চলিবে। পূর্ব্ব গুটী গুলির চারি পৃষ্ঠে যেরূপ বিন্দু সংখ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে হিসাবে তিন হইতে আঠার পর্য্যন্ত পড়িতে পারে।

যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পাশা পড়িয়া থাকে তাহাদের এক একটীকে "দান" বলে। পাশা ফেলিলে নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারের এক প্রকার না হয় অন্য প্রকার নিশ্চয়ই পড়িবে, তাহা ছাড়া অন্য কোন প্রকার পড়িবে না, এজন্য এই কয়েকটী ভিন্ন পাশায় অন্য দান নাই যথা;—

তিরি, চোক, পঞ্জা, ছক্কা, পাঁচ দুই সাত, পাঁচ তিন আট, ছয় তিন নয়, পঞ্চার (পাঁচ চারি) নয়, ছয় চারি দশ, দশ পোয়া (পোয়া একক বলে) এগার, দশ দুই বার, কচে (কচ একক বলে) বারি, পহবার (পোয়া বার) তের, এগার দুই তের, চৌদ্দ (অন্য প্রকারে চৌদ্দ পড়ে না), পনর (উহাও অন্য প্রকার পড়ে না), ষোল, সতের এবং আঠার।

দুইটী পাঞ্চি (ছকে) একই সংখ্যার অঙ্ক থাকিলে তাহাকে দোছক বলে এবং তাহাতেই পাশার জোড়া চলে। অর্থাৎ দুইটী ছকের সংখ্যা গণনায় যত হইবে, ক্রীড়কের ইচ্ছানুসারে তত ঘর বা তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যার ঘর দুইটী পাশা একত্র থাকিলে দুইটীই এক সঙ্গে চলিতে পারিবে। অবশিষ্ট একটী

ছকে যত পড়িবে, অপর একটী পাশা তত ঘর চলিবে। যথা— ৫+২ সাতে ১ বা ২ ঘর, ৬+২ আটে এক বা দুই ঘর, ৬+৪ দশে ২ বা ৪ ঘর, দশ পোয়া এগারতে ৫ বা ১০ ঘর, পহবার তেরতে ৬ বা ১২ ঘর, চৌদ্দতে ৬ বা ১২ ঘর, পনরতে ১০ বা ৫ ঘর, ষোলয় ৫ বা ১০ ঘর, সতেরয় ৬ বা ১২ ঘর, এবং আঠারতে ১২ বা ছয় ঘর জোড়া চলে। ঐ হিসাবে কচেবারয় জোড়া চলিতে পারে না, কিন্তু উহাতে এই হিসাবে জোড়া চালান যায় যে, যেন একটী পাশাকে ছয় ঘর এবং অপর পাশাটীকে ৫ ও ১ উভয়ের একত্রে ছয় ঘর দিলে দুইটীতে পূর্ব্ববৎ একঘরেই যাইবে। এই হিসাবে কচে বারতে কেবল ছয় ঘর জোড়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুইটী ছকে সমান সংখ্যা না থাকায় পাশা বার ঘর যাইতে পারে না।

ঐরূপে যদি তিনটী পাশা একঘরে থাকে, ও তিন ছকের প্রত্যেক ছকটীতে তিন সংখ্যা যুক্ত কোন দান পড়ে, তবে জোড়া পাশা ছকের দান পড়িলে যেরূপে চলে সেইরূপে চলিতে পারে। প্রতিপক্ষের জোড়া পাশা যদি দুইঘর অন্তরে থাকে, তবে যে দানে চারি ঘর জোড়া যাইতে পারে সে দানে জোড়া চলিবে না। সেইরূপে পাঁচ ঘর অন্তরে থাকিলে যে দানে দশ ঘর জোড়া চলিতে পারে সে দানে, এবং ছয় ঘর অন্তরে থাকিলে যে দানে বার ঘর জোড়া চলে সে দানে জোড়া চলিবে না। এজন্য যিনি সুবুদ্ধিমান্ ক্রীড়ক তিনি এইরূপে প্রতিপক্ষের জোড়া যাহাতে না চলিতে পারে এজন্য ৫। ৬ ঘর অন্তরে আপনার জোড়া পাশা রাখিয়া প্রতিপক্ষের জোড়া পাশার গতিরোধ করিয়া থাকেন। পাশা খেলায় এইরূপ

জোড়ার চলন বন্ধ করাকে "রোখ" বলে। যথা;—দোয়া রোখ, পঞ্জা রোখ, ছকা রোখ বলা গিয়া থাকে।

পাশা সমস্ত ঘর গুলি ঘুরিয়া যখন আপন ঘরে প্রবেশ করিবে, তখন সর্ব্বনিম্নের মাঝখানকার শ্রেণীর ঘরে আসিলে তাহাকে উল্টাইয়া দিতে হয়। তদ্বারা কাঁচা অর্থাৎ যে পাশা ঘর হইতে বাহির হইতেছে তাহা হইতে পৃথক পৃথক করা গিয়া থাকে। ঐ ঘরকে "পেটা" বলে। চৌষট্টি ঘর ঘুরিয়া পাশা মধ্যস্থলের বড় ঘরটীতে পৌঁছিলেই তাহার পরিণাম হইল। সকলের পাশাই ঐ একটী ঘরে উঠিয়া থাকিবে। যে পক্ষের আট্‌টী পাশা অগ্রে ঐরূপে উঠিতে পারিবে, তাঁহাদেরই জয় লাভ হইবে। ঐরূপ যে পাশা চৌষট্টি ঘর ঘুরিয়া আসিয়াছে, আবশ্যক হইলে তাহাকেও বাহির করিয়া আবার চৌষট্টি ঘর ঘুরান যাইতে পারে। যখন দেখা যায় যে, আপনাদের অন্যান্য পাশা কাঁচা আছে, অর্থাৎ সকল গুলি গৃহ প্রবিষ্ট হয় নাই, অথচ প্রতিপক্ষের পাশা সকল গুলিই ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমত স্থলে সেই পাশাকে ফিরাইবার জন্য আপনার পাকা পাশা দিয়া ঐ পাশাকে মারিতে হয়। যে পাশা মধ্যস্থলের বড় ঘরে অর্থাৎ যাহাতে সকলের পাশাই উঠিয়া বিশ্রাম লাভ করে, সেই ঘর হইতে যদি তাহাকে পুনরায় কাঁচা করিয়া কোন পাশাকে ধরিতে বা মারিতে হয়, তবে যেমন দান পড়িবে তত ঘরই ঐ পাশা যাইতে পারিবে, কিন্তু যদি এমন কোন পাশা কাঁচিতে হয় যে, উহা গৃহ প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু বড় ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই, তবে তাহাকে কাঁচিবার সময় যত দান পড়িবে সেই দানের কোন একটী বা

দুইটী ছকে যত সংখ্যা পড়িয়াছে আবশ্যকমত তত ঘর উপরে উঠিয়া তবে নামিয়া আসিতে হইবে, কোন মতে সেই ঘর হইতে একাইক কাঁচিয়া বাহির হইতে পারিবে না।

প্রতি পক্ষের একটী মাত্র পাশা যদি কোন ঘরে থাকে, এবং আর এক পক্ষের একটী পাশা দানমত যদি ঠিক সেই ঘরে যাইতে পারে, তবে প্রথমোক্ত পক্ষের পাশাটী "মারা" পড়িবে. অর্থাৎ সেটীকে আবার আপন ঘরে উপর হইতে দান অনুসারে উপর হইতে গণনা ক্রমে বাহির করিয়া চৌষট্টি ঘর ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

এক রঙ্গের অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে রঙ্গের চারিটী পাশা লইয়া খেলিতে বসেন, তাহাদের পরস্পরেরই কেবল জোড়া হয়, যাঁহার সহিত এক যোগে খেলা যায় তাঁহার পাশার সহিত জোড়া বাঁধা যাইতে পারে না।

প্রতিপক্ষের পাশার দ্বারা যেমন পঞ্জা ছক্কা রোধ হয়, সহ-ক্রীড়কের যদি একটী পাশাও দুই বা পঞ্জা ছক্কার ঘরে থাকে, তবে সেরূপ স্থলেও জোড়া চলেনা।

জোড়া দ্বারা প্রতিপক্ষের একটী মাত্র পাশা একঘরে থাকিলে তাহাকে মারা যাইতে পারে। কিন্তু জোড়া কখনই মারা যায় না।

দুইজনে একযোগে খেলিতে বসিয়া এক জনের দানে সহক্রীড়কের পাশা চালনা করা, বা দানের কিয়দংশ আপনার পাশা চালাইয়া অপরাংশে তাঁহার পাশা চালনা করা যাইতে পারে না, কিন্তু যখন একজনের সমস্ত পাশা উঠিয়া যাইবে, তখন উপরোক্ত প্রকারে আংশিক ও সমুদায় দানই সহক্রীড়কের পাশা চালনায় প্রযুক্ত হইবে।

শেষ পাশা গৃহ প্রবেশ করিবার সময় যদি এমন দান পড়ে যে, তাহার কোন অংশে পাশা ঠিক বড় ঘরে উঠিতে না পারে, অথচ পূর্ণ দানটীর সমস্ত লইলে বড় ঘরে পৌঁছিবার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়, আর অন্য এমন পাশা না থাকে যে দানের কিয়দংশ দ্বারা তাহাকে চালনা করা যাইতে পারে, তবে সেই পাশা পুনরায় কাঁচিয়া বসিতে হয়। এরূপ কাঁচিয়া বসাকে "হাতে কাঁচা" বলে। মনে কর তোমার দুইটী পাশা বড় ঘরে উঠিয়াছে আর দুইটীর একটী বড় ঘরে উঠিতে দুই ঘর বাকী আছে, অপরটী বড় ঘর হইতে দশ ঘর দূরে অর্থাৎ গৃহ প্রবেশ করিতে দুই ঘর মাত্র বাকী আছে, এমন সময় তোমার ষোল পড়িল। সেই দান অনুসারে যে পাশাটী দশঘর দূরে আছে তাহাকে বড় ঘরে তুলিয়া দিতে পার, কিন্তু যে পাশাটী দোয়ার আছে, সেটীকে তুলিয়া দিতে পারিলে না, যেহেতু ছয় পড়িলে দোয়ার পাশা উঠিতে পারে না, কেন না এক একটী ছকের সংখ্যার গণনাক্রমে পাশা চলিয়া থাকে, উক্ত সংখ্যার ভগ্নাংশে পাশা চলে না। এরূপস্থলে যে পাশাটী দশ ঘর দূরে ছিল, সেই-টীকে দশঘর উঠাইয়া ছয় ঘর নামিয়া আসা ভিন্ন আর উপায় থাকে না। যেটী দোয়ায় আছে ষোলর দানে সেটীর নড়িবার উপায় নাই। কিন্তু সমস্ত পাশা ঘরে প্রবেশ করিলে যত বড় দানই পড়ুক আবশ্যক মত তাহার অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করা বা সহ ক্রীড়কের পাশা চালিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

দুইজনেও পাশা খেলা যায়, সেরূপ খেলাকে "রং" খেলা বলে। রং খেলিতে হইলে এক এক জনকে দুইরকমের

চারিটী করিয়া আটটী পাশা লইয়া খেলিতে হয়, এবং চারি জনের খেলায় যেমন একঘরে একটী করিয়া পাশা বসাইতে হয়, ইহাতে তাহার দুইটী করিয়া বসাইতে হয়, অর্থাৎ আপনার ঘরের ছকা এবং সাতার ঘরে এক রঙ্গের দুইটী দুইটী চারিটী এবং অপর রঙ্গের দুইটী দুই দুইটী চারিটী দক্ষিণ দিকের গৃহ শ্রেণীর শেষ দুইটী ঘরে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুইটী জোড়া হইতে দুইটী জোড়া ১৬ ঘর দূরে বসাইতে হইবে। সেই চারিটী পাশাকে রং বলে।

এই খেলায় পোয়াযুক্ত কোন দান যতক্ষণ না পড়ে, ততক্ষণ পাশা চালনা করা যায় না। একবার উক্তরূপ দান পড়িলে তাহার পর যাহাই পড়ুক পাশা চলিতে থাকিবে।

কিন্তু একটা পাশা মারা গেলে যতক্ষণ পোয়াযুক্ত দান না পড়ে ততক্ষণ ঐ পাশা বসিতে পারা যায় না, এবং যতক্ষণ ঐ পাশা না বসান যায়, ততক্ষণ অন্য পাশাও চালনা করিবার অধিকার থাকে না।

রং খেলায় অগ্রে রং পাকিয়া উঠিতে হইবে, এবং সেই রং গুলির মধ্যে শেষের একটী কিম্বা দুইটী এমন দানে উঠিতে হইবে যে, যে দানে সেই পাশা গুলিকে প্রথম চালনা করা হইয়াছিল। তাহাকেই খেলা রাধা বলে। যদি কাহারও প্রথম খেলার সময় ৫+২ সাত পড়ে, তবে তাঁহাকে রঙ্গের শেষ পাশা উঠিবার সময় ৫+২ সাতেই উঠিতে হইবে। খেলার প্রথমে যে রংএর পাশাকে অগ্রে চালান যায়, সেই বার সেই পাশা-কেই "রং" বলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সতরঞ্জ বা দাবা খেলা।

প্রথিত আছে লঙ্কেশ্বর দশানন বড় সমরপ্রিয় ছিলেন। যুদ্ধচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা তাঁহার ভাল লাগিত না। এজন্য তাঁহার সমরপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই খেলার সৃষ্টি হয়। রাজকার্য্য হইতে যখন তিনি অবসর লাভ করিতেন, তখনই অমাত্যগণের সহিত এই ক্রীড়ায় অবকাশকাল ক্ষেপণ করিতেন। সতরঞ্জ খেলার পদ্ধতি অবগত হইলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা উপরে যাহা লিখিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এই খেলা যারপর নাই নির্দ্দোষ এবং ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখার্য্য জন্মিয়া থাকে। এজন্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আজি কালি অনেকেই সতরঞ্জ খেলায় আশক্ত।

যে গুটী গুলিকে লইয়া এই খেলা খেলিতে হয়, সেগুলিকে "বল" আখ্যা দেওয়া গিয়া থাকে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—সে গুলি কাহার বল? যিনি খেলা করেন তাঁহার বা তাঁহার প্রতিনিধি "রাজার।" সতরঞ্জের বল গুলিতে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনই আছে। রাজা আছে, মন্ত্রী আছে, গজ আছে, ঘোড়া আছে, নৌকা আছে, এবং সৈনিক আছে। যুদ্ধ যেমন দুই পক্ষ ব্যতীত হয় না, সতরঞ্জ খেলাও তদ্রূপ, দুইপক্ষে খেলিতে হয়। উভয় পক্ষই সমস্ত বল সমান লইয়া আরম্ভ করিতে হয়, তবে যিনি যেরূপ খেলিতে পারেন তিনি তদ্রূপ

শত্রুপক্ষের বল হানি করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া থাকেন। দুই পক্ষের বল পৃথকরূপে চিনিবার জন্য উভয় পক্ষের বলে প্রায়ই লাল ও সবুজ রং দেওয়া হয়।

বল গুলির মধ্যে দুইটী দেখিতে স্তম্ভাকার। তাহাদের মধ্যে বড়টী "রাজা" এবং অপেক্ষাকৃত ছোটটী "মন্ত্রী" বা "দাবা"। রাজার ন্যায় আকারে উচ্চ নিম্ন ভাগ ডমরু অর্দ্ধের ন্যায় এবং উপরি ভাগ একটী দণ্ডের মত তাহাকে "গজ" কহে।

দেখিতে ঠিক গজের ন্যায় কিন্তু মন্ত্রীর মত উচ্চ যে বল তাহাকে ঘোড়া, এবং মুদ্রাকারে গোল, এবং উপরিভাগ ক্রমোচ্চ এরূপ বলকে নৌকা বলে। একটী সিকির আকারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলগুলি থাকে তাহাদিগকে "বড়ে" বলিয়া থাকে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রটী চতুরস্র, অর্থাৎ দীর্ঘে প্রস্থে সমান, উভয় দিকে আট আটটী করিয়া চৌষট্টিটী ঘরে বিভক্ত। তাহাকে "ছাল" বলে।

যে দুই জনে খেলা হইবে তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে ঐ ছাল পাতিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে উভয় পক্ষের বল বসাইতে হইবে। যথা;—

আপনার দিকে ছালের যে দুইটী কোন্ থাকে তাহাতে দুই খানি নৌকা, বামের নৌকার দক্ষিণে এবং দক্ষিণের নৌকার বামে দুইটী ঘোড়া, ঐরূপে বামের ঘোড়ার দক্ষিণে এবং দক্ষিণের ঘোড়ার বামে দুইটী গজ এবং বামের গজের দক্ষিণে রাজা ও দিক্ষের গজের বামে মন্ত্রীকে বসাইয়া সকলের সম্মুখে এক একটী বড়ে বসাইতে হয়। আদর্শ স্বরূপ একটী চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

নৌকা	ঘোড়া	গজ	দাবা	রাজা	গজ	ঘোড়া	নৌকা
০	০	০	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০	০	০
নৌকা	ঘোড়া	গজ	রাজা	দাবা	গজ	ঘোড়া	নৌকা

বল গুলি কিরূপে চালনা করা যাইতে পারে তাহা বিবৃত হইতেছে।

বড়ে গুলি সম্মুখ দিকে এক এক ঘর করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। একবার অগ্রসর হইলে আর পশ্চাৎ ফিরিতে পারে না, কিন্তু উহাদের কোণের ঘরে যদি অন্য পক্ষের কোন বল বা বড়েকে পায়, তবে তাহাকে মারিয়া অকর্ম্মণ্য করিতে পারে। রাজার চলন যেদিকে ইচ্ছা কেবল একঘর। মন্ত্রী সোজা সোজা ও কোণাকোণী যত ঘর ইচ্ছা যাইতে পারে। গজ কেবল কোণা কোণী যত ঘর ইচ্ছা চলে। ঘোড়ার চাল আড়াই ঘর-

অর্থাৎ যে ঘরে থাকে তাহার কোণের ঘরের সোজা এক ঘরে যায়—এইরূপে চতুর্দ্দিকেই যাইতে পারে, এবং নৌকা সোজা সোজী যত ঘর ইচ্ছা যাইতে পারে। যে বল যেরূপ যে ঘরে যাইতে পারে, প্রতিপক্ষের কোন বল থাকিলে তাহাকে মারিয়া অকর্ম্মণ্য করিতে পারা যায়। একটী বল অন্য বলকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে না। এজন্য উভয় পক্ষের বড়ে দুইটী পরস্পর সম্মুখীন হইলে কেহই অগ্রসর হইতে পারে না। একটী বল যে ঘরে থাকে, সেই পক্ষের অন্য বল সেই ঘরকে আপনার গমনোপযোগী করিলে শেষোক্ত বল পূর্ব্বোক্ত বলের বলস্বরূপ হয়। এইরূপে দুই তিনটী বা ততোধিক বল অপর একটী বলের বলস্বরূপ দণ্ডায়মান হইতে পারে। যদি প্রতিপক্ষের কোন বল তোমার কোন বলকে মারিবার জন্য আক্রমণ করে, অর্থাৎ তোমার বল যে ঘরে আছে, সেই ঘরে আসিয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিবার চেষ্টা করে, তবে তুমি তোমার সেই বলকে অন্য বল দিয়া জোর দিলে প্রতিপক্ষ তাহাকে মারিবে, তুমিও তাঁহার সেই বলকে মারিতে পারিবে। যদি তাঁহার অধিক বল থাকে অর্থাৎ তিন চারিটী বল দিয়া তোমার বলকে আক্রমণ করিয়া থাকেন, তবে ততোধিক বল প্রয়োগে তুমিও সেই আক্রান্ত বলকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, কেন না, তোমার রাজার বল যত মারা যাইবে, সে তত সামর্থহীন হইতে থাকিবে। সামর্থহীন হইলেই পরাভূত হইতে হইবে। কিন্তু বল মারা যাইলেই যে পরাজয় স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় বার নূতন খেলার আয়োজন করিতে হইবে এমন কথন

হইতে পারে না। কেননা যিনি ভাল যোদ্ধা তিনি কি আপনার সৈন্যহানী হইলে রণস্থল হইতে কখন পলায়ন করিয়া থাকেন? যতক্ষণ আপনার সামর্থ থাকে, যতক্ষণ তিনি বন্দী না হয়েন, ততক্ষণ তিনি ছাড়েন না। সতরঞ্চ খেলা যে যুদ্ধের অনুরূপ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অতএব দুই একটা বল অসাবধানতা প্রযুক্ত মারা গেলে, কৌশলে প্রতিপক্ষের বলহানী করিয়া জিতিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে বলহীন হইয়া বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে যে অধিক বুদ্ধি কৌশলের প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য।

প্রতিপক্ষের বল যে ঘরে থাকিতে পারে, সেই ঘরকে তাহার "মুখ" বলে, আর স্বপক্ষের বলের ঘরকে জোর বলা যায়।

যে বল একবার মারা পড়ে, সে বল আর ব্যবহৃত হইতে পারে না। দ্বিতীয় বার খেলা আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে যুদ্ধস্থল (ঢাল) হইতে অপসৃত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু যদি সেই বলের ঘরে যে বড়ে থাকে, সেই বড়ে যদি প্রতিপক্ষের সেই বলের গৃহ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, তবে ঐ বল পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘোড়ার বড়েকে যদি এক এক ঘর করিয়া প্রতিপক্ষের ঘোড়ার ঘরে লইয়া যাইতে পারা যায়, তবে সেই বড়েটী একটী ঘোড়া হইয়া পূর্ব্ববৎ খেলিতে পারিবে। ঐরূপে নৌকা, দাবা, গজ সমস্তই আবার নূতন হইতে পারে।

সকল বলই প্রতিপক্ষের অন্য বল দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইতে পারে, অর্থাৎ সকল বলই মরিতে পারে, কিন্তু রাজাকে মারা যাইতে পারে না। রাজাকে কোন বল আক্রমণ করিলে তাহাকে

"কিস্তি" দেওয়া বলে। কিস্তি দিলে রাজাকে সরিয়া বসিতে হয়। যখনই কিস্তি দিয়া রাজার গতিরোধ করা যায়, অর্থাৎ কোন ঘরেই তাহার যাইবার উপায় থাকে না, তখনই তাহাকে বন্দী বিবেচনা করিতে হইবে। রাজার এই অবস্থাকে সতরঞ্জ খেলায় "মাৎ" বলে। রাজা মাৎ হইলেই বাজী শেষ হয়, আবার নূতন বাজী আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু রাজাকে কিস্তি না দিয়া যদি তাহার চলন বন্ধ করা যায়, অথচ চালনা করিবার অন্য বল না থাকে, তবে প্রতিপক্ষের যে কোন বল তুলিয়া লইলে রাজার গতিবিধি করিবার উপায় হয়, তাহা করা যাইতে পারে।

রাজাকে বন্দী অর্থাৎ মাৎ করিতে পারিলেই যদি জয়লাভ হয়, তবে যেন তেন প্রকারেণ মাৎ করিবার চেষ্টা দেখাই শ্রেয়।

বল সম্মুখে পাইলেই তাহাকে মারা উচিত নয়। বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই বলকে মারিলে নিজের কোন ক্ষতি না হয়। রাজা বন্দী হইতেছে এমন সময় কিছু ক্ষতি হইলেও যদি মাৎ হয়, তবে তাহার উপায় দেখিতে হয়।

সতরঞ্জ খেলার চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া খেলিতে হয়। প্রতিপক্ষ যে চাল চালেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি অগ্রে বিশেষ রূপে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। চিন্তা করিয়া যাহা অবধারিত হইবে তাহা ব্যর্থ করিবার উপায় দেখিতে হইবে, নতুবা খেলায় জয় লাভ করা দুরূহ। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার চেষ্টা অগ্রে না দেখিয়া অপর খেলা যুক্তিযুক্ত নহে।

অগ্রে আত্মরক্ষা করিয়া তবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিবার পন্থা না দেখিলে আপনাকে বিপদে পড়িতে হয়, একথা যেন সকলেরেই মনে থাকে। যিনি প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহার মন্ত্রণা বিফল করিতে পারেন, এবং আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া তবে প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়া পড়েন, তিনি নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন।

পরাভূত রাজাকে বন্দী অবস্থায় যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই খেলাতেও তদ্রূপ আমোদ করা যাইতে পারে, সে জন্য "পিলুড়ি", "অষ্টচক্রে" ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খেলা আছে। রাজা যখন নিতান্ত হীনবল হয়, তখন তাহাকে ইচ্ছামত ঘুরান ফিরান যায়। পিলুড়িতে রাজাকে চারিটী মাত্র ঘরে ঘুরান গিয়া থাকে। দুর্ব্বল রাজা ঐ চারিটী ঘরের বাহিরে কোন মতে যাইতে পারে না। নিম্নে পিলুড়ি খেলার একটী চিত্র প্রদর্শিত হইল,—ইহাতে অন্ততঃ নৌকা দুই খানি এবং গজ একটীর নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা না হইলে পিলুড়ি হইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, যে রাজা পিলুড়ির খেলায় ঘুরিতে থাকিবে, তাহার কোন বলই থাকিবে না, কেবল মাত্র একটী বড়ে থাকিবে। যখন রাজার একটী বড়েও না থাকে, তখন তাহাকে ফকির বা দরিদ্র বলা যায়। কিন্তু যদি উভয় পক্ষের বলসংখ্যা (রাজা সমেত) চারিটী মাত্র থাকে, তবে তাহাকে "চতুর্ব্বলা" বলা যায়, সে বাজী খেলা না খেলা তুল্য। উভয় পক্ষের জয় পরাজয় কিছুই অবধারিত হইবার নহে, দুই পক্ষই সমান থাকিয়া যায়, এজন্য সেই বাজীকে "চটায়

বাজী” বলে। এইরূপে একখানি নৌকা ও গজকে স্থাপিত করিতে হইবে। প্রতি পক্ষের রাজাকে কশিয়া(+) এইরূপ চিহ্নিত একটী ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। তাহার আর একখানি নৌকা দিয়া গজের চারি কোনের সাদা ঘর চারিটীতে কিস্তি দিলে রাজা

			নৌকা				
	+						
+	গজ	+					
	+						

কেবল এইরূপ ঢেরা(+) চিহ্নিত চারিটী ঘরেই ঘুরিতে থাকিবে, কোন মতে বাহিরে যাইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, অপর একখানি নৌকা পূর্ব্ব হইতে এমন ঘরে রাখিতে হইবে যেন সেখান হইতে আসিয়া গজের জোরে সাদা ঘরে বসিয়া রাজাকে কিস্তি দিতে পারে।

"অষ্টচক্রের" খেলায় দুইটী ঘোড়া, দাবা, গজ একটী, ও নৌকা একখানির নিতান্ত প্রয়োজন, এবং গজ দাবা ও নৌকা তিনটী বল নিম্নোক্ত প্রকারে স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর ঘোড়া দুইটী চিহ্নিত আটটী ঘরে এক একটী

						নৌকা	
			+	+			
		+			+		
		+			+		
			+	+			
	দাবা					গজ	

আসিতে আসিতে রাজাকে আটটী ঘর ঘুরাইবে। পরিশেষে মাৎ করিলেই বাজী শেষ হইল। পিলুড়িতেও শেষকালে রাজাকে মাৎ করিতে হয়, নতুবা বাজী জিৎ হয় না।

সতরঞ্জ খেয় "পঞ্চরং" একটী প্রসিদ্ধ খেলা। এই খেলায় ৫টী বলের উপর্য্যুপরি কিস্তেতে রাজা মাৎ হইয়া থাকে।

নিম্নে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাতে যেরূপে বল গুলি বসান আছে তদ্রূপে বসাইতে হইবে। তাহার পরে অগ্রে নৌকা, তাহার পর গজ, তাহার পর দাবা, তাহার পর ঘোড়া, শেষে বড়ের কিস্তি মাৎ হইবে। কাল বল লাল বলকে মাৎ করিবে।

	কাল দাবা ৩						
					কাল গজ ২		
		কাল ঘোড়া৪		৩		২	
		কাল রাজা		৪			কাল বড়ে৫
	কাল নৌকা১						৫
	১	লাল রাজা					

১, ২ ইত্যাদি যে সংখ্যা অনুরূপ সংখ্যা যে ঘরে থাকিবে সেই বল সেই ঘরে গিয়া কিস্তি দিবে।

জ্যামিতির আলোচনায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, সতরঞ্জ খেলাতেও তদ্রূপ। এই খেলাতেও নানা প্রকার বুদ্ধি-

কৌশলের প্রয়োজন হয় এজন্য জ্যামিতি অনুশালনীর ন্যায় আদর্শস্বরূপ গুটী দুই প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাল রঙ্গের দিক।

	লাল ঘোড়া		লাল ঘোড়া				
		লাল বড়ে		কাল রাজা			
					কাল নৌকা		
	লাল গজ			কাল বড়ে			কাল ঘোড়া
	লাল বড়ে				কাল বড়ে		কাল গজ
লাল নৌকা				লাল রাজা		কাল গজ	

লাল রঙ্গের দিক।

লাল বল অগ্রে খেলিবে এবং চারি চালে কালককে মাৎ করিবে।

উত্তর।

লালবলের চাল।	কালবলের চাল।
১। কাল মন্ত্রী বসাইবার ঘরে ঘোড়ার কিস্তি দাও।	১। রাজাকে কাল মন্ত্রী বসাইবার চতুর্থ ঘরে চালনা কর।
২। নৌকার কিস্তি দাও।	২। গজ চাল।
৩। গজ মন্ত্রীর ঘরের পঞ্চম ঘরে যাও।	৩। কোন চাল্ চাল।
৪। নৌকা দিয়া গজমার।	মাৎ।

চৌষট্টী ঘর ঘোড়া ফিরান।

বাম দিকের কোণের ঘর হইতে ডানদিকে নিম্নোক্ত ৩২টী অক্ষরের আট আটটী অক্ষর ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকের এক একটী ঘরে লিখিয়া পূর্ব্ববৎ বামদিক হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘর গুলির দক্ষিণ দিকের এক একটী ঘরে ঐ রূপে চারিটী শ্রেণীতে লিখিয়া পরে চালের অপরার্দ্ধ অংশেও ঐ রূপে ঐ অক্ষরগুলি লিখিবে যথা;—

থু, ষ্ণ, ষী, র্দ্দ, ন, কা, দ, না,
কে, না, ম, ক্লু, হ্ন কা, ভ, শী,
দ্বা, রে, শ, ন্দ, ন, যা, থ, ব,
ত্রা, ন, জ, শ, হে, তা, র, ব।

অনন্তর মধ্যের যে দুইটী ঘরে "হে" আছে সেই ঘর হইতে;—

"হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ কাশী যাদবনন্দন
মথুরেশ হৃষীকেশ ত্রত্রো ভব জনার্দ্দন।"

এই বাক্যের এক একটী অক্ষর ঘোড়ার ঘরে দেখিতে পাইবে। তদনুসারে অশ্বচালনা করিলে চৌষট্টি ঘরেই তাহাকে চালনা করা যাইতে পারিবে। সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

না	দ	কা	ন	র্দ্দ	শী	ষ্ণ	থু
শী	ভ	কা	হৃ	কৃ	ম	না	কে
ব	[illegible]	যা	ন	ন্দ	শ	রে	দ্বা
ব	র	তা	হা	শ	জ	ন	ত্রা
ত্রা	ন	জ	শ	হে	তা	র	ব
দ্বা	রে	শ	ন্দ	ন	থা	থ	ব
কে	না	ম	কৃ	হৃ	কা	ভ	শী
থু	ষ্ণ	ষী	র্দ্দ	ন	কা	দ	না

শাস্ত্রাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুত্ব।

পরাধীন জাতির দুর্গতির পরিসীমা নাই; তাহারা বিদেশীয় রাজার শাসনাধীনে থাকিলে যে তাহাদের মনের স্বাধীনতা, জীবনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা সকলই বিনষ্ট হয় তাহার দৃষ্টান্ত ভারতের হিন্দু। ভারতের হিন্দু আজি সপ্তশতাধিক বর্ষ পর্য্যায়ক্রমে মুসলমান ও ইংরেজ জাতির হস্তে দেশের স্বাধীনতা অর্পন করিয়া আপনাদের সমস্তই হারাইয়া বসিয়াছেন। মুসলমানগণ হিন্দু ধর্ম্মের উপর যার পর নাই উৎপীড়ন করিতেন; হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধর্ম্মচিন্তা প্রভৃতি ঐহিক ও পারত্রিক ক্রিয়া কলাপের বিঘ্নকারী ছিলেন; তাঁহারা বল পূর্ব্বক হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না সত্যবটে, কিন্তু ইংরেজ রাজ্যে হিন্দুর হিন্দুত্বে প্রত্যক্ষ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ নাই, বরং হিন্দু যাহাতে স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন যাহাতে তাঁহার আচার ব্যবহারে কেহ কোন বিঘ্ন না করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ উপায় বিহিত হইয়াছে, তথাপি দিন দিন হিন্দুর কদাচার বৃদ্ধি এবং স্বধর্ম্মহানির প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর

হইয়েছে কেন? সে কেবল কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত অনুকরণ-প্রয়াসী হিন্দুকুলাঙ্গারের স্বেচ্ছাচারিতা ভিন্ন আর কোন কারণেই নহে। ইংরেজ অখাদ্য গ্রহণে, অপেয় পানে হিন্দুকে পরামর্শ বা প্রবৃত্তি দেন না, বরং যে সকল হিন্দু উক্তবিধ অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি হিন্দুর ও দুর্ম্মতি কেন? একথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর কি? যেহেতু হিন্দু ইংরেজের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, চাল চলন অনুকরণ করিবার জন্য লালায়িত। পবিত্র আর্য্যবংশ-সম্ভূত হিন্দুর মনে এ দুষ্প্রবৃত্তি সঞ্চারের কারণ এই যে, বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের মনে স্বধর্ম্মশিক্ষার অভাব। আজি কালিকার ভারতীয় হিন্দু বাল্যকালে যত দিন গুরু মহাশয়ের পাঠ-শালা হইতে বাহির হইতে না পারেন, ততদিনই তাঁহার মুখে পবিত্র ভাগীরথী স্তোত্র, চানক্যের হিত কথা, কর্ণের দাতৃত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। যদিও প্রাচীন পাঠশালা শিক্ষার মধ্যে অধুনা বিজাতীয় শিক্ষার গন্ধ মিশ্রিত হইয়া কেমন কেমন দেখাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও হিন্দুর অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানীর ছায়া কতকটা পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুরমণী এখনও হিন্দুধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করেন না, সেই পরম সৌভাগ্য। বাল্যকালে বালকবালিকাগণ জনক অপেক্ষা জননীর আচার ব্যবহার অনুকরণে অনেকটা আস্থাবান, তাই হিন্দুবালক গুরুমহাশয়ের পাঠশালা যাতায়াত কালে মুসলমানের কালিয়া কাবাবের দিকে দৃষ্টি পাত করে না।

বাল্যকাল হইতে আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাই আমাদের এই প্রভূত অনিষ্টের একমাত্র কারণ। বিধর্ম্মী রাজা

আমাদের ধর্ম্মোন্নতির আনুকূল্য করিলে তাঁহার উদারতা প্রকাশ পায়, না করিলে রাজধর্ম্ম পালনের ত্রুটী হয়, অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার যে কর্ত্তব্য তিনি তাহা পালন না করিলে তিনিই অধর্ম্মের ভাগী, তিনি তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিবেন, তাহাতে আমাদের কিছু আইসে যায় না, আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে আপনারা পরাম্মুখ হইলে বিষম ক্ষতি। সে ক্ষতি ইহলোকে, পরলোকে সহ্য করিতে হইবে। অতএব যিনি হিন্দুর শোণিতশুক্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুনামে পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহারই কর্ত্তব্য পরম পবিত্র এবং পিতা পিতামহাদি পূজিত হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার ও নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করেন। হিন্দু হইয়া অহিন্দুর ন্যায় কার্য্য করিলে অপরের ঘৃণার সামগ্রী হওয়া অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে?

পৃথীর সকল জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাদের পুরান ইতিহাস ও ধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে কেহই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহে। খৃষ্টানকে অখৃষ্টান, মুসলমানকে কাফের বলিয়া পরীক্ষা কর, তোমার প্রাণ বাঁচান ভার হইবে, তখন তোমার চৈতন্য জন্মিবে, তখন তুমি জানিতে পারিবে অন্য জাতি আপন ধর্ম্মে কতদূর শ্রদ্ধাবান। তাহারা তাহাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাণের আদর অধিক কোন মতেই করিবে না। তবে তুমি এত ক্ষুদ্রাশয় কেন? কিসের জন্য তোমার মনের এত সঙ্কীর্ণতা? ইংরেজের খাবার খাইয়া, ইংরেজের বসনভূষণে অঙ্গ আবৃত করিয়া কোন্ কালে তাঁহাদের নিকট সমাদর পাইয়াছ? যাঁহাদের অনুকরণ করিবার

জন্য তোমরা এত ব্যাকুল, তাঁহারা ত' তোমাদের অনুকরণ-প্রিয়তার জন্য লাঞ্ছনা করিতে ত্রুটী করেন না? তবে এ নিগ্রহ কেন? পূর্ব্ব পুরুষের সরল পথে চল, সে পথে তোমাদের সমস্তই আছে—বীরত্ব, ধীরত্ব, গাম্ভীর্য্য, সভ্যতা, ভব্যতা সকলেই আছে।

তাঁহারাও একদিন স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাদেরও নাম এক কালে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইত, তাঁহাদেরও রীতি নীতি এককালে অন্যান্য জাতির অনুকরণীয় ছিল। তবে কেন সেই পবিত্র কুলের কুলাঙ্গার নামে আপনাদিগকে কলঙ্কিত কর? কেন সেই পূর্ব্ব পুরুষের আত্মাকে বিড়ম্বিত ও অপমানিত কর? কেন তাঁহাদের শোণিত শুক্রের অপব্যবহার কর? হিন্দু হইয়া যাহাতে হিন্দুত্ব বজায় করিয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতে পার তাহার জন্য প্রস্তুত হও। হিন্দুর রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অভ্রান্ত-জ্ঞানে শিরোধার্য্য কর, নতুবা আর নিস্তার নাই। ঘৃণা ও উপ-হাসের টিট্‌কিরি অর ভাল লাগে না। লজ্জায় অধোবদন থাকিতে হয়। অতএব মনস্বিতা অবলম্বন কর, হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য সেই সকল প্রতিপালন করিয়া জননী জন্মভূমি ও স্বধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল কর। দেখ দেখি তাহাতে মন কতটা প্রসস্ত ও পবিত্র হয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অশৌচ গ্রহণবিধি।

প্রাচীন আর্য্যগণ অবধারিত করিয়াছেন যে, আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ব অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে কতক গুলির সহিত আমরা এরূপ ঘনিষ্ঠ, তাঁহাদের সহিত আমরা যেমন বৈষয়িক তেমনি শারীরিক সম্বন্ধে এত নিকট সম্পর্কিত যে, তাঁহাদের জন্ম মরণে আমাদের দেহাশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

অশৌচাবস্থায় সন্ধ্যাহ্নিক কার্য্যে অধিকার থাকে না। এজন্য কতদিন, কি নিয়মে, এবং কোন্ আত্মীয়ের জন্য কিরূপে অশৌচ গ্রহণ করা শাস্ত্রসঙ্গত তাহা সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক।

দুই বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে যে বালকের মৃত্যু হয় তাহার দাহাদি না করিয়া মৃত্তিকাস্যাৎ করিবে।

অশৌচ যদ্যপি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হয়, তবে পূর্ব্ব দিবস লইয়া গণনা করিবে। অশৌচ নিশ্চয় না হইলে অশৌচ হয় না। অশৌচের মধ্যে যদি জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে শেষে যে কয়েক দিন থাকে তাহাই পালন করিতে হয়। অশৌচ-কালান্ত সম্বৎসরের জ্ঞাত হইলে, সপিণ্ডবর্গের তিন দিবসাশৌচ, সম্বৎসরান্তে দুই বৎসরের মধ্যে জ্ঞাত হইলে, সপিণ্ড বর্গের সদ্যাশৌচ মাত্র, আর পুত্রাদির ১ দিবস দুইবৎসরের পর শ্রবণ করিলে রাত্রি মাত্র, স্বীয় পুত্র জন্মাশৌচ শ্রবণ করিলে স্নান মাত্র শুদ্ধ হয়।

জন্ম মরণে ব্রাহ্মণের ১০ দিবসাশৌচ, ক্ষত্রিয়ের ১২দিবস, বৈশ্যের ১৫ দিবস ও শূদ্রের একমাস। পণ্ডিতের জন্ম মরণে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। সর্ব্ব বর্ণের সপিণ্ডানন্তর দশম পুরুষ পর্য্যন্ত ৩ দিবস, দশম পুরুষান্তর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিনী, (বর্ত্তমান দিবস এবং আগামী রাত্রি দিবস সহিত ১২ প্রহরের নাম পক্ষিনী), চতুর্দ্দশ পুরুষানন্তর নাম স্মৃতি পর্য্যন্ত ১ দিবস অন্তরে স্নানে শুদ্ধি।

মাতামহ মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ, শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ী আপনার নিকট মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, গ্রামে বা গ্রামান্তরে মরিলে এক রাত্রি শৌচ, কিন্তু ব্যবহার ত্রিরাত্রাশৌচ। বিবাহিতা ভগিনী এবং মাতামহী, মাতুল মাতুলানী, পিতৃস্বসা অর্থাৎ পিতার ভগিনী এবং দৌহিত্র ও ভাগিনেয়াদি মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হয়, কিন্তু মাতামহী মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ ব্যবহার, পরন্তু মাতৃভগিনীপুত্র ও মাতুল মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হয়।

অনশনে, বজ্রঘাতে, অগ্নিতে, জলেতে, উচ্চদেশ হইতে পতনে, সংগ্রামে, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, নখী, ব্যাল অর্থাৎ হিংস্র জন্তু, বিষ, চণ্ডাল, চোর কর্ত্তৃক যদি প্রমাদে মৃত্যু হয়, তবে সর্ব্ববর্ণের ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। পরন্তু অগ্ন্যাদিতে প্রাণত্যাগ করিব এই অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তি মরে অর্থাৎ আত্মঘাতী হয়, তাহার অশৌচ নাই।

জন্মাবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত অকৃত চূড়াকন্যা মরণে সর্ব্ববর্ণের সাদ্যাশৌচ মাত্র। বিবাহের পর কন্যার মৃত্যু হইলে ভর্ত্তাকুলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। অজাতদন্তা কন্যা মরণে সোদরে

সদ্যাশৌচ মাত্র, জাত দন্তা কন্যা মরণে এক রাত্রাশৌচ, চূড়া হইলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়।

দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত উপনীত বালকের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রাশৌচ। উপনীত বালক মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ। শূদ্রের ছয় মাস পর্য্যন্ত যদি চূড়া দন্তোৎপত্তি না হইয়া থাকে তবে তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ। ইহার মধ্যে দন্তোৎপত্তি হইলে ৫ দিবস, এবং দুই বৎসরের চূড়া হইলে ১০ দিবস এবং বিবাহ হইলে এক মাস শৌচ হয়। ছয় মাসের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত শূদ্র বালক মরিলে ৫দিন অশৌচ হয়। দুই বৎসরের পর ৬ বৎসর পর্য্যন্ত ১২ দিবস অশৌচ হয়।

দুই মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে সেই স্ত্রীর রজস্বলাশৌচ হয় কিন্তু অন্যের হয় না। ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে সেই স্ত্রীর অশৌচ হয়। ৮ মাসের মধ্যে যদি গর্ভস্রাব হয় তবে সেই স্ত্রীর স্বজাত্যাশৌচ হয়। সপিণ্ডদিগের সদ্যাশৌচ মাত্র কিন্তু ব্যবহার একাহ। ক্ষত্রিয়ের দুই দিন, বৈশ্যের তিন দিন, শুদ্রেরও ৩ দিন অশৌচ বিধি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

অতিপাতক মহাপাতক উপপাতকাদির ক্ষয় জন প্রাজাপত্যাদির ব্রত করিতে হয়। কিন্তু কলিযুগে মানবদিগে

শক্তির অল্পতাপ্রযুক্ত প্রাজাপত্যাদি কঠিনসাধ্য ব্রত করিতে পারিবে না। একারণ ধেনুদান শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। যদি ধেনু দান করিতে অশক্ত হয় এমত অনাঢ্য ব্যক্তি ধেনুর তুল্য মুল্য দিবে।

সত্যযুগে ব্রত করিবার আদেশ, ত্রেতাযুগে ধেনু দানের আদেশ; দ্বাপরযুগে কৃচ্ছ্র ব্রতের আদেশ, কলিযুগে সকলের পক্ষেই ধেনুর মূল্য দান করিতে আদেশ বিধান আছে।

প্রাজাপত্যাদি ব্রত করিতে অশক্ত হইলে প্রভূত দুগ্ধবতী ধেনুদান করিবে, ধেনু অভাব হইলে ধেনুর তুল্য মূল্য দিবে।

যে ব্যক্তির বয়স আশী বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, আর যে বালকের বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই এবং স্ত্রী অথবা রোগী এ সকল ব্যক্তিকে ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক করিতে হইবে।

যদি কেশ নখাদি ধারণ করিবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে হইবে।

বিদ্বান, ব্রাহ্মণ বা রাজা অথবা স্ত্রীলোক ইহাদিগের মহাপাতক ও গোহত্যাদি ব্যতিরেকে মস্তক মুণ্ডন নাই। সধবা স্ত্রীর সমগ্র কেশ একত্র করিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমাণে ছেদন করিবে, এবং স্ত্রীলোকের পদানুগমন জপাদি ও গোষ্ঠে শয়ন গো চর্ম্ম পরিধানাদি নাই এবং বিধবারও নাই।

এক পাদে পাপে গাত্র লোম মুণ্ডন, দ্বিপাদে গোঁপ দাড়ি মুণ্ডন, ত্রিপাদে শিখা রাখিয়া শিরোমুণ্ডন, চতুর্থ পাদে শিখার সহিত মস্তক মুণ্ডন করিবে।

কালাতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে দ্বিগুণ করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কাল সংখ্যা এক বৎসর। যদি ঐ সময়ের মধ্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে না পারে তবে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এবং পর পর যতকাল অতিক্রম হইবে বৎসর সংখ্যায় ততগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ব্রাহ্মণের গাভী ব্রাহ্মণ কর্তৃক জ্ঞানকৃত বধ হইলে হন্তাকে ১৭ প্রাজাপাত্য করিতে হইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ২৭ ধেনুদান, তদভাবে একান্ন কাহন বরাটক দান করিবে, আর ১৫ কাহন বরাটক দক্ষিণা দিবে।

গোহন্তা ব্যক্তি গোমূত্রে যবের যাউ করিয়া পান করিবে। গোচর্ম্মে শরীর সংবৃত করিয়া গোষ্ঠে বাস করিয়া থাকিবে। দিবসের চতুর্থভাগে অক্ষার লবণ **অর্থাৎ** অকৃত্রিম লবণমিত গ্রাস গ্রহণ করিবে। দুই মাস গোমূত্রে স্নান আর সংযতেন্দ্রিয়বান হইবে। দিবসে গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোষ্ঠে যাইবেক, দণ্ডায়মান হইয়া গোরজ পান করিবে, সায়ংকালে গোর সহিত গৃহে আসিয়া গোর শুশ্রূষা করিয়া নমস্কার করিবে, এবং রাত্রিতে গোশালায় বীরাসনে বসিয়া থাকিবে, এবং আত্মাভিমান শূন্য হইবে। গো সকল উঠিলে উঠিবে বসিলে বসিবে, চলিলে চলিবে কোনমতে অতুরা না হয়। সর্ব্বদা চৌর বা ব্যাঘ্রাদি ভয়ে রক্ষা করিবে। পতিত বা পঙ্কমগ্না গোকে আপনার সমস্ত শক্তির দ্বারা পরিরক্ষা করিবে এবং গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা বা অতিবাতে গোরক্ষা না করিয়া আপনার রক্ষা করিবে না। আপনার কি অপরের ক্ষেত্রে বা গৃহে শস্যাদি ভক্ষণ করিলে কথাটিও কহিবেনা। অসময়ে বৎস যদি দুগ্ধ পান করে তাহা দেখিয়াও নিষেধ

করিবে না। এই নিয়মে গোহন্তা যদি গোরুর অনুগমন করে, তবে তিন মাসে গোহত্যা পাপ হইতে সে ব্যক্তি পরিমুক্ত হয়, ইহাতে অশক্ত হইলে সপ্তদশ ধেনুদান, এক বৃষ সহিত দশ গো দক্ষিণা দিবে। ধেনুদানে অশক্ত (১৫) কাহন দক্ষিণা (৫১) কাহন করিবে; ইহাতে অশক্ত ব্যক্তি বেববৎ পণ্ডিতকে সর্ব্বস্ব দান করিবে।

জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয় স্বার্থিক গো যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা বধ করে, তবে দ্বাদশ প্রাজাপত্য, অজ্ঞানকৃত বধে ছয় প্রাজাপত্য এবং স্ত্রী, শূদ্র, বাল, বৃদ্ধ, রোগীরাও ছয় প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। একাদশ বর্ষ বালক অথবা একে উভয়ত্ব ঘটিলে অর্থাৎ শূদ্র বালক, শূদ্র বৃদ্ধ, শূদ্র রোগী, অথবা ব্রাহ্মণ বালিকা স্ত্রী রোগীণী বা বৃদ্ধা এবং বৃত্ররোগী ইহাদিগের যথোক্ত বিধানের একপাদ প্রায়শ্চিত্ত যথাশক্তি দক্ষিণা। অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধে ৩৬ কাহন দান, অজ্ঞানকৃতে ১৮ কাহন দান। স্ত্রী শূদ্রাদিও ঐরূপ শূদ্র স্ত্রী আদির ৯ কাহন দান মাত্র, দক্ষিণার নিয়ম নাই শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিবে। পূর্ব্ব ব্রাহ্মণস্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্তে রূপান্তর কিঞ্চিৎ হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদি স্বামিক গো বধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র লিখিতেছি।

বৈশ্যস্বামিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গো বধ করিলে গোমতী বিদ্যা জপ করতঃ গোষ্ঠে বাস এবং পঞ্চগব্য পান করিয়া থাকিবে, এইরূপ একমাস করিলে গোহত্যা পাপে পরিমুক্ত হইবে। তাহাতে অশক্ত হইলে দশ ধেনুদান যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিবে, তদভাবে ৩০ কাহন বরাটক। অজ্ঞানকৃতে ১৫ কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে স্ত্রী শূদ্রা-

দি'রও অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং একাদশ বর্ষ বালকেরাও প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সর্ব্বত্রই অজ্ঞানকৃতে জ্ঞানকৃতের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবস্থাপত্র ও পত্রদান দক্ষিণা বাক্যও জানিবে।

যৎপ্রমাণে গোময় লইবে তাহার দ্বিগুণ গোমূত্র, গোমূত্রের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের অষ্টগুণ দধি এই পঞ্চগব্য পান করিবে।

শূদ্রের গো যদি ব্রাহ্মণাদিরা জ্ঞান পূর্ব্বক বধ করে, তবে চারি প্রাজাপত্যে শুদ্ধ হইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে চারি ধেনু দান করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। তদভাবে ১২কাহন বরাটক, অজ্ঞানকৃতে ৬কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে। উভয়স্থ ঘটিলে একাদশ বর্ষ বালক একপাদ অর্থাৎ ৩ কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে।

রোগাদি জন্য যে গো ক্ষীণ হইয়াছে তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া রোধ করিয়া রাখে, সেই রোধ নিমিত্ত যদি মরে তবে প্রাজাপত্যের একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ ১২ পণ উৎসর্গ করিবে।

ঐ ক্ষীণ গোকে যদি বন্ধনে রাখে ও তাহাতে মরে তবে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ১০ কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে।

এবং ক্ষীণ গোকে যদি হলাদিতে যোজন করে, যদি সেই যোজন নিমিত্ত বধ হয়, তবে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ২০ কাহন উৎসর্গ করিবে।

যদি দন্ত নিপাতন জন্য মৃত্যু হয় তবে পূর্ণ প্রাজাপত্য অর্থাৎ ৩ কাহন বরাটক দান করিবে দক্ষিণা যৎকিঞ্চিৎ।

গোর নাসাচ্ছেদ কর্ণচ্ছেদ গাত্রদাহ ও বন্ধন করিয়া রাখিলে এবং অতি বাহন অতি দোহণে যদি মৃত্যু হয়, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, তদসত্ত্বে ২২॥০ কাহন বরাটক উৎসর্গ করিবে, স্ত্রী শূদ্রাদির অর্দ্ধেক। অতি বালাদির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাদিও পূর্ব্ববৎ হয়।

শীত অথবা বায়ু দ্বারা কিম্বা উদ্বন্ধনে বা শূন্য গৃহে রাখাতে যদ্যপি মৃত্যু হয়, তবে এক প্রাজাপত্য করিবে, আর অপালনে যদি মরে এবং জলে সর্প দংশিলে কি বিদ্যুদগ্নি দ্বারা অথবা গর্ত্তে পড়িয়া মরে কিম্বা ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তবে আর এক প্রাজাপত্য করিবে। এক বৃষ এক গো দক্ষিণা দিবে এই দুই প্রাজাপত্য করিতে অশক্ত হইলে ৬কাহন বরাটক দক্ষিণা দিবে, অর্থাৎ গো মূল্য ১ কাহন, বৃষ মূল্য ৫ কাহন দিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আহার ব্যবহারাদি।

প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহানি, দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণে দারিদ্র্য, তৃতীয়ায় পটোল খাইলে শত্রুবৃদ্ধি, চতুর্থীতে মূলা ভক্ষণে ধননাশ, পঞ্চমীতে বেল খাইলে কলঙ্ক, ষষ্ঠীতে নিম্ব ভক্ষণ করিলে পশুযোনি প্রাপ্তি, সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে শরীর নাশ, অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে বিদ্যা-

হানি, নবমী তিথিতে অলাবু তুল্য, দশমীতে কলম্বীও উক্ত রূপ, একাদশীতে শীম ভক্ষণে মহাপাপ, দ্বাদশীতে পুতিকা শাক ভক্ষণে ব্রহ্মহত্যার পাপ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু ভক্ষণে পুত্রনাশ, চতুর্দ্দশীতে মাসকলাই ভক্ষণে চিররোগীত্ব, এবং পূর্ণিমা ও অমাবশ্যাতে মাংস ভক্ষণে মহাপাপ জন্মে।

ক্ষৌরকর্ম্ম নিষেধ কাল।—জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম্ম একবারে নিষিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন প্রথম অষ্টম দিনে ক্ষৌর কর্ম্ম পরিহার্য্য, কেহ কেহ বলেন প্রথম দশ দিন নিষিদ্ধ।

বৃহস্পতিবারে ক্ষৌরকার্য্য করিলে মানহানি, শুক্রবারে পুত্রনাশ, রবিবারে ধনহানি, মঙ্গলে আয়ুক্ষয়, শনিবারে ধন পুত্র বিনাশ হইয়া থাকে। জন্মবারে ক্ষৌর কার্য্য করা একবারে নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন রাত্রি, সন্ধ্যা, দশমী, দ্বাদশী, পৌর্ণমাসী তিথিতে বিশেষ নিষেধ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও রাজাজ্ঞায় বিবাহের পঞ্চম বা অষ্টম দিবসান্তে অশৌচান্ত দিবসে, অথবা কারামুক্ত হইবার দিনে ক্ষৌর কর্ম্মে কোন দোষ হয় না। ঐ সকল দিবসে ক্ষৌর কার্য্য নিষিদ্ধ হইলেও তাহাতে কোন প্রত্যবায় ঘটে না।

অনেকে মনে করিতে পারেন আমাদের দেশের ব্যবস্থা-শাস্ত্রপ্রণেতাগণ উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন, নতুবা এরূপ আজগুবী ব্যবস্থা প্রণয়ণে হিন্দুদিগের মন ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন করিয়া গয়াছেন কেন? বাস্তবিক এরূপ মনে করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আইসে না। যখন দেখা যাইতেছে অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে আমাদের শরীর স্বভাবতঃ আদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য অনেকে

। ঐ দিবসে শুষ্ক ও লঘুপাক দ্রব্য আহার করেন, তখন বশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত ানব প্রকৃতির শীতোষ্ণতা এবং এই ভূলণ্ডলস্থ যাবতীয় াদার্থের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। অতএব সেই সেই তিথিতে দ্রব্যবিশেষ যে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের বিরোধী হইবে তাহা সন্দেহ করা যাইতে পারে না। আমা-দের দেশের শাস্ত্রপ্রণেতাগণ বিলক্ষণ সুদূরদর্শী ছিলেন, তাঁহাদের এই সকল কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা যায়। আজি পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন শাস্ত্রকার এতদূর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই।

সিল্পাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গলাবন্ধ বুনা।

বিন্দুবাসিনীর পিতা সে কালের টোলের ভট্টাচার্য্য। যদিও তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন, একটু ইংরেজী জানিতেন, কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামের লোক, আবার আজি কালিকার কালের নয়। বঙ্গদেশ এখন উন্নতির মুখে প্রবল বেগ প্রবাহিত হইতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছ, আজি তাহার বিপরীত দেখিবে। কি গৃহস্থ গৃহে, কি সমাজে, কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি আচার ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতে পাইবে। সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সময়ে আপন কন্যা বিন্দুবাসিনীকে সাংসারিক ব্যবহারে শিক্ষিতা করেন, সে সময়ে পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্প শিক্ষার এতটা আদর ছিল না। এজন্য বিন্দুকে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সে সকল শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। বিন্দুর ননন্দা "সুরবালা" এই সকল কার্য্যে সুশিক্ষিতা ছিলেন, তিনি সকালে বৈকালে বিন্দুবাসিনীকে কাছে বসাইয়া নানা প্রকার শিল্প কার্য্য শিখাইতেন। প্রথম

দিন স্থুরবালা বিন্দুকে গলাবন্ধ বুনিবার বিষয় শিক্ষা দিতে বসিলেন।

সুর। দেখ বৌ, কি কি রঙ্গের পশমে গলাবন্ধ বুনিলে ভাল দেখায় অগ্রে তোমাকে তাহাই বলি তাহার পরে আর আর কথা বলিব।

বিন্দু। আচ্ছা ভাই, পশম কোথায় পাওয়া যায়?

স্থুর। পশম বিলাত হইতে আইসে, আজিকালি আমা-দের দেশের প্রায় সকল বাজারেই কিনিতে পাওয়া যায়।

বিন্দু। তার পর কি বলিবে বল।

সুর। শুধু সাদা, পাংশুটে, কটা বা সাদাতে কালতে, সাদায় নীলে, সাদায় বেগুনে, পাংশুটে নীলে, কিম্বা একটু সাদা একটু নীল, একটু বেগুনীতে আর সাদায় ও ফিকে গোলাপীতে বা সাদা লালে বুনিলে ভাল দেখায়।

বিন্দু। এখন কিরূপে বুনিতে হয় তাহা বল।

স্থুর। যত বড় গলাবন্ধ বুনিবার দরকার তত বড় করিয়া বুনিতে হইলে, সাধারণতঃ যত ঘর নিতে হয় তাহার দ্বিগুণ বড় যাহাতে হয় সেই আন্দাজে ঘর নিতে হইবে। ঘরের সংখ্যা এত হওয়া চাই যে, যেন সেই সংখ্যাকে ১৩ দিয়া ভাগ করিলে ২ বাকী থাকে। ঘর লওয়া হইলে প্রথমে ৮ লাইন সোজা বুনিতে হইবে।

প্রথম লাইন।—২টা ঘর সোজা, (*) ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা। এই যে দুইবার দুইটা ঘর এক সঙ্গে সোজা বুনা হইল, ইহাতে দুইটা ঘর কমিয়া যাওয়াতে এবার ঘর বাড়াইবার জন্য সম্মুখে পশম আনিয়া ১টা ঘর সোজা

এইরূপে আরও তিনবার পশম সম্মুখে আনিয়া ৩টা ঘর সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, আর ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ১টা ঘর সোজা, পুনরায়(*)এই চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

দ্বিতীয় লাইন।—প্রথমে ৪টা ঘর উল্‌টা, ও একবারে শেষে ৪টা ঘর উল্‌টা, মধ্যে ক্রমাগত ৭টা ঘর সোজা ও ৬টা ঘর উল্‌টা বুনিতে হইবে।

তৃতীয় লাইন।—সোজা বুনিতে হইবে।

চতুর্থ লাইন—উল্‌টা বুনা চাই।

পুনরায় প্রথম লাইন হইতে আরম্ভ কর। এইরূপ বুনিতে বুনিতে যখন যতটা লম্বা দরকার ততটা লম্বা হইবে, তখন ৮ লাইন সোজা বুনিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে। মুখ বন্ধ করা হইলে ইহার সোজা দিকটা বাহিরে রাখিয়া লম্বা দিকে ঠিক দুপুরু করিয়া ভাঁজিবে। যত চৌড়া ছিল ইহাতে ঠিক তাহার অর্দ্ধেক হইবে। ভাঁজ করা হইলে ইহার দুইধার বরাবর এক সঙ্গে কার্পেটের ছুঁচ ও যে রঙ্গের পশম দিয়া বুনা হইয়াছে সেই রঙ্গের চেরা পশম দিয়া জুড়িয়া যাইতে হইবে এবং অন্য গলাবন্দের দুইদিকে যেরূপ ঝালর দিতে হয় সেইরূপে ঝালর দিতে হইবে, তাহা হইলেই দেখিবে যে সুন্দর একটী দোহারা গলাবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছে।

মোজা বুনা।

সুর। দেখ বৌ, আজি তোমাকে মোজা বুনা শিখাইব।

বিন্দু। গলাবন্ধ অপেক্ষা মোজা বুনা কি শক্ত?

সুর। না—তেমন বিশেষ কষ্ট কিছু হবে না, কেন না

একটা শিখা হ'য়েছে, কিন্তু একেবারে অধিক শিখ্‌তে হ'লে কষ্ট বোধ হয় তার আর সন্দেহ কি।

বিন্দু। তবে আজ দেখা যাক্‌ কত শিগ্‌গির মোজা বুনা শিখ্‌তে পারি।

সুর। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য যে মোজা প্রস্তুত করা যায়, তাহা যত ফিকে রঙ্গে হয় ততই ভাল। এজন্য সাদাতে ফিকে নীলেতে, সাদাতে ফিকে গোলাপীতে, বা সাদাতে ও ফিকে লালেতে বুনা যায়।

এইরূপ মোজা বুনিতে খানিকটা ফিকে লাল এবং খানিটা সাদা পশম চেরা এবং পাঁচটা হাড়ের কাঁটার দরকার।

প্রথমে লাল পশম দিয়া ৯৬ টা ঘর তোল। এই ঘর গুলি সমান চারি ভাগে ভাগ করিয়া আরও ৩টা কাঁটায় তুলিয়া লও, তাহা হইলে এক একটা কাঁটায় ২৪টা করিয়া ঘর দাঁড়াইবে। ৪টা কাঁটা দিয়া বড় মোজা যেরূপে বুনে, এই মোজাও সেইরূপে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হয়। কিন্তু ইহাতে ৫টা কাঁটার দরকার, কারণ ইহার ৪টা কাঁটায় ঘর লইতে হয়, আর একটা কাঁটা দিয়া বুনিতে হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার।—লাল পশম দিয়া উল্‌টা বুনিবে।

তৃতীয়বার।—সাদা পশম দিয়া সোজা বুনিবে।

চতুর্থবার।—সাদা পশম দিয়া (*) পশম সম্মুখে আনিয়া, ৪টা সোজা ১টা সোজা, ৩টা সোজা, তিনটা এক সঙ্গে সোজা। আবার (*) এইরূপ চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

৫ বার।—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা; ৪ বারে যেখানে

যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে, এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে।

৬ বার।—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা; কেবল ৫ বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৭ বার।—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা, কেবল ৬ বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৮ বার।—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা। এখন একবার দেখা আবশ্যক কতগুলি ঘর আছে, কারণ যদি ৪৮টা ঘর থাকে তাহা হইলে ঠিক হইয়াছে নতুবা ভুল।

৯ বার।—লাল পশম দিয়া সোজা।

১০ বার।—লাল পশম দিয়া উল্‌টা।

১১ বার।—লাল পশম দিয়া উল্‌টা।

১২ বার।—সাদা পশম দিয়া সোজা।

১৩ হইতে ৩০ বার।—সাদা পশম দিয়া একটা ঘর উল্‌টা একটা ঘর সোজা।

৩১ বার।—লাল পশম দিয়া সোজা।

৩২ হইতে ৩৩ বার।—লাল পশম দিয়া উল্‌টা।

৩৪ বার।—সাদা পশম দিয়া সোজা।

৩৫ বার।—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত পশম সম্মুখে আনিয়া ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা।

৩৬ বার।—লাল পশম দিয়া সোজা।

৩৭ ও ৩৮ বার।—লাল পশম দিয়া উল্‌টা।

৩৯ হইতে ৪৭বার।—লাল পশম দিয়া একবার ১টা উল্টা, আর একটা উপর দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে, আবার তাহার পরের বারে পূর্ব্বে যেখানে উল্টা সেখানে উপর দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে, আর যেখানে উপর দিয়া উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে উল্টা।

এখন পায়ের পাতার জন্য ১৮টা ঘর একটা কাঁটাতে উঠাইয়া লও এবং বাকি ৩০টা ঘর দুইভাগ করিয়া দুইটা কাঁটায় তুলিয়া রাখ।

এতক্ষণ যেরূপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হইয়াছে, পায়ের পাতার জন্য সেরূপে হইবে না, এখন দুইটা কাঁটা দিয়া বুনিতে হইবে।

৪৮ বার।—লাল পশম দিয়া সোজা।

৪৯ বার।—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৫০ বার।—লাল পশম দিয়া সোজা।

৫১ বার।—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত একটা সোজা একটা উল্টা।

৫২ বার।—লাল পশম দিয়া সোজা।

৫৩ বার।—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত একটা উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে, আর উল্টা বুনিতে হইবে।

৫৪ বার।—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত ১টা উল্টা ১টা সোজা।

সাদা পশম দিয়া ৫৫ হইতে ৮২ বার পর্য্যন্ত।—৫১ বার হইতে ৫৪ বার পর্য্যন্ত যেরূপে বুনা হইয়াছে ঠিক সেইরূপে বুনিতে হইবে।

৮৩ বার।—সাদা পশম দিয়া ৫১ বারের মত।

৮৪ বার।—২টা এক সঙ্গে উল্টা, একটা সোজা ১টা উল্টা, একটা সোজা ১টা উল্টা, ১টা সোজা ১টা উল্টা, ১টা সোজা ১ টা উল্টা, ১টা সোজা ১টা উল্টা, ১টা সোজা একটা উল্টা, ১টা সোজা ১টা উল্টা, দুইটা এক সঙ্গে সোজা।

৮৫ বার।—সাদা পশম দিয়া ২টা এক সঙ্গে উল্টা, ১টা সোজা ১টা উল্টা, ১টা সোজা ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা, ১টা উল্টা ১টা সোজা, ১টা উল্টা ১টা সোজা, ১টা উল্টা ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৬ বার হইতে একবারে শেষ পর্য্যন্ত লাল পশম দিয়া।

৮৭ বার।—১টা সোজা ২টা উল্টা, ১টা সোজা ২টা উল্টা, ১টা সোজা ২টা উল্টা, ১টা সোজা ২টা উল্টা, ১টা সোজা।

৮৮ বার।—২টা এক সঙ্গে সোজা, ১টা সোজা ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৯ বার।—২টা এক সঙ্গে উল্টা ১টা সোজা, ২টা উল্টা ১টা সোজা, ২টা উল্টা ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে উল্টা।

৯০ বার।—২টা এক সঙ্গে উল্টা, ২টা সোজা ১টা উল্টা, ২টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে উল্টা।

৯১ বার।—২ টা একসঙ্গে সোজা, ৩টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৯২ বার।—২ টা এক সঙ্গে সোজা ১টা সোজা ২ টা এক সঙ্গে সোজা।

৯৩ বার।—৩ টা একসঙ্গে সোজা।

৯৪ বার।—যে ঘরটা আছে তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে।

এখন পায়ের পাতার দুইধারের ঘর গুলি বেশ করিয়া ২ টা কাঁটায় তুলিয়া লও। পূর্ব্বের যে ৩০টা ঘর দুটা কাঁটায় উঠান আছে, সেই দুই কাঁটার ঘর এবং এখনকার দুই কাঁটার ঘর সমস্ত একত্রে আবার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ১৬ খানি ক্রমাগত ১ বার সোজা ১ বার উল্টা বুনিতে হইবে।

১৭ বার সোজা, কেবল গোড়ালির শেষ ভাগের ঘর দুই বার দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে, কারণ গোড়ালির দিকের ঘর ১৫ টা ১৫ টা করিয়া দুই কাঁটার আছে।

১৮ বার উল্টা বুনিতে হইবে।

১৯ বার সোজা, কেবল ১৭ বারে যেখানে যেখানে দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে ২ টা এক সঙ্গে সোজা।

২০ বার উল্টা বুন।

এখন ক্রমাগত ৮ লাইন সোজা, কিন্তু পূর্ব্বে গোড়ালির শেষ দিকে যেরূপ দুইবার করিয়া দুইটা একসঙ্গে সোজা, বুনিয়া ঘর কমাইতে হইয়াছিল, এবারেও ঠিক তার উল্টাদিকে অর্থাৎ পায়ের পাতার দুই ধারের ঘর গুলি যে দুই কাঁটায় আছে, এক লাইন অন্তর সেই দুই কাঁটারই একেবারে শেষ দিকের দুইটা ঘর এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে। এইরূপে বুনা হইলে পর মোজার উল্টা দিকে অন্য মোজারও যেরূপ মুখবন্ধ করিতে হয়, এই মোজারও সেই রূপ করিতে হয়।

এখন ৩৫ ও ৩৬ বার বুনাতে মোজার যে ফাঁক ফাঁক ঘর হইয়াছে, সেই ঘরের ভিতর দিয়া যে পশম দিয়া মোজা বুনা হইয়াছে, সেই সেই পশম একত্রে পাকাইয়া তাহার দুই ধারে

দুইটা পশমের থোপ করিয়া দিতে হইবে। এই থোপও যেযে পশমের মোজা সেই সেই পশম দিয়া করিতে হইবে।

কাটাপোসাকের মাপ।

কোট চাপকান প্রভৃতির মাপ লইতে হইলে মেরুদণ্ডের উর্দ্ধশেষে যে অস্থিখণ্ড উন্নত ভাবে আছে, সেই খানা হইতে যে কোন হস্তের মূল ও দুইটী হাত সহজতঃ লম্বমান করিলে কনুই যেরূপ বক্র থাকে তদবস্থায় কনুইএর উপর দিয়া কব্‌জি পর্য্যন্ত একটী মাপ, গলার একটী, বক্ষঃস্থল ও নাভিস্থল হইতে কটী-দেশের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একটী—সাধারণতঃ এই তিনটী মাপ লইতে হয়, এবং এইরূপে কাপড় কাটীয়া কামিজ কোট ও চাপকান সকলেই সেলাই করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কেবল যে সকল পিরানের পৃষ্ঠে সেলাই থাকে না, তাহাদের জন্য হস্তের মাপ এবং পৃষ্ঠদেশের মাপ পৃথক লইতে হয়।

জাতপ্রকরণ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ উপদেশ।

জীবসৃষ্টি বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি একথা অবিসাংবাদিতরূপে স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষের সহযোগে সন্তানোৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তাহাদিগের শারীরিক কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য শরীর লাবন্যময় স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট, ও মন সাধারণতঃ প্রফুল্লতা লাভ করে।

স্ত্রীলোকের যৌবন চিহ্ন।--তলপেটের অস্থী সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, কঁচকির স্থান বিস্তৃত, স্তনযুগল উন্নত, জঙ্ঘা ও নিতম্ব স্থূল, গর্ভ, স্তন ও যোনির সহিত পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও হস্তের পূর্ণতা জন্মে, সমস্ত শরীর অপেক্ষাকৃত মাংসল, পূর্ণ ও বৃহৎ হয়, দৃষ্টির চাঞ্চল্য জন্মে, কামেন্দ্রিয়ের সহিত যে যে স্থানের সম্বন্ধ আছে সেই সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে কেশোদ্গম হয়। স্বরের মিষ্টতা ও গাম্ভীর্য্য জন্মে। সর্ব্ব শরীর সতেজ ও সৌন্দর্য্যময় হয়। এই

সময়ে নানা প্রকার সুখেচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল বালিকা স্বভাবতঃ বিলাসবতী ও নগরে বাস করেন, মাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করা যাঁহাদের অভ্যাস, যাঁহারা নাটক উপন্যাস পাঠ করেন, সঙ্গদোষবশতঃ ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করিতে শিক্ষা করেন, তাঁহাদের অল্প বয়সেই যৌবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং প্রস্রাব দ্বার দিয়া রক্তস্রাব দেখা দেয়। এইরূপ অকাল যৌবন নানা প্রকার অনিষ্টের হেতুভূত। ইহা দ্বারা অল্প বয়সেই বার্দ্ধক্যের লক্ষণ সমুদায় দেখা দেয়, নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিও জন্মিয়া থাকে।

পুরুষের যৌবন চিহ্ন।—বালক যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে তাহার বালকত্ব দূরীভূত হয়, গাত্র চর্ম্ম মাংসপেশী সমুদায় দৃঢ়, কণ্ঠস্বর কর্কশ, এবং অস্থিগুলি কঠিন হয়। শরীরের অনেক স্থান লোমাবৃত হইতে থাকে এবং জননেন্দ্রিয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গমুখ দিয়া শুক্র (ধাতু) ক্ষরিত হইতে থাকে। তাহাতে সুখানুভূতি হয়, এজন্য অনেক বালকই কৃত্রিম উপায়ে শুক্রপাতের প্রয়াস পায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত অবৈধ। যে সকল অবোধ বালক ক্ষণিক আমোদের জন্য এই বিষম অনর্থকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ভোগ করিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। হস্তমৈথুনে যেসকল বালকের আশক্তি আছে, তাহাদিগের প্রায়ই ফুসফুসের পীড়া, স্বর ভঙ্গ, স্মৃতিশক্তির হানি ও উন্মাদি রোগ জন্মে। এই সকল রোগ কিছুতেই ভাল হইবার নহে। এজন্য যৌবনের প্রারম্ভে কামবৃত্তি যাহাতে উত্তেজিত হইতে না পায় তাহার বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত। তজ্জন্য

সকলেরই নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং লিঙ্গাগ্রের ত্বক সরাইয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা আবশ্যক। যাহাতে লিঙ্গ চুলকাইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নিতান্ত কোমল শয্যা কোন মতে ব্যবস্থা নহে। শয়ন গৃহ শীতল ও তাহাতে বায়ু সঞ্চালনের উপায় করা চাই। যাহাতে গাঢ় নিদ্রা হয় তজ্জন্য দিবাভাগে উপযুক্তরূপে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা উচিত। দিবা ভাগে নিদ্রা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। চিৎ হইয়া ঘুমান অন্যায়। অশ্লীল নাটক ও উপন্যাসাদি কোন মতে পাঠ করিতে দেওয়া উচিত নহে। এমন কি যে সকল গ্রন্থে প্রণয় বর্ণনা আছে, সে সকল পুস্তক স্পর্শ করিলেও সে অবস্থায় অতিশয় কুফল ফলিয়া থাকে।

এই সকল উপায় অবলম্বনেও যাহাদের কামবৃত্তি সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তাহাদের নিম্নোক্ত ঔষধ এক সপ্তাহ কাল সেবন করা কর্ত্তব্য।

ব্রোমাইড অফ্ পটাশ্ ... ... ১ ড্রাম।
সিম্পেল্ সিরাপ্ ... ... ১ আউন্স।

যাঁহারা দৌর্ব্বল্য অনুভব করিবেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবস্থা করা গেল।

টীং ক্লোরাইড্ অফ্ আয়রণ ... ... ২ ড্রাম।
সলফেট্ অফ্ কুইনাইন ... . ২০ গ্রেণ।
সিরাপ্ অফ্ জিঞ্জার ... ... অর্দ্ধ আউন্স।
পরিষ্কৃত জল ... ... ১ আউন্স।

কোন কোন ব্যক্তি এ অবস্থায় যুবকগণকে বিবাহ করিবার

প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু এই পাশব বৃত্তি পরিতৃপ্ত করাই যদি বিবাহধর্ম্মের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে দাম্পত্য প্রেম স্বর্গীয় সুখের আস্পদ বলিয়া অভিহিত হইতে পাইত না। ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতোষ ব্যতীত বিবাহের অন্য সাধু উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য অতি পবিত্র। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা বিবাহের গৌণ উদ্দেশ্য হইলেও সংসারের সুখ দুঃখের অংশিনী, মানবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী কামিনীকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া সকল অবস্থায় সুখী হইতে পারিবার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এবং তাহাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহাঁরা এই অল্প বয়স্ক যুবকদিগকে বেশ্যালয়ে যাইবার যুক্তি দিয়া থাকেন, তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর পাপের প্রশ্রয় দাতা তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কামবৃত্তি উত্তেজিত হইলে স্ত্রীসংসর্গ ব্যতীত যে অন্য প্রকারে তাহার প্রতিকার হইতে পারে না এমন নহে। উপরে যে দুইটী উপায়ের কথা উল্লিখিত হইল তাহাদের অন্যতরটীকে অবলম্বন করিলে যুবকগণকে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ করিলে নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে কোন সদনুষ্ঠানে প্রবিষ্ট হইলে যেমন সহজে তাহা সিদ্ধ করিতে পারা যায়, পরাধীন হইয়া করিলে সেই সদিচ্ছা বা চেষ্টা ফলবতী করিতে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়, কোন কোন স্থলে তাহা সুসিদ্ধ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। নিজে উপায়ক্ষম না হইয়া বিবাহ করা নিতান্ত বিড়ম্বনার কাজ, তাহা হইতে নানা প্রকার বিষময় ফল প্রসূত হইবার সম্ভাবনা। ভাবিয়া দেখিলে অল্প বয়সে দার

পরিগ্রহ করা নিতান্ত অযুক্তির কার্য্য। অতএব আমরা অল্প বয়স্ক যুবকদিগকে কোন মতে বিবাহ করিবার যুক্তি দিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ—যাহারা তাঁহাদিগকে বেশ্যালয়ে যাইতে যুক্তি দেন, তাঁহারা তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু। বেশ্যাদিগের কুহকে ভুলিয়া শত শত বালক আপনাদের ভবিষ্যজীবন ঘোর অন্ধকারময় করিতেছে, কেহ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, কেহ বা এমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি গ্রস্ত হইতেছেন যে, পুরুষ পুরুষানুক্রমে সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায় থাকে না। কেহ বা দারুণ দুষ্প্রিয়াসক্ত হইয়া আপনা হইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে বেশ্যাদিগের এরূপ আকর্ষণী শক্তি যে, আজি কালি মহানগরী কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথ গুলির পার্শ্ব হইতে যাহাতে বেশ্যাদিগের বাসোচ্ছেদ হয়, তাহার জন্য কতক গুলি লোক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাহাদের অঙ্গ ভঙ্গী, হাব ভাব দর্শনে কত অতীত যৌবন, বিবেক বুদ্ধিবান্ পুরুষেরও মন কিয়ৎকালের জন্য চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহাতে অপক্কমতি কিশোরগণ তাহাদের গ্রাসমধ্যে এবার প্রবিষ্ট হইয়া যে বহির্গত হইয়া আসিতে পারিবে ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। অতএব যাঁহারা এরূপ পরামর্শ দেন, তাঁহাদের উপদেশ এবং তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া আমারা তরুণবয়স্ক যুবকদিগকে পরামর্শ দিই যে, তাঁহারা আমাদিগের প্রদর্শিত উপরোক্ত উপায় গুলি অবলম্বন করিবেন এবং যখন মনোমধ্যে কোন বিকৃত ভাবের সঞ্চার হইবে সেই সময় সৎ পুস্তক পাঠ এবং সদ্বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলে আর দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চার হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ, ঋতু ও সহবাস ;

বিবাহের কাল সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। ফলতঃ বিবাহকার্য্য যে দেশ কাল পাত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশভেদে মানব প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশ অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশের মানবদিগকে স্বভাবতঃ শ্রমবিমুখ, চঞ্চল ও উগ্র হইতে দেখা যায়। এই উভয় স্থান-বাসী লোকদিগের আকার ও প্রকৃতিগত যে বৈষম্য কত, যিনি তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। মনুষ্য জীবনে বিবাহ একটী গুরুতর ব্যাপার। এই মহান্ ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য ভবিষ্য জীবনে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। বিবাহগুণে স্ত্রী পুরুষ ইহলোকে স্বর্গ সুখ ভোগ করেন, এবং বিবাহ দোষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। পৃথিবীস্থ মানবগণের উপর দৃষ্টি কর, দেখিতে পাইবে যে, আমাদিগের সাংসারিক সুখ ও দুঃখ বিবাহের উপর কতটা নির্ভর করে। বিবাহ সম্বন্ধে পাত্রাপাত্র এবং কালাকাল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে বিষয়ে বাগবিতণ্ডা লইয়া আমাদের এই প্রবন্ধ বৃদ্ধি করা কোন মতে অভিপ্রেত নহে, তবে আমাদের দেশে যেরূপে মানব জীবনের এই শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। সেই সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে আমাদের দেশের নরনারীগণকে কখন অসুখের মুখ দেখিতে হইবে না।

স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা বয়সে অন্ততঃ ৮।৯ বৎসর বড় হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল না থাকিলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহ রুগ্ন হইলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অবশ্যই পিতামাতার পীড়াকে প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যে একের যে পীড়া থাকিবে, সহবাস জন্য অপরের সেই পীড়া নিশ্চয়ই জন্মিবে। অতএব বিবাহসূত্রে পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

উভয়ের শারীরিক বল সম্বন্ধেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি স্ত্রী পুরুষের উভয়ের মধ্যে একের বল অধিক হয়, তবে অপরকে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে হইবে। তাঁহাদের সন্তান সন্ততি জন্মিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে, এবং যদিই জন্মে তবে সেই পুত্র কন্যা কখন সবল ও সুস্থকায় হইতে পারে না; কাজে কাজেই তাহারা অল্প দিন মধ্যে দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অধিকন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমান বল না থাকিলে উভয়েরই কামবৃত্তি অতৃপ্ত থাকে এবং তজ্জন্য শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

মানসিক গুণ পরীক্ষার কথা এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র, কেননা সে বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে বিবাহ কার্য্য কোন মতেই সুখের হইবে না, অতএব তাহা উপেক্ষনীয় নহে।

যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের উদরে একটী ডিম্বকোষ থাকে; এই সময়ে

ডিম্বকোষস্থ চর্ম্মথলির রক্তে প্রতিমাসে ডিম্বের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র পদার্থ জন্মে। মাসপূর্ণ হইলেই ঐ ডিম্বকোষ ফাটিয়া যায়, এবং তাহা হইতে শোণিত নির্গত হইয়া প্রস্রাবদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। ঐরূপ শোণিতস্রাব কাহারও ২। ৩ দিন, কাহারও বা ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত থাকে; ইহাকেই "ঋতু" বলে। পূর্ব্বোক্ত ডিম্ব নিসৃত হইবার সময় গর্ভের পার্শ্বে আসিয়া থাকে। যদি সেই সময়ে উহা পুরুষ রেতের সহিত মিলিত হয়, তবে স্ত্রী-লোকের গর্ভাধান হয়। ঋতুকালে অসাবধান থাকিলে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ঐ সময়ে যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। শীতল জল, হিম শিশির, শীতল বা দূষিত বায়ু শরীরে লাগিতে দেওয়া ভাল নয়। ঋতু-কালে জ্বর হইলে শীঘ্র তাহা যায় না। এই অবস্থায় সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্ত্তব্য। রজস্বলা হইলে স্ত্রীলোকের যোনিদেশ দিয়া সর্ব্বদা শোণিতপাত হইতে থাকে। উহা পরি-ধেয় বস্ত্র বা পরিধেয় অন্য কোন স্থানে লাগিলে দুর্গন্ধময় হয়; এজন্য ২। ৩ হাত লম্বা ও আধ হাত পরিমিত পরিষ্কার বস্ত্র এক খণ্ড যোনির উপর বন্ধন করিয়া রাখিতে হয়। ঐ বস্ত্রখানি প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

ঋতুকালে স্নান করা উচিত নহে, সর্ব্বদা গরমে থাকা ভাল। এই সময়ে স্নিগ্ধ দ্রব্য যথা অলাবু, ডুম্বুর, মূলা, বেগুণ ইত্যাদি ভক্ষণ করিতে নিষেধ। যে সকল দ্রব্য ভোজনে কামবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, এরূপ দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেননা কামবৃত্তি উত্তেজিত হইলে অধিক মাত্রায় শোণিতস্রাব হইয়া শরীরকে দুর্ব্বল করিতে পারে। হংসডিম্ব,

মৎস্য, মাংস প্রভৃতি দ্রব্য অতিশয় কামোদ্দীপক। এজন্য ঋতু-কালে ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ঋতু হইলে পুরুষের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সময় সঙ্গমে বাধক ব্যাধি নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে। এজন্য ঋতুর অন্ততঃ তিন দিন পরে পুরুষ সহবাস কর্ত্তব্য।

মানব মনে স্ত্রী-সহবাসেচ্ছা স্বভাবতঃ বলবতী। যখনই এই ইচ্ছা বলবতী হয়, তখনই আমাদের মস্তিষ্কস্থ তাড়িত তেজ দেহতন্ত্রীর মধ্য দিয়া স্ত্রী ও পুরুষাঙ্গে পরিচালিত হয়। তদ্দ্বারা পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ, পুষ্ট ও কঠিন হয়, এবং স্ত্রীঅঙ্গ স্ফুরিত, উষ্ণ ও সতেজ হয়, যোনির চতুঃপার্শ্বস্থ শোণিত আসিয়া তাহাতে সঞ্চিত হয়। সহবাস সময়ে স্ত্রী পুরুষদিগের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সচ্ছন্দ না থাকিলে পুত্র কন্যাগণ বিকৃতাঙ্গ, রুগ্ন, বাক্‌শক্তিশূন্য, ক্রোধপ্রবণ, হিংস্র বা উন্মত্ত হইতে পারে। স্ত্রী সহবাসের উপযুক্ত সময় রাত্রি। কেননা এই সময় সমস্ত বায়ু-মণ্ডলীতে নাইট্রোজেন নামে এক প্রকার বাষ্প সঞ্চিত হইয়া থাকে, দিনে তাহা হয় না; ঐ বাষ্প কামোদ্দীপক এবং সঙ্গমের উপযুক্ত বলদায়ক, এজন্য দিবাভাগে স্ত্রীসহবাস পীড়াজনক। রাত্রিকালে আহারের ২। ৩ ঘণ্টা পরে শরীর ও মন যখন বেশ সুস্থাবস্থায় থাকে, সেই সময়ে স্ত্রীসহবাসে পুত্র কন্যাদি সুরূপ, সুস্থ ও সবলকায় হয়; তদন্যথায় তাহারা বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও অল্পায়ু হয়। ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত সহবাসে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয়। আমাদের জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, ঋতুর প্রথম তিন দিবস স্ত্রী-লোকের পুরুষ সহবাস হইলে তদ্দ্বারা যদি গর্ভ হয়, তাহা পূর্ণা-

বস্থা না হইতে হইতেই স্রাব হয় এবং গর্ভ না হইলে স্ত্রী-লোকের বাধকাদি পীড়া জন্মে। চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যেক যুগ্ম দিনে সহবাস ঘটিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে কন্যা জন্মিয়া থাকে। অমাবস্যা, প্রতিপদ, সপ্তমী, অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং রবিবারে সহবাস নিষেধ। ঐ সকল দিনে সহবাস করিলে যে পুত্র কন্যা জন্মে, তাহারা নিতান্ত অল্পায়ু হয়। ঐরূপ প্রথম প্রহরে স্ত্রী সহবাস করিলে যে সন্তান জন্মে, সে অল্পায়ু হয়, দ্বিতীয় প্রহরে সন্তান জন্মিলে নির্ধন, তৃতীয় প্রহরে কুকর্ম্মান্বিত এবং চতুর্থ প্রহরে সুবুদ্ধিমান ও সৎকার্য্যশীল হয়। দিবাভাগে স্ত্রীসহবাসে যদি পুত্রাদি জন্মে, তবে তাহারা অতি অভাজন ও দুরাচার হইয়া থাকে।

মূলা, মঘা ও অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম পাদ এবং জ্যেষ্ঠা রেবতী ও অশ্লেষার শেষ ভাগকে গণ্ড কহে। গণ্ডলগ্নে সহবাস একবারে অকর্ত্তব্য।

জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রমাণ আছে যে, স্ত্রীলোকের জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, ও একাদশ ভিন্ন স্থানে চন্দ্র থাকিলে, ঐ চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টির সময়ে যে রজোযোগ হয়, সেই ঋতুতে গর্ভ হয়। আর ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভধারনের যে উপযুক্ত সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ষোড়শ দিবস মধ্যে পুরুষের জন্ম লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানগত চন্দ্র বৃহস্পতি কিম্বা অন্য কোন শুভ গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যদি সঙ্গম হয়, তবে নিশ্চয়ই স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইবে।

নিম্নোক্ত সময় ও নিম্নোক্ত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস নিষেধ।—

ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের সময় ; গ্রীষ্মকালে, পীড়িত ও ক্লান্ত, অতিশ্রম বা ভোজনের অব্যবহিত পরে ; দুঃখ, রাগ, হিংসা, দ্বেষ বা মত্ততার সময়, এবং স্ত্রী পুরুষের উভয়ের মধ্যে এক জনের অনিচ্ছা থাকিলে।

ইন্দ্রিয়দমন করিলে অতি অল্প মাত্রই ক্ষতি। সকল কার্য্যই পরিমিতরূপে করা ভাল। অতিরিক্ত মাত্রায় ইন্দ্রিয় সেবা নানা অনিষ্টের মূল। যে ব্যক্তির বিবাহ করিবার উপযুক্ত অবস্থা নহে, বা যে স্ত্রীলোক বিধবা, তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিবে। পুরুষের মন অনন্যকর্ম্মা হইলেই তাহাতে কামেচ্ছা বলবতী হয়, কিন্তু পুরুষসহবাস ও ঋতুর সময় ভিন্ন অন্য সময় স্ত্রীলোকের এই প্রবৃত্তি আপনাপনি উত্তেজিত হয় না। কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কামবৃত্তি উত্তেজক কতকগুলি জিনিষ এবং ক্রীয়া আছে তাহাদের সংশ্রবে মনে কামেচ্ছা প্রবল হয়। যথা,—সুখস্পর্শ মলয়ানীল সেবা. সুস্বর বা সঙ্গীত শ্রবণ, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংস্পর্শ ইত্যাদি।

ঋতুকালে সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঋতুকালে চতুর্থ দিবসে স্নানের পর সুন্দর বস্ত্র পরিধান, সুগন্ধী দ্রব্য লেপন করিয়া সহবাস করা কর্ত্তব্য। সঙ্গম সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইলে অনেক প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা। সহবাস স্বভাবতঃ ৩। ৪ মিনিটের অধিক স্থায়ী হওয়া উচিত নহে। সহবাস কালে স্ত্রী বা পুরুষাঙ্গে যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষত বা বেদনা না জন্মে সেপক্ষে বিলক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। স্ত্রীপুরুষের সমান বল না হইলে এক সময়ে উভয়ের রেতপাত হয় না। ঠিক এক সময়ে উভয়ের

রেতস্খলন হইলেই জানা যাইবে যে, স্বাভাবিক এবং পূর্ণ সহবাস হইয়াছে এবং এইরূপ একই সময়ে উভয়ের রেতস্খল না হইলে গর্ভের সঞ্চারও হইবে না। শুধু তাহাই নহে সহবাসের অসামঞ্জস্যপ্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষের নানা প্রকার পীড়া জন্মে। উপযুক্ত সময়ে রেতপাত না হওয়া জন্য স্ত্রীলোকের "হিষ্টীরিয়া" প্রভৃতি পীড়ার সঞ্চার হয়। এই অনিষ্টের মূলোৎপাটন করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বল যাহাতে সমান হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার সহজ উপায় দীর্ঘকাল উভয়ের সহবাস। স্ত্রীপুরুষের একত্র এক শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ন করিতে করিতে তাঁহাদের পরস্পরের তেজ সমান হইয়া দাঁড়াইলে যখনই সহবাস ঘটিবে, তখন একই সময়ে উভয়ের রেতঃপাত হইবে। ঐরূপে রেতঃপাত হইবার আর একটী কারণ এই যে, উভয়ের একই সময়ে কামেচ্ছা বলবতী না হওয়া। সহবাসের পূর্ব্বে যাহাতে উভয়ের ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্ত্রীর স্তনবৃন্ত সুদৃঢ় হইয়া উঠিলেই জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে। সহবাসক্রিয়া যাহাতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলে এজন্য অনেকে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত অন্যায়। কল্পিত উপায়ে তাহা সাধন করিলে নানা প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

সহবাসের পর শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং আলস্য বোধ হয়, সে সময় স্থির হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গর্ভ ও প্রসব।

যেরূপে স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হয় তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। গর্ভ হইলেই মাসে মাসে যে ঋতু হইয়া থাকে তাহা বন্ধ হয়। সাধারণতঃ ঋতুবন্ধ হইলেই গর্ভের সঞ্চার জানিতে পারা যায়। সত্য বটে শৈত্যাধিক ও অন্যান্য কারণেও ঋতু বন্ধ হয়, কিন্তু তাহা সচরাচর নহে। গর্ভ ব্যতীত অন্য কারণে ঋতু বন্ধ হইলে তাহাকে পীড়া বলিয়া জানিতে হইবে। ডাক্তার ডিয়েস্ এবং বডিলোক বলেন যে, গর্ভ হইলেও কোন কোন স্ত্রীলোকের ২।৩ মাস পর্য্যন্ত ঋতু হইয়া থাকে। গর্ভ হইলে দুই তিন মাস মধ্যে স্তনদ্বয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে যে কাল বর্ণ দাগ থাকে তাহা গাঢ়তর হইয়া আইসে, তলপেট বড় হয়, স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় হয়। কাহার কাহার বমনেচ্ছা ও বমন হইয়া থাকে। ইহা ছয় সপ্তাহের পর প্রায় তিনমাস পর্য্যন্ত থাকে। সর্ব্বদা আলস্য বোধ করে, এবং শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়। মুখদিয়া সর্ব্বদা জলবৎ লালা উঠিতে থাকে ও অরুচি হয়। এই সকল লক্ষণ দ্বারা যখন জানিতে পারিবে যে, নিশ্চয়ই গর্ভ হইয়াছে, তখন বিলক্ষণ সাবধান হইতে হইবে, কেন না এখন অবধি গর্ভবতীর সুখ দুঃখের উপর তাঁহার গর্ভস্থ শিশুর সুখাসুখ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। আরও জানিতে হইবে যে, তাঁহার শরীর হইতে অন্য

একটী শরীর, তাঁহার জীবন হইতে অন্য একটী জীবন, এবং তাঁহার মন হইতে অপর একটি মন প্রস্তুত হইতেছে, গর্ভবতীর শরীর ও মন গর্ভাবস্থায় সচ্ছন্দ থাকিলে জাতশিশুও সুস্থ ও সবলকায় হইয়া থাকে, নতুবা এ অবস্থায় যদি তাঁহার কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক পীড়া জন্মে, তবে গর্ভস্থ বালক চিরকালের জন্য কষ্ট পাইবে। জননী প্রসবের পূর্ব্বে বা পরে রোগ মুক্ত হইলেও শিশুর স্বাস্থ্য অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। গর্ভাবস্থায় কোন পীড়া স্ত্রীলোককে একবার স্পর্শ করিবা মাত্র যে শিশু চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এমত নহে। জননীর পীড়া যতটা গুরুতর এবং যত দিন স্থায়ী হয়, তদনুসারে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্যের উপর উহা বলপ্রকাশ করে। যাহাই হউক, গর্ভাবস্থায় যাহাতে পীড়া না হয় তৎপক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আর একটী কথা এই যে, অন্য সময়ে শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর যতটা অত্যাচার সহ্য হয়, গর্ভাবস্থায় তাহার শতাংশের একাংশেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এজন্য এঅবস্থায় অধিকতর সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থায় মন স্বভাবতই উত্তেজিত হইয়া থাকে। এজন্য অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। এই সময় মনে যে যে বাসনার সঞ্চার হয়, সেই সেই বাসনা সাধ্যানুসারে পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই আমাদের দেশে পঞ্চামৃত ও সাধদিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সাবধানে থাকিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা অতি কম; যদি হয়, তবে সহজে ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ বিরেচক নিষিদ্ধ।

নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কেবল মাত্র "ক্যাষ্টর-অএল" দেওয়া যাইতে পারে। গর্ভাবস্থায় পীড়া হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষেরা এই গুর্ব্বিনীদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা যে সকল উদ্ভিদ ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে, প্রায়ই অপরকে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বলিতে নিষেধ আছে। তাহারা নিজেও সে সকল দ্রব্যের গুণ বিশেষরূপে অবগত নহে; এরূপ স্থলে তাহাদিগের ঔষধ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অতএব তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা কোন মতে শ্রেয় নহে।

আমাদিগের দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে গর্ভিনীর যত্ন লইবার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক প্রসন্নচিত্ত ও পবিত্র থাকিতে চেষ্টা করিবেন, সাদা কাপড় ও অলঙ্কার পরিধান করিবেন, গুরু ও দেবতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিবেন, ময়লা, পীড়িত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে তাঁহার স্পর্শ করা উচিত নহে। দুর্গন্ধময় কদর্য্য ও কুদৃশ্য জিনিষ দৃষ্টিপথে না আইসে। অনাহার, শুষ্ক দ্রব্য ভোজন, পচা বা পূর্ব্বদিনের প্রস্তুত করা খাদ্য কোন মতে খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, ভারবহন, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কার্য্য একবারে পরিহার্য্য। সুপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ ব্যবস্থা। উচ্চৈস্বরে চীৎকার, ক্রন্দন কোন মতে মঙ্গলদায়ক নহে। কোমল ও পাতলা বিছানায় শয়ন করা উচিত। প্রথম তিনমাসে মিষ্ট, স্নিগ্ধ এবং লঘু আহার, যথা— দুগ্ধ ও অন্ন উপকারজনক। চতুর্থ মাসে ছানা বা মাখন তোলা দুগ্ধ; পঞ্চম মাসে দুগ্ধ, ষষ্ঠ মাসে ঘৃত, এবং সপ্তম মাসে দুগ্ধের

সহিত ঘৃত ও প্রত্যেক পূর্নীর ক্বাথ গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে সুখজনক ও বলকারক। অষ্টম মাসে বদর (একজাতীর কুল), শ্বেত-বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুল্যা দ্রব্যগুলির ক্বাথের সহিত দুগ্ধ, ছানার জল, অল্প পরিমাণে তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইলে দাস্ত পরিষ্কার ও বায়ু সরল হইবে।

বমন।—গর্ভাবস্থায় প্রায়ই বমন হইয়া থাকে; তজ্জন্য অল্প মাত্রায় বরফ সেবনে উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু মাত্রাধিক হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

ক্ষুধামান্দ্য।—লঘুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত। তাহা হইলে আপনাপনিই উহা সারিয়া যায়।

উদারাময়।—ইহাতেও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, লঘু আহার গ্রহণ করিতে হইবে, মানসিক চিন্তা, রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কাশি।—এক এক খণ্ড মিছরি বা গঁদ মুখে রাখা, গরম জল শীতল করিয়া তাহা পান করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ উপরোক্ত পীড়া গর্ভাবস্থায় প্রায়ই হইয়া থাকে, তজ্জন্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। পথ্যাদির সুব্যবস্থা করিলে আপনা হইতেই সারিয়া যায়। তবে যদি আপনা হইতে না শুধরায় এবং উত্ত-রোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চিকিৎসাধ্যায়ে যে যে ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করিবেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ যুক্তিযুক্ত।

গর্ভস্রাব।—পিতামাতা পীড়িত থাকিবার কালে কোন সন্তান জন্মিলে সে প্রসব হইবার পূর্ব্বেই প্রায় মারা গিয়া থাকে। পিতার বয়স অল্প হইলে কখন কখন শিশুকে গর্ভেই নষ্ট হইতে

দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় অত্যধিক স্বামী সহবাস জন্যও গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। অতি ভোজন, অতিরিক্ত অগ্নিতাপ, আকস্মিক ভয়, হঠাৎ পতন, গর্ভাশয়ে আঘাত জন্যও গর্ভস্রাব হয়। এজন্য যাহাতে ঐ সকল অভ্যাপাত না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

যদি স্ত্রীপুরুষ সুস্থ সবলকায় হয় এবং তাহাদিগের উপযুক্ত বলের সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে গর্ভিনীকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিলে কোন মতেই গর্ভস্রাব হইবে না। পুরুষের শুক্র পরিপক্ক না হইতে হইতে যদি তাঁহার স্ত্রী সহবাস ঘটে এবং সেই সহবাস কর্তৃক যদি স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়, তবে কেন না সে গর্ভ স্রাব হইবে? ধান্যের আগড়াতেও চারা জন্মিতে পারে, কিন্তু সে চারা কি শস্যোৎপাদনে সমর্থ হয়! পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কোনক্রমে অনুপযুক্ত বয়সে সহবাস করা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের দেশে বাল্য বিবাহের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এরূপ অনিষ্টাপাত অবশ্যম্ভাবী।

নবম ও দশম মাস প্রসবের কাল। এজন্য গর্ভিণীকে এই সময়ে শুভ দিন শুভক্ষণে সূতিকাগারে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণীর পক্ষে সূতিকাগৃহের তল সাদা রঙ্গের, ক্ষত্রিয়ার পক্ষে লাল, বৈশ্যার পক্ষে পীত, এবং শূদ্রের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণের হওয়া উচিত। সূতিকাগৃহ ব্রাহ্মণের হইলে বেল কাষ্ঠে, ক্ষত্রিয়ের হইলে বট, বৈশ্যের হইলে গাব, শূদ্রের হইলে বাবলা কাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে হইবে। গর্ভিণী যে খাটে শয়ন করিবেন, সেই খাটও ঐরূপ কাষ্ঠের হইবে। সূতিকা গৃহের দেওয়াল গুলি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক। গৃহটী অন্ততঃ দীর্ঘে আট হাত প্রস্থে চারি হাত না হইলে চলিবে না, এবং তাহার দ্বার দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকে রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, গৃহমধ্যে যাহাতে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালিত হয় এমন ব্যবস্থা করা চাই।

প্রসবের পূর্ব্বে স্ত্রীঅঙ্গ দিয়া এক প্রকার তরল লালের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, স্তনযুগল শিথিল, গর্ভাশয়, পৃষ্ঠ, উরু, এবং কটিতে বেদনা হয়। প্রসবকাল নিকট হইলে সেই বেদনা কেবল পৃষ্ঠ ও পার্শ্বে অবস্থিতি করে। সেই সময়ে গর্ভিণী ছোট ছোট বালক পরিবেষ্টিতা হইবেন এবং হস্তে সুগন্ধী পুষ্প ধারণ করিবেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিয়া গরম জলে স্নান করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্নানের পর ভাত বা রুটী খাইতে দিলে তদ্দ্বারা সুখ প্রসব হয়।

নরম বিছানায় উচ্চ উপাধান মস্তকে দিয়া গর্ভিণীকে চিৎভাবে শয়ান করাইতে হইবে। পা দুইটী পরস্পর দূরে এবং হাঁটু দুইটী বক্রভাবে রাখিয়া যাহাতে প্রসবদ্বার বিস্তারিত হইতে পারে এমন ভাবে রাখিতে হইবে। এই সময়ে চারিটী প্রবীণা স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিবেন। যে সময়ে গর্ভাশয়, উরু, নিতম্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইতে থাকিবে, সেই সময়ে গর্ভিণীকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বেগ দিবার উপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু সাবধানে বেগ দেওয়া চাই, কোন মতে অনিয়মিতরূপে না হয়। অনিয়মিতরূপে অর্থাৎ কখন অল্প কখন অধিক, কখন

নিশ্বাস পূর্ণ করিয়া, কখন বা নিশ্বাস অপূর্ণরূপে রাখিয়া বেগ দিলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। বেগ দিবার দোষে শিশু বোবা, কুব্জ, বিকৃত মস্তক হইতে পারে। যদি শিশুটী প্রসব-দ্বারে আসিয়া নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত থাকে, বাহির হইতে না পারে, তবে লাঙ্গলিয়া বা নাটাকরঞ্জার শিকড় গর্ভিণীর বাহুতে বান্ধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হইবে। প্রসবকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে, একটী বড় গাম্‌লা গরম জলে পরিপূর্ণ করিয়া গর্ভিণীকে তাহার উপর বসাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল রাখিতে হইবে এবং গরম জল ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে তাহার উপর পুনঃ পুনঃ গরম জল ঢালিয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিলেই প্রসব হইবে, আর কোন বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যদি ক্রন্দন করে তবে, কোন আশঙ্কা থাকে না। না কাঁদিলে প্রায়ই বুঝিতে হয় যে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হইতেছে না। তজ্জন্য শিশুর মুখের ভিতর যে লালা থাকে তাহা অঙ্গুলি দিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর বক্ষে শীতল জলের ঝাপটা মারিতে হইবে; ইহাতেও নিশ্বাস প্রশ্বাস সরল না হইলে, গরম জলে স্নান করাইয়া দিতে হইবে। ভূমিষ্ঠ হইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেও শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস সরল হইতে দেখা গিয়াছে। এজন্য জাত শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস সরল না হইলে হঠাৎ ব্যাকুল না হইয়া উপরোক্ত প্রতিকার করিতে হইবে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অত্যল্প সূক্ষ্ম চূর্ণ লবণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার মুখে দিতে হইবে।

প্রসবের পরে প্রসূতির যদি পাকস্থলী স্ফীত ও বেদনাযুক্ত থাকে, তাহা হইলে অঙ্গুলির অগ্রভাগে চুল জড়াইয়া গলার ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে বমন হইয়া পাকস্থলী পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তাহার পরে প্রসূতির বস্ত্রাদি বদলাইয়া শুষ্ক ও পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করান কর্ত্তব্য। জননীকে বিশ্রাম দিয়া শিশুটীকে স্নান করাইবে। অনন্তর ঘৃত ও নিম্বপত্র একত্র বাটিয়া শিশুর মস্তকে দিবে। এক ঘণ্টা রাখিয়া তাহার পর উহা ফেলিয়া দিতে হইবে।

প্রসবের পর প্রসূতিকে অতি সাবধানে রাখিতে হইবে কেন না তাঁহার শারীরিক সুখাসুখের উপর শিশুর সুখাসুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব তাঁহার পান, ভোজন, শয়ন উপবেশনাদি কার্য্যের জন্য উপযুক্ত যত্ন লইতে হইবে। সে বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিশু ও প্রসূতির চিকিৎসা।

তাপ দিবার পদ্ধতি যে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে উহা জননী এবং শিশু উভয়ের পক্ষেই পরম উপকারী। তাপ দ্বারা প্রসূতির শরীরের বেদনা নষ্ট হয়, গা হাতের জড়তা ঘুচিয়া বলাধান হইতে থাকে, শরীরের দূষিত রস রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া দেহকে বিলক্ষণ সতেজ করে। যত দিন না প্রসূতি

ও শিশু বেশ সবল হয়, ততদিন তাহাদিগকে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির করা অন্যায়। সাধারণতঃ তিন সপ্তাহ কাল সূতিকাগারে রাখিয়া প্রতি রাত্রিতে উপযুক্তরূপ তাপ দিলে শিশু ও জননী উভয়েই স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতে পারে। আমাদের দেশের লোকের মনে একটা কুধারণা আছে যে, সূতিকাগার একটা কদর্য্যস্থান, দৈবাৎ প্রবেশ করিলে স্নান করিতে হয়। অতএব এমন অপবিত্র স্থান সামান্য ৩।৪ সপ্তাহের জন্য বহুব্যয়ে প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সূতিকাগার বলিলেই প্রায় বুঝিতে হয় যে, উহা ভিজা মাটীতে প্রস্তুত, বায়ু গমনাগমের উপযুক্ত উপায় নাই। আমাদের দেশে প্রসূতি এবং শিশু সেইরূপ অন্ধকার গৃহে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সূতিকা গৃহের দোষেই আমাদের দেশের অনেক প্রসূতি এবং শিশু অকালে কাল কবলিত হইয়া থাকে। সূতিকা গৃহ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুষ্ক এবং সুন্দর সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। সূতিকা গৃহে রাখিবার কালে প্রসূতিকে সাদা কাপড় পরিতে দেওয়া, সুন্দর শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশাচার মত সূতিকা গৃহে প্রসূতিরা যে "ঝাল" খাইয়া থাকেন, সেটী বড় সুন্দর পদ্ধতি। "ঝালে" যে সকল দ্রব্য থাকে, সেগুলি শোণিতস্রাব নিবারক, কফনাশক, এবং বলকারক। আজি কালিকার যে সকল স্ত্রীলোক "ঝাল" খাওয়াকে ঘৃণা করিয়া বিজাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। মানব

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমারা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ু অনুসারে মানব প্রকৃতিও বিভিন্ন-রূপ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা উষ্ণপ্রধান দেশের লোকদিগের নিয়মানুসারে স্বাস্থ্যরক্ষা বা পান ভোজনাদির ব্যবস্থা করিলে তাহারা কোনমতে সচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব ভিন্ন দেশীয় আচার ব্যবহার আমাদের দেশের লোকের পক্ষে কোনমতে উপকারজনক হইতে পারে না।

সূতিকাগারে প্রসূতিদিগের সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পীড়া গুলি হইয়া থাকে। সংক্ষেপে তাহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইল তদনুসারে কার্য্য করিলে কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।

প্রসবের পর বেদনা।—প্রসবের পরে তলপেট বেদনা করিতে থাকে। ইহার প্রতিকার জন্য তাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাপ দেওয়াতে যদি না সারে তবে হোমিওপ্যাথিকের "সিকেল" এক ফোঁটা অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত সেবনে ভাল হইবে।

প্রস্রাব বন্ধ।—প্রসবের পরে কাহারও দুই তিন দিন পর্য্যন্ত প্রস্রাব বন্ধ থাকে। এরূপস্থলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া প্রতিকার কর্ত্তব্য।

জলবৎ দ্রব্য স্রাব।—প্রসবের পরে গর্ভস্থলী হইতে জলবৎ তরল দ্রব্য নির্গত হইয়া থাকে। প্রসূতির পক্ষে ইহা অপকার-জনক। এইরূপ স্রাব হইলে বিশেষ পীড়ার সম্ভাবনা।

যোনির বেদনা।—প্রসবের পর যোনির বেদনা না হওয়াই আশ্চর্য্য। এইরূপ বেদনা হইলে "ক্লোরাইড্ অফ্ সোডিয়ম্"

দুই কাঁচ্চা এক পোয়া আন্দাজ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনি ধৌত করিলে ও 'আর্শেনিক" সেবন করিলে অনেক উপকার দর্শে।

দুগ্ধোৎপত্তি জনিত জ্বর।—প্রসবের পরেই স্তন হইতে এক প্রকার গাঢ় পদার্থ বহির্গত হইয়া থাকে। সচরাচর চতুর্থ দিবসে প্রকৃত দুগ্ধ জন্মে। তখন স্তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তৃষ্ণা ও শীত বোধ হয়, মস্তক বেদনা করে, অতিশয় ঘর্ম্ম হইতে থাকে। শিশুকে স্তন পান করাইতে করাইতে আপনাপনিই ইহা সারিয়া যায়। স্তনে অধিক দুগ্ধ সঞ্চয় হইলে তাহা নির্গত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতেও যদি দুগ্ধ অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, তবে "একেনাইট" ও "ব্রাইওনিয়া" পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিলে উপকার দর্শিতে পারে। দুগ্ধের অল্পতা হইলে পুষ্টিকর ও বলকারক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য।

শিশুদিগের পীড়া অতি অল্পই হয়। তাহাদিগের নূতন শরীরে জলবায়ুর প্রাধান্য পূর্ণরূপে আধিপত্য করিতে থাকে, এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদের পীড়া হওয়া এক প্রকার স্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিশুদিগের পীড়া হইলে হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ ব্যবস্থা করা অনেকটা নিরাপদ বলিয়া বোধ হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা কম, সেবনে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই এবং উপকারও প্রভূত পাওয়া যায়। শিশুদিগকে অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইলে তজ্জন্য আবার নূতন পীড়ার সঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে। এজন্য আমারা নিম্নে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি, সেই সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথিক বলিয়া জানিতে হইবে।

নাড়ী ফুলা।—নাড়ী কাটিবার সময় ধাত্রীর অসাবধানতা বশতঃ এইপীড়া জন্মে, তাপ দিলে ইহা সারিয়া যায়।

চক্ষুফুলা।—হঠাৎ চক্ষে আলোক লাগিলে বা চক্ষু অপরিষ্কার রাখিলে এইপীড়া জন্মে। কর্জ্জল দ্বারাই প্রায় এইরোগ দূর হইতে দেখা যায়। তাহাতে নিতান্ত না সারিলে অল্পমাত্রা "একোনাইট" খাইতে দিলে সারিয়া যাইবে। চক্ষে আলোক লাগিলেই যদি শিশু কাঁদিতে থাকে, তবে "বেলেডোনা" খাইতে দেওয়া যায়।

ক্রন্দন, চাঞ্চল্য ও অনিদ্রা।—অজীর্ণ দোষে বা দন্তোদগমের সময় এইপীড়া হয়। তাহার জন্য "কফিয়া" সেবন করান কর্ত্তব্য। মস্তক গরম থাকিলে "বেলাডোনা" দিতে হইবে।

নাসিকারোধ।—শীতল বাতাস গায়ে লাগিলে এই পীড়া জন্মিয়া থাকে। প্রতিকার জন্য "নক্সভমিকা" দেওয়া ব্যবস্থা। যদি নাসিকা দিয়া জলবৎ পদার্থ নির্গত হয় তবে "আর্শেনিক" প্রয়োগ আবশ্যক। ইহাতেও যদি রোগ না সারে, তবে প্রতি-দিন ১ ফোঁটা করিয়া "ক্যালকেরিয়া" একসপ্তাহ, এবং তাহার পর আর একসপ্তাহ ঐরূপে "সলফার" ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

স্তনফুলা।—সময়ে সময়ে শিশুদের স্তন ফুলিয়া থাকে। এরূপ হইলে একটু সরিষার তৈল কিঞ্চিৎ কর্পূরের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিলেই ভাল হইবে।

ব্রণ।—শিশুদিগের মুখে ব্রণ ও স্ফোটক হইলে "বেরেকম" লাগাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

দুগ্ধ বমন।—শিশু যদি দুগ্ধ বমন করে বা তাহার পাতলা

মল দাস্ত হয় তবে " সল্‌ফিউরিক্‌ য়্যাসিডের" ক্ষুদ্র বটী চারি ঘণ্টা অন্তর ছয়টী খাওয়াইলে ভাল হইবে।

পেট বেদনা।—প্রসূতি যদি এমন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করেন যে তদ্দারা অজীর্ণ হয়, তবে শিশুরও অজীর্ণ হয়, পেট কামড়ায় এজন্য "ক্যামোমিলা" দিতে হইবে। শিশুর পেট কামড়ানীর এমন ঔষধ আর নাই। পেট কামড়ানীর সহিত বমন ও পেটের পীড়া থাকিলে "কলসিন্থ" দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কোষ্ঠবদ্ধ।—তেতুঁলের মাড়ি পানের বোঁটায় লাগাইয়া গুহ্য দ্বারে দিলে তৎক্ষণাৎ দাস্ত হইবে। মুক্তাবর্ষীর পাতাও ঐরূপে দিলে সত্বর দাস্ত হয়। কেহ কেহ বকুল বীজের শস্যও ঐ রূপে গুহ্য দ্বারে প্রয়োগ করেন। ফল সকল গুলিই শিশুর কোষ্ঠ বদ্ধের মহৌষধ।

উদরাময়।—মাতার আহার দোষে শিশুর এই পীড়া হইয়া থাকে। এজন্য "চায়না" ব্যবহার করা ভাল। সবুজ বর্ণ মল নির্গত হইয়ালে "ক্যামোমিলা" এবং দন্ত উঠিবার সময় উদরাময় হইলে "ক্যালকেরিয়া" প্রয়োগ করা উপযুক্ত।

ক্রিমি।—এইরোগে "সিনা" অতি সুন্দর ঔষধ।

প্রস্রাব বন্ধ।—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর দুই ঘণ্টা মধ্যে যদি প্রস্রাব না হয়, তবে প্রস্রাব দ্বারে গরম জলে ভিজান নেকড়া রাখিলে প্রস্রাব হয়। তাহাতে যদি দুই ঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব না হয়, তবে গরম জলের সহিত কাঁচা দুগ্ধ মিশাইয়া পিচকারী দিলে প্রস্রাব হইবেই হইবে।

জ্বর।—শিশুর জ্বরে "একোনাইট" ব্যবস্থা, জ্বর মগ্ন হইলে "আর্শেনিক" প্রয়োগ করিলেই জ্বর ত্যাগ হইবে।

ঔষধের পরিমান।—দুই বৎসের কম বয়স্ক শিশুদিগকে প্রতিবারে দুইটী গ্লোবিউল (ক্ষুদ্র বটীকা), দুই হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৪ টী, ততোধিক বয়সে ৬ টী বটী দিতে হইবে।

শিশুদিগের পক্ষে আরক এক ফোঁটা, দশ চামচে জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতিবারে এক এক চামচে, বালক বালিকার পক্ষে অর্দ্ধ ফোঁটা, পূর্ণবয়সের পক্ষে ১ ফোঁটা মাত্রা জানিতে হইবে

পীড়া কঠিন হইলে ১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া যুক্তিযুক্ত এবং পুরাতন হইলে ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিতে হইবে।

তীর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

তীর্থদর্শণ হিন্দু ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। তীর্থদর্শণে যে প্রভূত পূণ্য সঞ্চয় হয়, সে কথা আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। জিনি জীবিতকালমধ্যে একবারও কোন তীর্থে পাদাপর্ণ না করেন, তিনি আপনার জীবনাকে সার্থক বোধ করিতে পারেন না। এজন্য সাধারণ তীর্থ গুলিতে কি উপায়ে যাওয়া যাইতে পারে, সেই সেই স্থানে যাইয়া কি কি করিতে হয়, এবং তজ্জন্য কত ব্যয়ের প্রয়োজন গৃহীমাত্রেরই তাহা অবগত হওয়া উচিত; এজন্য আমরা তীর্থযাত্রার উপায় ও ব্যয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে পাণ্ডা বা কোন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত অল্প ব্যয়ে তীর্থের সমস্ত কার্য্য সমাপন করিতে পারিবেন।

তীর্থ যাত্রার পূর্ব্বকৃত্য।—যিনি ধার্ম্মিক, পবিত্রমনা কায়িক শ্রমে সমর্থ, দম্ভ অহঙ্কারাদি দোষবিহীন, পরিমিত ভোজী জিতেন্দ্রিয়, তিনিই তীর্থের প্রকৃত ফলাধিকারী। আর যে

ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, পাপী, নাস্তিক, সন্দিগ্ধমনা, কারাণানুসন্ধায়ী তিনি তীর্থফলের অনধিকারী জানিতে হইবে। যাঁহারা উপরোক্ত, গুণশালী তাঁহারাই তীর্থগমনে শাস্ত্রলিখিত ফললাভে সমর্থ, আর যাঁহারা পাপী ও দুষ্ক্রিয়াশীল তাঁহাদের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। এজন্য তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত পাপক্ষয় কামনায় চান্দ্রায়ন অথবা গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। তাহার পর যাত্রার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রানুমোদিত শুভদিন স্থির করিয়া তাহার পূর্ব্ব তৃতীয় দিবসে হবিষ্য ভোজন, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম বিধান পূর্ব্বক তৎপরে দিবসে মস্তক মুণ্ডণ এবং তীর্থযাত্রাঙ্গ উপবাস করিবে। তাহার পরদিন প্রাতঃ স্নানাদি নিত্য কর্ম্মান্তে সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে গণেশ, ইষ্টদেবতা ও নবগ্রহের পূজা করিয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে। কুলাচারানুসারে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধও করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক এবং যাঁহাদের পিতামাতা জীবিত আছেন তাঁহারা শ্রাদ্ধ করিবেন না, কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে পারিবেন না। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও দণ্ডধারণ পূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিতে হইবে। যাত্রাকালে স্বগ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রোশ মধ্যবর্ত্তী কোন গ্রামে অবস্থিতি করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া গৈরিক বসন ও দণ্ড পরিত্যাগ বিধি। তীর্থে শ্রাদ্ধাদি ও শয়ন ভোজনাদির সময়েও উহা ধারণ করিবে না। অনন্তর দ্বিতীয় দিনে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে সেই গ্রাম অথবা বাসস্থানটী মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তীর্থাভীমুখে গমন করিবে। তাহার পর নদ্যাদিতে স্নান করিয়া একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন করিবে,

সে দিন আর অগ্রসর হইবে না। এইরূপে তীর্থ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন গমন করিবে।

যানারোহণ, ছত্র গ্রহণ বা পাদুকা ধারণ করিয়া তীর্থে গমন করিলে অর্দ্ধেক ফল লাভ হয়। বেতন ও পরান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যাইলে ষোড়শাংশের একাংশ মাত্র ফল হয়। কিন্তু ধনগর্ব্বিত হইয়া যানদ্বারা তীর্থে গমন করিলে কিছুমাত্র ফল হয় না। তীর্থযাত্রাবধি প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহ, পরপীড়ন, আমিষ ভোজন ইত্যাদি নিন্দনীয় কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিবে।

তীর্থে মলত্যাগ, মুখ ও পা ধৌত করিবে এবং নির্ম্মাল্য-ত্যাগ, মল ধৌত, তৈলমর্দ্দন, সন্তরণ, উলঙ্গ হওন, বস্ত্রনিষ্পীড়ন ক্রীড়া, বৃথা চতুর্দ্দিক্ অবলোকন, স্পর্শদোষ বিচার, অভক্তি, এক তীর্থে থাকিয়া অন্য তীর্থের প্রশংসা ও অভিলাভ, তীর্থ-পুরোহিতের পরীক্ষা ও নিন্দা, পরকে আশীর্ব্বাদ, এই সকল কাজ পরিত্যাগ করিবে। স্মার্ত্তমতে তীর্থ শ্রাদ্ধে ভূস্বামীকে দান ও পূজা করিবে না, এবং ঐ শ্রাদ্ধে আবাহন, অর্ঘদান, বিসর্জ্জন, কাক ও কুককুরাদির দৃষ্টিদোষ বিচার করিবে না।

সামান্য তীর্থ পদ্ধতি।—যানারোহণ পূর্ব্বক তীর্থে গমন করিলে তীর্থ পৌঁছিবার দিনে, যতদূর হইতে হাঁটিয়া যাইতে সামর্থ্য হয়, তত দূর হইতে যান ছত্র ও পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থে গমন করিবে। তীর্থ দৃষ্ট হইলে গাত্রে ধূলি সংলগ্ন হইতে পারে এইরূপ ভাবে পতিত হইয়া তীর্থকে নমস্কার পূর্ব্বক সংকল্প করিয়া তীর্থ প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া তোলা জলে পদধৌত করিয়া নিত্য ক্রিয়া করিবে এবং দেশ ও কাল উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া স্বস্ব বিধিদ্বারা সমুদায় কার্য্য

করিবে। প্রথম বান্ধবার্থ স্নান, পরে বৈদিক স্নান, তান্ত্রিক স্নান, তর্পণ, তৎপরে দান ও ঘটোৎসর্গ করিয়া তীর্থপদ্ধতি মত তীর্থদেবতা সকলকে দর্শন, নমস্কার, স্পর্শন পূর্ব্বক ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতি মত পূজা, এবং কুমারী পূজা ও কুমারী ভোজন করাইবে। অনন্তর নিয়মিত কালে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখে পার্ব্বণবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে।

তীর্থে তিল ও ঘৃতসহ ছাতু, তণ্ডুল, গোধূম, তিলকল্ক অথবা গুড় দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে পারা যায়। শ্রাদ্ধ কিম্বা পিণ্ডদান তীর্থের পূর্ণ দক্ষিণ কোণে এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মুহূর্ত্তে করা প্রশস্ত। শ্রাদ্ধাদির পর পিণ্ড তীর্থে নিক্ষেপ করিবে। স্ত্রীলোক এবং যাঁহাদের পিতা জীবিত থাকেন, তাঁহারা শ্রাদ্ধ করিবেন না। অনন্তর দণ্ডী, সাধু এবং সাধবা সকলকে ভোজন করাইয়া বস্ত্র দ্বারা পরিতোষ করিবে। গয়া, গঙ্গা, বিরজা, বিশালা, তীর্থ মাত্রেই তীর্থপ্রাপ্ত দিনে মুণ্ডন, উপবাস ও বিশেষ বিশেষ স্থানে যদি আর ান বিশেষ কার্য্যের ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহাও করিতে হইবে। সমর্থ হইলে ঘটোৎসর্গ, কুমারী পূজা এবং কুমারী, সাধু, সাধবা, দণ্ডীভোজন; দণ্ডীকে ছত্র বস্ত্র কমণ্ডলু আসন, সাধবা ও কুমারীকে বসন ভূষণ প্রদান করিবে। যদি দিবসের অনুপযুক্ত সময়ে তীর্থপ্রাপ্তি হয়, তবে পর দিনে সমুদয় কার্য্য করিবে, কিন্তু গঙ্গাতীর্থে অনুপযুক্তকালেও স্নান ও তর্পণাদি করা যাইতে পারে। যত দিন না তীর্থের সমুদায় কার্য্য সমাপন হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তীর্থে অবস্থিতি করিবে। সাধারণতঃ তিন দিন বাস করিলেই তীর্থ-

বাসের ফললাভ হইয়া থাকে। যে কোন কার্য্যদ্বারা স্বয়ং ফলবান্ হইবে, সেই কর্ম্মটী কামনা সহকারে করিলে যথাযোগ্য ফল লাভ হয়, কিন্তু কামনা শূন্য হইয়া করিলে মুক্তি লাভ হয়।

তীর্থকার্য্য সমাধা করিয়া স্বদেশ গমনান্তে তীর্থ প্রত্যাগমন কার্য্যাদি নিয়মানুসারে করিবে। তীর্থ হইতে স্বগ্রামের নিকট গ্রামান্তরে আসিয়া নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে সৌরমাস ও রবিরাশিস্থিতি উল্লেখে যাত্রা পদ্ধতি লিখিত দেবার্চ্চন ও শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণভোজন কর্ত্তব্য। তৎপরে আপনি জ্ঞাতিবর্গের সহিত আহার করিবে।

গঙ্গা পদ্ধতি।—গঙ্গাতে উপস্থিত হইয়া সংক্ষিপ্ত তীর্থ পদ্ধতিতে যে সকল কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমস্ত কার্য্য করিবে। তদতিরিক্ত গঙ্গা দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলীপুটে—

"ওঁ দেবি তদ্দর্শনাদেব মহাপতি কিনোমম,
বিনষ্ট মভবৎ পাপং জন্ম কোটী সমুদ্ভবং।
ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং,
সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপাং ত্বা মপশ্যং নিজ চক্ষুষা।"

এই মন্ত্র দুইটী পাঠ করিয়া পৃথিবীতে সমস্ত শরীর পাতিত করিয়া

"ওঁ নমো গঙ্গে নমো গঙ্গে গঙ্গে রাজীবলোচন,
দেহোহয়ং সার্থকো মেহন্ত্র সর্ব্বাঙ্গৈঃ প্রণমাম্যহং।
ওঁ সদ্য পাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী,
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গেব পরমা গতি।"

এই দুইটী মন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম করিবে। স্নানকালিন গঙ্গাজলে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক,—

"ওঁ গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব,

স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তু মর্হসি।
ওঁ স্বর্গারোহণ সোপানং ত্বদীয় মৃদকং শুভে,
অত স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তুতে।"

এই দুইটী মন্ত্র পাঠে ডুব দেওয়ার পূর্ব্বে অঙ্গুলি বদ্ধ হইয়া,—

"ওঁ বিষ্ণু পাদার্ঘসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি,
ধর্ম্ম দ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।
ওঁ শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমতি দেবি জাহ্নবি,
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং।"

এই দুইটী মন্ত্র পাঠে ওঁ অশ্বক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকা এবং

"ওঁ ত্বং কর্দ্দমৈ রতি স্নিগ্ধৈঃ সর্ব্ব পাপ প্রণাশনৈঃ,
ময়া সংলিপ্যতে গাত্রং মাত মে পাতকং হর।"

এই মন্ত্রে গঙ্গার কর্দ্দম গাত্রে লেপন করিয়া ডুব দিবে। স্নানান্তে গাং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারায় করন্যাস করিয়া,—

"ওঁ চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং,
রত্ন কুম্ভ সিতাম্ভোজ বরদা মভয় প্রদাং।
শ্বেত বস্ত্র পরিধানাং মুক্তা মালা বিভূষিতাং,
ততো ধ্যায়েৎ সুরূপাঞ্চ চন্দ্রাযুত সম প্রভাং।
চামরৈ র্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেত ছত্রোপশোভিতাং,
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাং।
সুধা প্লাবিত ভূপৃষ্ঠা মার্দ্র গন্ধানুলেপনাং,
ত্রৈলোক্য নমিতাং গঙ্গাং দেবতাভি রভিষ্টুতাং।
দিব্য রূপ বিভূষাঞ্চ দিব্য মাল্যানু লেপনং॥"

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ ও ধ্যান করিবে এবং "ওঁ গাং গঙ্গায়ৈঃ বিশ্বমুখ্যৈ শিব মৃতায়ৈ শান্তি প্রদায়িন্যৈ নারায়নৈঃ নমো নমঃ,"

এই মন্ত্রে গঙ্গা পূজা করিবে। পূজান্তে শিব, যমুনা, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, কৈলাস, হিমালয় ভগীরথ এই সকলকে পূজা করিয়া "ওঁ গঙ্গায়ৈ নারায়ন্যৈ শিবায়ৈব নমো নমঃ," এই মন্ত্র যথা সাধ্য যপ করিবে। তদনন্তর,—

"ওঁ সিত মকর নিষণ্ণাং শুভ্র বর্ণাং ত্রিনেত্রাং"
করধৃত কমলোদ্যৎ সুৎ পলাভিষ্ট দাত্রীং।
বিধি হরিহর রূপাং সিন্ধু কোটির চূড়াং,
কলিত সিত দুকুলাং জাহ্নবী তাং নমামি।"

এইমন্ত্রে প্রণাম করিবে। অন্যান্য সমুদায়ই সামান্য তীর্থ পদ্ধতিতে যেরূপ লিখিত হইয়াছে সেইরূপ করিবে। গঙ্গাস্নানে পর্য্যুদস্তকাল ও রজোদোষ নাই। রজোদোষটী শ্রাবন মাসের প্রথম তিন দিন মাত্র, তাহাতে দীপদান করিবে না। ক্ষেত্রবাসীরা ক্ষতা শৌচেও গঙ্গাস্নান করিতে পারে।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে পর্য্যন্ত গঙ্গার জল উত্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত গঙ্গার গর্ভ অবধি ১৫০ হস্ত পর্য্যন্ত তীর, তীর অবধি ২ ক্রোশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র এবং প্রবাহ অবধি ৪ হস্ত পর্য্যন্ত স্থানকে নারায়ণ ক্ষেত্র বলে। এই সমস্ত স্থানে যাহা করিবে তাহা গঙ্গায় করার তুল্য।

গয়া।—গয়া একটী প্রধান তীর্থ স্থান। গয়া যাইতে হইলে, কলিকাতা হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দিয়া বাঁকীপুর ষ্টেশনে নামিয়া গয়া রেলওয়ে দিয়া গয়া যাওয়া যায়। হাওড়া হইতে বাঁকীপুর যাইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪।৵১০ আনা, তথা হইতে গয়ার ভাড়া ৸৵ আনা। যাঁহারা কলিকাতা হইতে কেবলমাত্র গয়া যাইবেন, তাঁহারা ৫।০ ১০ দিলেই গয়ার

টীকিট পাইবেন। কলিকাতা হইতে কর্ডলাইন দিয়া গয়া যাইতে হইলে পথিমধ্যে বৈদ্যনাথ তীর্থ পাওয়া যায়। এজন্য বৈদ্যনাথ যাত্রীরা কলিকাতা বা মধ্যবর্ত্তী অন্য ষ্টেশন হইতে ২।।৵০ দিয়া অগ্রে বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে পারেন।'

গয়াশ্রাদ্ধে পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র ইহারা মুখ্যাধিকারী, তদ্ভিন্ন সকলেই গৌণাধিকারী হয়। উত্তমর্ণ অসবর্ণ হইলেও অধমর্ণ তাহার গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। গয়া শ্রাদ্ধে কর্ত্তৃবিশেষের নিয়ম নাই, অর্থাৎ সকলেই সকলের শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। যাহার পিতা জীবিত আছে, সেই ব্যক্তি গয়া শ্রাদ্ধ করিবেনা। যাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, পিতা জীবিত আছে, সেই ব্যক্তি যদি কোন অন্য কার্য্যবশত গয়াতে গমন করে, তবে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধের তুল্য মাত্র মাতৃ পার্ব্বণ করিবে, ইহা ত্রিস্থলী সেতু প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা বলেন। অন্যান্য মতে মাতা জীবিতই হউক কিম্বা মৃতই হউক এবং পিতা জীবিত থাকিলেও মৃত পিতামহাদির পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। সন্ন্যাসীরা সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগী, সুতরাং গয়াশ্রাদ্ধে অনধিকারী। তথাপি বিষ্ণুপদাদি শ্রাদ্ধ স্থানে মাত্র দণ্ড স্পর্শ করিবে, কিন্তু শ্রাদ্ধ তর্পনাদি করিবে না। পুত্রবতী স্ত্রীর অধিকার নাই। অনুপনীত ব্যক্তির অধিকার আছে। গয়াতে অকালে, মলমাসে, বিবাহ সংবৎসরেও শ্রাদ্ধ করিবে। সংক্রান্ত্যা- দিতে অপর পক্ষের চতুর্থী অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত দ্বাদশটী তিথিতে মকরস্থ সূর্য্যে এবং গ্রহণে গয়া শ্রাদ্ধ করিলে অতিশয় ফললাভ হয়। প্রথম দিনে ফল্গুতীর্থে যাইয়া সামান্য তীর্থ পদ্ধতিতে যে সমস্ত কর্ম্ম লিখিত হইয়াছে, যথাক্রমে সেই সমস্ত কর্ম্ম করিবে, তর্পন ও তীর্থ দেবতা বিষ্ণুর পূজা করিবে। দ্বিতীয়

দিনে, প্রেতপর্ব্বতের কৃত্য ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া গয়ার বায়ুকোণস্থ প্রেত পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকরিবে। এই প্রেতপর্ব্বত শ্রাদ্ধটী গয়ার প্রতি তীর্থে অনুবৃত্তি যাইবে। প্রেত পর্ব্বতের ক্রিয়া শেষ হইলে, তথা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গয়ার উত্তর দিকে মহানদী, পশ্চিম তীরস্থ প্রেত শিলাতে গমন করিবে। প্রেত শিলায় গিয়া প্রথমতঃ পাদ ধৌতাদি করিয়া প্রেতপর্ব্বতে যে প্রকার শ্রাদ্ধাদি করা হইয়াছে, সেই প্রকার এখানেও করিতে হইবে। প্রেত শিলার কার্য্য সমাপন করিয়া তাহার অধঃস্থিত প্রভাসাদ্রি সঙ্গত মহানদীতে রামতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ প্রভাসহ্রদে স্নান করিয়া তর্পন করিবে এবং যমবলি প্রদান করিবে। এই সমস্ত কর্ম্মে বলিদান না করিলে গয়াশ্রাদ্ধ অনর্থক হয়। তৃতীয় দিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া উত্তরমানসে গমন পূর্ব্বক স্নান ও তর্পন করিবে। এই স্থান হইতে দক্ষিণ মানসান্তর্গত উত্তর ভাগস্থ উদীচী তীর্থে গমন করিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে। প্রেত পর্ব্বতের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিবে। পরে দক্ষিণ মানসান্তর্গত মধ্যভাগস্থ কনখল তীর্থে ও তদন্তর্গত দক্ষিণ মানসে উদীচীতীর্থবং কর্ম্ম করিবে। ইহার পর মৌনী হইয়া দক্ষিণাকের পূজা করিয়া গদাধর পূর্ব্বদেশে ফল্গুতীর্থে গমন পূর্ব্বক স্নান ও তর্পন করিয়া প্রেত পর্ব্বতবং শ্রাদ্ধাদি করিবে, ইহাকে পঞ্চ তীর্থকৃত্য কার্য্যবলে, গদাধরকে দর্শন প্রণাম পূজা করিবে। পুনর্ব্বার পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা গদাধরকে স্নান করাইয়া পুষ্প বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করিবে। পঞ্চামৃত স্নান আবশ্যক নতুবা গয়াশ্রাদ্ধ বিফল হয়। চতুর্থ

দিনে ফলস্তুতীর্থে প্রাত স্নানাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া ধর্ম্মারণ্যে গিয়া মতঙ্গ বাপীতে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রেত পর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে। অনন্তর মতঙ্গ বাপীর উত্তরস্থ মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন করিবে। ব্রহ্মতীর্থ নামক ব্রহ্মকূপে গমন করিয়া স্নান তর্পন ও প্রেত পর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিয়া মহাবোধির নিকটে প্রেত পর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে ও প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। পঞ্চমদিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি করিয়া নিত্য ক্রিয়ান্তে ব্রহ্ম সরসিতে যাইয়া স্নান ও তর্পণ করিবে। ব্রহ্মকূপ সমীপে প্রেত পর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে। ফল্গুতীর্থে পিতৃমুক্তি কামনাতে কুকুর ও কাক বলি দিবে এবং তজ্জন্য অপবিত্রতা পরিহারার্থ ফল্গুতীর্থে স্নান করিবে।

ষষ্ঠ দিনে নিত্য ক্রিয়ান্তে ফল্গুতীর্থে স্নান ও তর্পণ করতঃ প্রেত পর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে। অনন্তর পদ শিলার উত্তর ভাগাস্থ গভকর্ণিকাতীর্থে তর্পণ এবং পদ শিলার উত্তরে পথ-সমীপস্থ কণকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নারসিংহ, বামন প্রভৃতির পূজা করিবে। সপ্তমদিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃ স্নানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে গদালোলে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রেত পর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে। অক্ষয় বটে গমনকরতঃ অক্ষয় বটের ছায়াতে প্রেত পর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিয়া গয়ালী ভোজন করাইবে। অনিয়ত দিনের কৃত্য পূর্ব্ব দিনে উপবাস করতঃ পর দিন প্রাতঃকালে গয়াস্থ গায়ত্রী সমুখবর্ত্তী গায়ত্রী তীর্থে যাইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া উদ্যন্ত পর্ব্বতে সাবিত্রী সমীপস্থ সুমুদিত তীর্থে গমন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করতঃ সরস্বতীর অগ্র ও পশ্চাদ্বর্ত্তী সরস্বতী তীর্থে সায়ংকালে স্নান ও সন্ধ্যা

করিবে। শিলা, লেলিহাণ, ভরতাশ্রম, মুণ্ডপৃষ্ঠ, আকাশ গঙ্গা এই সকল তীর্থে গদাধর সমীপে গিরিকর্ণমুখে শ্রাদ্ধ অথবা পিণ্ডদান পূর্ব্বক বৈতরিণীতে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি এবং বৈতরণীবিধি অনুসারে বৈতরণী দান ও বৈতরণী জলে সন্তরণ করিবে। দেবনদী. গো প্রচার, ঘৃত কুল্যা, মধুকুল্যা, গদালোল, কোটীতীর্থ, এবং রুক্মিণী কুণ্ড এই সকল তীর্থে পিতৃ সর্গ কামনাতে শ্রাদ্ধ কিম্বা পিণ্ডদান করিবে। মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটীশ্বরে পিতৃতারণ কামনায় এবং পাণ্ডু শিলাতে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি কামনাতে শ্রাদ্ধ অথবা পিণ্ড দান করিবে। সহস্র কুলের নরকোদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণুপুর গমন কামনাতে শ্রাদ্ধ করণান্তে দশাশ্বমেধ, হংসতীর্থ, মহানদী (বৈতরণী), মুখকুণ্ড এই সকল তীর্থে মুক্তিকামনায় স্নান, পিতৃ তৃপ্তি কামনাতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃসর্গ কামনাতে সঙ্গমে তারকেশ্বর প্রণাম করিয়া অশ্বমেধ সমফল প্রাপ্ত কামনাতে গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করিবে। এই কূপেই যাবতীয় আত্মঘাতীদিগের সংবৎসরের পর শ্রাদ্ধ করিবে। একবিংশতি কুলের স্বর্গ কামনাতে ভস্মকূপে ভস্মদ্বারা স্নান ও গয়ামধ্যস্থ সুষুম্নাতীর্থে মহাকালী সমীপে শ্রাদ্ধ করিবে। অশ্বমেধ সমফল প্রাপ্তির কামনাতে গৃধ্রবটের উত্তরে বশিষ্ঠ তীর্থে স্নান করিয়া বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিবে। পিতৃ ব্রহ্মলোক গমন কামনায় ধেনুকারণ্যের জলাশয়ে স্নান করিয়া কামধেনুকে নমস্কার ও কামধেনু পদে শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃসর্গ কামনায় কর্দ্দমালে গয়ানাভি ও মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবে। গয়াগজে, গয়াদিত্যে, গায়ত্রী তীর্থে, গদাধর সমীপে, গয়াতে এবং গয়াশীরে মুক্তি কামনায় পিতৃলোকের

পূজা ও শ্রাদ্ধ করিবে। যে কালেই হউক, গয়ার কোন স্থানে একবিংশতি কুলের স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় বৃষোৎসর্গ ও গয়াতে আদিগদাধরকে ধ্যান করিয়া পিত্রাদি শতকুলের নরকোদ্ধার, ব্রহ্মলোক গমন কামনায় শ্রাদ্ধ কিম্বা পিণ্ডদান করিবে।

ঋণত্রয় বিমুক্তি কামনায় পুণ্ডরিকাক্ষকে দর্শন ও স্বর্গ কামনাতে পূজা করিবে। পিতৃকুশল সহিত নিজের বিষ্ণুপুর প্রাপ্তি কামনায় ভরত আশ্রম নিকটস্থ মহানদীতে স্নান ও তর্পণ করতঃ রামেশ্বর শিবকে পূজা ও রামপদে শ্রাদ্ধ কিম্বা পিণ্ডদান করিবে। কুণ্ড পর্ব্বতে পিতৃ ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি, মতঙ্গ পদে পিতৃ স্বর্গ প্রাপ্তি, ও উদ্যন্ত পর্ব্বতে পিতৃব্রহ্মপ্রাপ্তি কামনাতে শ্রাদ্ধ; উদ্যন্ত কুণ্ডে মধ্যাহ্নে স্নান ও সন্ধ্যা করিবে। নিজের কোটীজন্মাবধি ধনাঢ্য, বেদ বেদান্ত পারগ, বিপ্রত্ব প্রাপ্তি কামনায় ও সত্য সাবিত্রী পূজা পূর্ব্বক অগস্ত্যপদে স্নান করিবে। পিত্রাদি সহ দেবপূজ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ও জন্ম নিবারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি কামনায় গয়া কুমার প্রণাম, পিত্রাদির চন্দ্রলোক প্রাপ্তি কামনায় সোমকুণ্ডে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ করিবে। সপ্ত জন্মকৃত পাপক্ষয় কামনায় কাক শিলাতে কাক বলি প্রদান করিবে। স্বর্গ প্রাপ্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক গমন কামনায় স্বর্গদ্বারের শিবকে প্রণাম এবং পিতৃ নিষ্পাপতীর্থ ব্যোমগঙ্গাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ভস্মাকূট পর্ব্বতে স্বর্গ প্রাপ্তি কামনায় ভস্মদ্বারা স্নান, অক্ষয় বট সমীপে বটেশ্বর, প্রপিতামহ, তদগ্রে রুক্মিণী কুণ্ড, তৎসমীপে কপিলা নদী, তত্তীরে কপিলেশ্বর শিব এই সকলের পূজা এবং সোমবারে অমাবস্যা হইলে স্বর্গকামনতে কপিলাতীর্থে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবে। স্বর্গকামনাতে মাহেশ্বরী কুণ্ডে ও রুক্মিণী কুণ্ডে স্নান

শ্রাদ্ধ, এবং স্ত্রীলোকেরা সৌভাগ্য কামনাতে মাহেশ্বরী কুণ্ড সমীপস্থ মঙ্গলা ও গৌরী পূজা করিবে। প্রেতকুট পর্ব্বতে পিতৃমুক্তি ও প্রেত কুণ্ডে পিতৃ লোকের প্রেতত্ব বিমুক্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। বৈকুণ্ঠস্থ হেমকুট পর্ব্বতে (গয়াতে যাহা লৌহ-দণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ) পিতৃ ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। শিবপুর প্রাপ্তি কামনায় গৃধ্রকুট পর্ব্বতে গৃধ্রেশ্বর শিবকে দর্শন, স্বর্গ কামনাতে প্রণাম, পিতৃলোক প্রাপ্তি কামনাতে গৃধ্র গুহাতে শ্রাদ্ধ, তত্রত্য মাহেশ্বরী ধারাতে পিতৃস্বর্গ কামনায় শ্রাদ্ধ, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি কামনায় মুলক্ষেত্রস্থ সরসিতে স্নান এবং নিজ শিবত্ব প্রাপ্তি কামনায় ঋণমোক্ষেশ্বর ও পাপ মোক্ষেশ্বর শিব দর্শন করিবে। ব্রহ্মবিমুক্তি ও শিবপুর প্রাপ্তি কামনায় গজরূপী গণেশ দর্শন, স্বর্গ কামনাতে স্নান গায়ত্রী ও গয়াদিত্য দর্শন, পাপনাশ কামনায় মুণ্ডপৃষ্ঠে ইন্দ্রাদি দেবতা দর্শন, গয়ানাভিতে পিতৃ ব্রহ্মপুর প্রাপ্তি, স্বর্গ প্রাপ্তি কামনায় ক্রৌঞ্চপদ পর্ব্বতস্থ জলাশয়ে পিতৃ পিতামহ ও শ্বশুর কুলের শ্রাদ্ধ করিবে। ফল বিশেষাদি অবগত হইয়া স্বর্গদ্বার, সোমকুণ্ড, বায়ুতীর্থ, আকাশ গঙ্গা, কপিলা, কাদম্বিনী গয়া, কোটতীর্থ, অগ্নিধারা, সুধুম্না পুষ্করণী, কপিলেশর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ দেবী, ক্ষেত্রপাল, বলভদ্র, সুভদ্রা, পুরুষোত্তম, সাধর, মহালক্ষ্মী, দ্বাদশাদিত্য, কপর্দ্দী, বিনায়ক, কার্ত্তিকেয় সোমনা আদি অষ্ট লিঙ্গ প্রভৃতি এই সকল তীর্থেও স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দেবতা দর্শন পূজা প্রভৃতি কার্য্য করিবে।

শ্রীক্ষেত্র।—পুরীনামক স্থানেই জগন্নাথদেবের মন্দির পুরীর পবিত্র নাম শ্রীক্ষেত্র। কলিকাতা কয়লাঘাটায় ষ্টীমার কেলে

জাহাজ) আরোহণ করিয়া একদিনের কিঞ্চিদধিক সময় মধ্যে চাঁদবালী নামক স্থানে পৌঁছান যায়। সেখান হইতে কাটা খাল দিয়া ষ্টীমারযোগে কটক যাওয়া যায়। কটক হইতে পুরী ন্যূনাধিক ১৮ ক্রোশ গোরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়। ষ্টীমারের ভাড়া সকল সময় এক থাকে না, এজন্য লিখিত হইল না। কিন্তু কোন মতে ৪৲ টাকার অধিক নহে।

তীর্থ মাত্রেই সামান্য তীর্থ পদ্ধতিউক্ত ক্রমে সমুদয় কর্ম্ম করিবে। প্রথমতঃ বিরজা তীর্থে যাইয়া নিত্য ক্রিয়ান্তে বিরজাতে স্নান তর্পণ, সপ্তকুল পবিত্র বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি কামনায় বিরজা দেবীকে দর্শন, স্বয়ং শোদ্ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক গমন কামনায় প্রণতি ও পূজা করিয়া পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি কামনাতে বিরজা তীর্থে শ্রাদ্ধ অথবা কেবল মাত্র পিণ্ডদান করত তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া পর দিবস প্রাতে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে পুরুষোত্তম দর্শনার্থ গমন করিবে। পথ মধ্যে সর্ব্ব পাপবিমুক্তি কামনায় স্নান করিবে। তৎপরে তর্পণ ও বৈতরণী দান বিধিদ্বারা গোদান, বৈতরণী জলে সন্তরণ এবং বিষ্ণুপুর প্রাপ্তি কামণাতে ক্রোড়রূপী স্বয়ম্ভু হরিকে দর্শন, নমস্কার ও পূজা করিয়া বৈতরণীতে ও নাভি গয়াতে শ্রাদ্ধ করিবে। বিষ্ণু পাদ বিনির্গত মহানদী বিত্রোৎপলাতে সর্ব্বপাপ হরণ কামনায় স্নান ও তর্পণ শ্রাদ্ধ করিয়া ভুবনেশ্বর, সাক্ষিগোপাল দর্শন নমস্কার ও পূজা করত সহসা সর্ব্বপাপমুক্তি জন্য দূর হইতে জগন্নাথের মন্দিরের উপরিস্থিত চক্রদর্শন পূর্ব্বক মার্কণ্ডেয় হ্রদে যাইয়া সর্ব্বপাপ নাশ কামনায় উত্তরাস্য হইয়া তিনটী ডুবদিবে, পরে তর্পণ করিবে। অনন্তর তত্রস্থ শিবালয়টী তিনবার প্রদ-

ক্ষিণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিবকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান তর্পণ করিয়া শিব দর্শন করিলে দশাশ্বমেধের ফল, সর্ব্বপাপ নষ্ট, শিবলোক প্রাপ্তি, প্রলয় কাল পর্য্যন্ত অতুল সম্ভোগ, পরকালে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। অনন্তর এই মার্কণ্ডেয় হ্রদেই সামান্য তীর্থ পদ্ধতুক্ত দান শ্রাদ্ধাদি সমুদয় কর্ম্ম এবং মুণ্ডন করত অক্ষয় বট সমীপে যাইয়া রাজসূয়াশ্বমেধাধিক ফল প্রাপ্তি পূর্ব্বক স্বয়ং শোদ্ধারানন্তের বিষ্ণুলোক গমন কামনায় অক্ষয় বটকে দর্শন ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার এবং পূজা করত সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপুর গমন কামনায় কৃষ্ণ সম্মুখস্থিত বেণতের (গরুর) দর্শনান্তর আনন্দপুরীতে প্রবেশ করিবে। আনন্দপুরী কৃত্যং—প্রথমতঃ নিত্য ক্রিয়া করিয়া বিষ্ণুর আয়তনটী তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিয়া পরমগতি প্রাপ্তি কামনায় বলরামকে দর্শন করিয়া বলরাম প্রাপ্তি কামণাতে বলরামকে যথাশক্তি উপচারে আবাহনাদি ত্যাগ করিয়া সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক নমস্কার করিবে।

সহস্রাশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি ও সপ্ততীর্থ স্নান দান ফল প্রাপ্তি কামনায় জগন্নাথকে দর্শন, প্রদক্ষিণ করত নমস্কার করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তি কামনায় বলরামবৎ পূজা করিয়া তদনন্তর পরমগতি প্রাপ্তি কামনায় সুভদ্রাকে দর্শন, নমস্কার পূর্ব্বক কাম্যাবিসানে বিষ্ণুপর গমন কামনায় পূজা ও নমস্কার করিবে। পরে পুরুষোত্তম নিকটে সুভদ্রা দক্ষিণে অনন্ত ফল কামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভোজনান্তর আপনাকে কৃত কৃত্য মনে করিয়া কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মন্দির প্রদক্ষিণনান্তে তাঁহাদিগের

নমস্কার পূর্ব্বক দেবাগার হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বপাপ বিমুক্তি কামনায় নরকেশরী দর্শন প্রণাম ও পূজান্ত সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্তি কামনাতে অনন্ত নামক বাসুদেব দর্শন নমস্কার ও পূজা করিবে। অনন্তর শ্বেত গঙ্গাতে গমন করত স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় কুশদ্বারা শ্বেত গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া তাহাতে স্নান ও তর্পণ করিবে। সর্ব্বলোক বিমুক্তি পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক গমন কামনায় শ্বেত সাধব দর্শন প্রণাম ও পূজা করিবে। সর্ব্বদুঃখ মুক্তি কামনায় শ্বেতসাধব সমীপস্থ সং-সাধব দর্শন নমস্কার এবং পূজা করিবে। পুনর্ব্বার অক্ষয় বট সমীপে যাইয়া মন্ত্রদ্বারা অক্ষয় বটকে প্রণাম পূর্ব্বক পূজা করিবে। এখান হইতে ১২০০ হাত ব্যবধানে উগ্রসেন দর্শনাদি করিয়া পশ্চাৎ সাগরে গমন করিবে। মহোদধি (সাগর) কৃত্যং—প্রথমতঃ শুচি হইয়া সমুদ্রজলে আচমণ পূর্ব্বক নারায়ণকে চিন্তা করিয়া ন্যাস করত সর্ব্বপাপনাশ কামনায় ডুব দিবে। পরে বিধিবৎ তর্পণ করিবে। সাগরতীরে পুরুষোত্তম পূজা করিয়া সাগরকে পূজা করিবে এবং সাগরের আহারার্থ পাষাণে প্রক্ষেপ করিবে। পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি কামনায় সাগর ফেন সাকার করিয়া তথায় শ্রাদ্ধ করিবে। অতঃপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরসীতে গমন পূর্ব্বক শুচি হইয়া আচমনানন্তর মনোমধ্যে হরিকে ধ্যান করিয়া সর্ব্বার্থ নাশ কামনায় স্নান করিয়া তর্পণ করিবে। দশাশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় পুরুষোত্তম পূজা তৎপরে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কিম্বা পিণ্ডদান করিবে। উৎকল দেশস্থ কোটী লিঙ্গাবৃত কীর্ত্তিবাসেশ্বর (শিব) দর্শন প্রণতি ও পূজা করিবে। শম্ভুগৃহে শম্ভুদর্শন নমস্কার ও পূজা করিয়া শিব-

লোক প্রাপ্তি কামনায় বিরুপাক্ষ প্রভৃতি দেবতা দর্শন করিবে। দশাশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় সূর্য্যকে পূজা, তিনবার প্রদক্ষিণ, ও সর্ব্ব কাম লাভ কামনায় অর্ঘদিয়া প্রণাম করিবে।

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যাদি।—কুরুক্ষেত্রে ১০০০০ বৎসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক এক চরণে দণ্ডায়মাণ থাকিলে যে ফললাভ হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসের সকল দ্বাদশীতে পুরুষোত্তম দর্শনাদিতে তাহার অধিক ফললাভ হয়। নানা নদী সমুদ্র জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দশম্যাদি সপ্তাহ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষ হয়। তৎকালীন স্নান, দান, দেবতা দর্শনাদি কার্য্যে নিশ্চয়ই অক্ষয় ফল লাভ হইবে। পঞ্চতীর্থে স্নান দানাদি করিয়া একাদশীতে উপবাস, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দশমীতে পুরুষোত্তম দর্শন করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। বৈশাখমাসে অক্ষয় তৃতীয়াতে পুরুষোত্তমকে গন্ধদ্বারা লেপন, জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে ব্রহ্মা, বলরামকে সুভদ্রা সহিত বিধি অনুসারে স্নান করাইলে বিষ্ণুপুর প্রাপ্তি হয়। বিষ্ণুর প্রীতিজন্য প্রতি বর্ষ আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্ল দ্বিতীয়াতে বলরাম সুভদ্রা সহিত জগন্নাথকে রথে স্থাপন করিয়া যাত্রোৎসব বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নক্ষত্রের অলাভ হইলে দ্বিতীয়াতেই এই উৎসবটী করিবে। ফাল্গুণ মাসের পূর্ণিমাতে পুরুষোত্তমকে দোলায় আরোহণ করাইয়া ক্রীড়া করিবে এবং পবিত্র হইয়া দোলাগত গোবিন্দ দর্শন ও নমস্কার করিলে জীবের গোবিন্দ-পুরে গমন হয়। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বলরাম সুভদ্রা পুরুষোত্তম দর্শন করিলে বিষ্ণুলোক গমন হয়। বিষুব সংক্রান্তিতে বিধি পূর্ব্বক পঞ্চতীর্থ করিয়া মঞ্চোপরি কৃষ্ণ

দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত যজ্ঞের ফললাভ ও বিষ্ণুলোক গমন করে। বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়াতে চন্দন ভূষিত কৃষ্ণ দর্শনে অচ্যুতপুরে গমন ও জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতে পুরুষোত্তম বলরাম সুভদ্রাকে স্নানকালীন দর্শন করিলে অক্ষয় পদ প্রাপ্তি হয়। মহা জ্যৈষ্ঠীতে দর্শন করিলে শতকুলোদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। নিয়ম পূর্ব্বক সংবৎসর অথবা ৪ মাস পুরুষোত্তমে বসতি করিলে এক এক দিনে আটযুগ কাশী বাসের ফল হয়। পুরুষোত্তমে সূর্য্য গ্রহণে সাগর জলে স্নান করিলে কোটী জন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়। পুরুষোত্তম দর্শন, সাগরে তনুত্যাগ, ব্রহ্মবিদ্যা জপ একবার মাত্র করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে, শ্মশানে, গৃহে, মণ্ডপে, গলিমধ্যে, কলাবৃক্ষ সমীপে, বট সাগর উভয়ের মধ্যে যে স্থানেই হউক ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলেই দুর্লভ মোক্ষ লাভ হইবে। লবণ সমুদ্র তীরে ইতস্ততঃ দশ যোজন বিস্তৃত পুরুষোত্তম নামক দুর্লভ ক্ষেত্র। তত্রত্য দেহী মাত্রকে দেবতারা চতুর্ভুজ দর্শন করেন। প্রবেশ মাত্র সকলেই বিষ্ণুমূর্ত্তি হয়; সেই হেতু বিচক্ষণেরা সেই স্থানে বিচার করিবেন না। তথায় চণ্ডালের স্পৃষ্টান্নও ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য, চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই সাক্ষাৎ বিষ্ণু। আষাড় মাসে কৃষ্ণ বলরামকে গুণ্ডিকা মণ্ডপে গমন কালীন যে দর্শন করে, সে নিশ্চয় মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই। রথোপরি জগন্নাথ দর্শনে পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি ও ভক্তি পূর্ব্বক দেখিলে ভগবান কর্ত্তৃক ভব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। অপুত্রা, মৃতপুত্রা, কাকবন্ধ্যা, দুর্ভগা স্ত্রী সুভদ্রা দর্শনে সহসা সভগা ও পুত্রবতী হয়।

চন্দ্রশেখর।—কলিকাতা কয়লাঘাটা হইতে প্রতি বৃহস্পতি বার প্রাতে চট্টগ্রাম যাইবার জন্য ষ্টীমার পাওয়া যায়। সেই ষ্টীমারে বুধবার রাত্রিতে আরোহন করিয়া থাকিতে হয়। বৃহস্পতিবার রওনা হইয়া শনিবার প্রাতে চট্টগ্রাম পৌঁছান যায়। সেখান হইতে চন্দ্রশেখর প্রায় ১৭। ১৮ মাইল, এই পথ গোরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়।

প্রথমতঃ নিত্য ক্রীয়ান্তে ব্যাসকুণ্ডে গমণ পূর্ব্বক অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল কামনায় স্নান, পিতৃ লোকের অক্ষয় স্বর্গ কামনায় তর্পণ করিবে। ব্যাসদেবকে পূজা করিয়া গঙ্গাস্নানসম পুণ্য প্রাপ্তি কামনায় শিবতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিয়া সামান্য তীর্থ পদ্ধতি লিখিত সমুদয় কর্ম্ম করিবে। চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে দ্বারদেশে বটুক, মতিদক্ষ, এবং নন্দীশ্বরকে পূজা করত প্রত্যেককে পাঁচটী লোষ্ট্র প্রদান করিবে। পুনর্জ্জন্মাভাব কামনায় চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহন করিয়া প্রথমতঃ পাতাল গঙ্গাতে যাইয়া পাতাল গঙ্গার জল স্পর্শ ও পরে গঙ্গ্যস্নানজ পুণ্য লাভার্থ স্নান তর্পণ সমাপ্ত করিয়া অক্ষয় ফল প্রাপ্তি কামনাতে উত্তর বাহিনী গঙ্গায় স্নান তর্পণ দান ও শ্রাদ্ধ করিবে। অক্ষয় পুণ্য প্রাপ্তি কামনায় ধর্ম্মাগ্নি দর্শন ও গন্ধ বস্ত্রাদিদ্বারা ধর্ম্মেশ্বরের পূজা করিয়া সরস দ্রব্য এবং ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র দ্বারা শক্তি অনুসারে হোম করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। ধর্ম্মাগ্নির দক্ষিণ দিকস্থ মন্মথ নদে যাইয়া মহাফল প্রাপ্তি কামনায় গাত্র মার্জ্জন এবং শত জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। এইস্থানে ছেদনীয় কেশের সংখ্যা যত হইতে তত বৎসর স্বর্গবাস কামনায় মুণ্ডন করিবে। মন্মথ নদের উত্তরস্থ

সুভগা সঙ্গমে যাইয়া সর্ব্বপাপ ক্ষয় জন্য তাহার জাল স্পর্শ, প্রয়াগস্নানজ ফলপ্রাপ্তি কামনায় স্নান ও তর্পণ ও অক্ষয় ফল লাভার্থ মধ্যাহ্নে পিতৃলোকের স্নান করিবে। এই স্থানে কপর্দ্দক দানে তাম্রদানফল, তাম্রে রৌপ্যদানফল, রৌপ্যে বহুদানফল, এবং বস্ত্রে রত্নদানসম ফল প্রাপ্তি হয়। অক্ষয় কামনায় সাগর দর্শন, অযুত যোগফলপ্রাপ্তি পূর্ব্বক সর্ব্বপাপ বিমুক্তি কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। নাভিকুণ্ডে ভয়নাশ কামনাতে স্নান ও তর্পণ করিবে এবং চ্ছেদনীয় কেশের সংখ্যা যত তত বৎসর সর্গবাস হইবে এই কামনায় মুণ্ডন করিবে। যমদ্বার গমন নিবারণ জন্য সরস্বতী শিলাতে স্বকীয় নাম লিখিবে। দশাশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ভোগী হইয়া ভববন্ধন মোচন কামনায় শম্ভুনাথ দর্শন স্পর্শ ও সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে শম্ভুনাথকে পূজা করিয়া লিঙ্গের উত্তরস্থ ছত্রাকৃতি শিলাতে একোন কোটী লিঙ্গকে দর্শন নমস্কার ও পূজা করিবে। বিংশতি কুল সহিত মোক্ষপ্রাপ্তি ও পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় লবনোদধি ও আনল দর্শন করিবে। শিব সমীপে বাসকামনায় পূজা করত আনল কুণ্ডে যথাসক্তি হোম করিয়া চন্দ্রনাথকে দর্শন, প্রনতি, স্পর্শ ও পূজা করিবে। পর্ব্বত পশ্চিমে সিদ্ধি প্রাপ্তি কামনায় বিরূপাক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার পাদোদক স্পর্শ ও মুক্তি কামনায় পান করিবে। অযুত অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি কামনায় শক্তিযুক্ত মহাদেব দর্শন করিবে। মহাপাতক বিনাশার্থ পর্ব্বতের উত্তরস্থ সহস্র ধারাতে স্নান ও তর্পণ করিবে। পুনর্জ্জন্ম নিবারণার্থ সহস্র বদন কেশশালগ্রাম শিলা দর্শনাদি করিবে। রুদ্রলোক মহীতত্ব কামনায় বাড়ব কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিবে।

মহাফল লাভার্থ ত্রিপুরা সুন্দরী ও জগদ্ধাত্রী দর্শনাদি করিয়া প্রয়াগ দ্বিগুণসম ফলপ্রাপ্তি কামনায় অশোকধারা তীর্থে মুণ্ডন করিবে।

বারানসী পদ্ধতি। কাশী—কলিকাতা হইতে রেলওয়ে ভাড়া ৬৶০ আনা। ঈষ্টঃ ইঃ রেলওয়ের মোগলসরাই ষ্টেশনে গিয়া কাশী যাইবার জন্য পৃথক গাড়িতে চাপিতে হয়। কাশীর ষ্টেশনটীর প্রকৃত নাম রাজঘাট। রাজঘাটের পর পারেই কাশী। গঙ্গা পার হইবার জন্য রাজঘাটের ঘাটে সর্ব্বদাই নৌকা পাওয়া যায়। বর্ষা ভিন্ন সকল ঋতুতেই গঙ্গার উপর একটা নৌকার সেতু থাকে।

ইহার সমুদয় কর্ম্মেই সামান্য তীর্থ পদ্ধত্যুক্ত বিশেষ নিয়ম গুলি স্মরণ করিবে। প্রথম দিনে কাশীর সন্নিহিত বরুণাতে উপস্থিত হইয়া অশেষ পাপক্ষয় কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। স্বপাপক্ষয় ও সর্ব্বসিদ্ধি কামনায় অসি ও বরুণার মধ্যস্থ বারানসী পুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ চক্রপুষ্করিণী ও মণি কর্ণিকাতে দশলক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল কামনায় বস্ত্রের সহিত স্নান ও তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের পরিতোষ পূর্ব্বক মণিকর্ণিকা-পূজা করিবে। অনেকজন্ম সম্ভূত মহাপাতকনাশ কামনায় গঙ্গাপদ্ধতি অনুসারে উত্তর বাহিণী গঙ্গায় স্নান ও তর্পণ করিয়া গঙ্গাকে পূজা করিবে। আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপানি ও মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া ঢুণ্টিরাজ-বিনায়ক (গণেশ) নিকটে গিয়া সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া ঘৃত ও সিন্দুর দ্বারা লেপন করত পাঁচটী মোদক নিবেদন করিবে। তারক জ্ঞান প্রাপ্তি জন্য জ্ঞানবাপীর জল স্পর্শ ও নন্দিকেশ্বর,

তারকেশ্বর, মহাকাল দর্শন ও পূজাদি করিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডপানি নিকটে গিয়া তাঁহার পূজা করিবে। পূর্ব্বদিকস্থিত মিত্রাবরুণ গনেশ্বর নামক দুইটী লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিবে। সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ কামনায় এবং পাপবিমুক্ত হইয়া ভববন্ধন মোচন কামনায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রীতিকামনায় সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশ্বেশ্বর লিঙ্গাত্মক ধ্যান করিবে। অন্নপূর্ণা মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন এবং অন্নদুঃখ নিবারণ কামনায় যথা শক্তি পূজা করিবে। সামান্য তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে কুমারী পূজা, দান ও শ্রাদ্ধাদি ও অবশিষ্ট কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া যথা শক্তি কাশীতে বাস করিবে। কাশী প্রাপ্তি দিনে উপবাস, তৎপর দিনে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে সৌত্রামনি যজ্ঞের ফল কামনায় ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিবে। ইহার পর দিন (অর্থাৎ তৃতীয় দিনে) কৃষ্ণ প্রতিপদ অবধি চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত, অথবা প্রতি চতুর্দ্দশীতে সেই তীর্থে স্নান তর্পণ ও সেই সেই লিঙ্গ পূজা পূর্ব্বক মৌনী হইয়া ক্রমে চতুর্দ্দশ আয়তনে যাত্রা করিবে।

প্রাতে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে প্রথমে আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু ও দণ্ডপাণিকে দর্শন প্রণাম ও পূজা করিয়া পুনর্ব্বার দণ্ড-পাণি দর্শনাদি করিবে। পরে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বপাপনাশ ও পুণ্যপ্রাপ্তি কামনায় প্রতিবাসরে অন্ত গৃহ যাত্রা করিবে। তথায় সিদ্ধিবিনায়কাদি পঞ্চ গনেশ ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া নির্ব্বাণ মণ্ডপে যাইয়া মৌনাদি অবলম্বন পূর্ব্বক মণিকর্ণিকাতে স্নান ও তর্পণ ও মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শন করিবে। কম্বল ও অশ্বতরের পূজা ও প্রণতি পূর্ব্বক বাসুকীশ্বর

অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবতাগণকে দর্শনাদি এবং যে স্থানে স্নান সম্ভাবনা আছে, তথায় স্নান তর্পণ করিয়া মৌন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া মুক্তি মণ্ডপে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া স্বীয় বাসস্থানে যাইবে। প্রতিমাসে শুক্ল তৃতীয়াতে বিশ্ববৃদ্ধিকা ও নবগৌরী মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী ও চতুর্দ্দশীতে সর্ব্ববিঘ্ননাশার্থ ষট্ পঞ্চাসশদ্বিনায়ক, ঋষি পঞ্চমী কিম্বা পঞ্চমীতে ও বিশেষ যোগে সর্ব্বধর্ম্ম পুণ্যলাভার্থ সপ্তর্ষি, রবিবংরযুক্ত ষষ্ঠী ও সপ্তমী কিম্বা রবিবারে সর্ব্বব্যাধি বিনাশার্থ দ্বাদশাদিত্য ও চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, মঙ্গল ও রবিবারে ক্ষেত্রকৃত পাপক্ষয় কামনার অষ্ট মহা ভৈরব যাত্রা করিবে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, নবরাত্র ও মঙ্গলবারে বিঘ্ননাশ ও সুমতি প্রাপ্তি কামনায় নবদুর্গা যাত্রা দুর্গাকুণ্ডে স্নান ও বলিদানাদি উপহারে দুর্গাপূজা করিবে। সর্ব্বযাত্রার ফল লাভার্থ বসন্তাদি ঋতুতে সপ্তপুরী, প্রতি মাসে ক্ষেত্রোচ্চাটন ভয় বিনাশার্থে একাদশ মহারুদ্র, শিবলোক প্রাপ্তি জন্য চতুর্দ্দশীতে প্রণবেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ, মোক্ষকামনায় অমৃতেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ও শৈলেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ, সুহস্র অপরাধ নিবারণ জন্য চতুর্থীতে অষ্ট মহালিঙ্গ, কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে চতঃষষ্ঠি যোগীণী, পঞ্চতীর্থ যাত্রা ও মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। কাশীবাস ফলপ্রাপ্তি কামনায় উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণে কাশী প্রদক্ষিণরূপ পঞ্চক্রোশী যাত্রা করিবে।

চৈত্র মাস অবধি ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসে উপরি লিখিত পক্ষ, তিথি, বার ও কামনায় স্থানাদিতে যাত্রা করিবে।

কৃষ্ণাষ্টমীতে গুরুবার পুষ্যানক্ষত্র ও ব্যতিপাত যোগ হইলে

জ্ঞান বাপী যাত্রায় কোটী গয়াশ্রাদ্ধের ফল, চতুর্দ্দশীতে আর্দ্রা নক্ষত্র হইলে রুদ্রাবাস যাত্রায় কোটী শিবপূজার ফল, মঙ্গলবার অমাবস্যায় কেদারতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে ১০১ কুলের উদ্ধার, মঙ্গল বারে চতুর্দ্দশী ও ভরণী নক্ষত্র যোগে যমতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধের ফল, মঙ্গলবারে অষ্টমী হইলে ভৈরব তীর্থে স্নান ও ভৈরব পূজনে কলিকালের ভয় নিবৃত্তি, সোমবারে অমাবস্যায় কপিলাধারা শ্রাদ্ধে গয়া শ্রাদ্ধের ফল এবং চন্দ্রকূপে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃমাতৃ ও দেবতা এই তিন ঋণ হইতে মুক্ত হয়। অন্যান্য লিঙ্গ দর্শনাদি ও কাশীস্থ যাবতীয় কূপ, বাপী ও হ্রদে স্নান তর্পণ ও প্রয়াগেশ্বর দর্শন করিয়া তৎসমীপে প্রয়াগ মুণ্ডনের ফল লাভার্থ মুণ্ডন করিবে।

কাশী মাহাত্ম্য।—কাশীক্ষেত্র কদাচ শিব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় না ও হইবে না। এইজন্য কাশীকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ সজ্ঞানে যে সকল অশুভকর্ম্ম করে, তাহা কাশী প্রবেশ মাত্রেই ভস্ম হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রটী প্রয়াগাদি শ্রেষ্ঠ তীর্থ অপেক্ষা মহত্তর। ইহাতে অল্প আয়াসে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। কাশীবাসী যে সকল ভক্ত সাধু মনুষ্যেরা সদা স্থবি হইয়া আদরে বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন, তাঁহারা সকল মোহ ভেদ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। যোগীগণ সহস্র জন্মান্তে মুক্ত হইয়া যাহা প্রাপ্ত হন, কাশীক্ষেত্রে তাহা ইহকালে প্রাপ্ত ও মরণমাত্রে নিসংশয় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম কামার্থ উদ্দেশে বিশ্বেশ্বরকে যে কিছু দান করিবে, তাহা অনন্ত কাল ফলপ্রদ হইবে। মহাদেব স্মরণে ও পূজায় জন্মমৃত্যু রহিত এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা বারানসীতে থাকিয়া জলে, স্থলে,

কিম্বা অন্তরীক্ষে তনুত্যাগ করেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁহাদের কর্ণে ব্রহ্ম প্রদান করেন। আর কাশীকে স্পর্শ করিলে সেই জন্মে কিম্বা পর জন্মে কাশীতে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। যিনি সংসারত্রাণেচ্ছু,তিনি কাশী গমন করুন। তথায় অন্নপূর্ণা অন্নদান, সরস্বতী জ্ঞানদান এবং মহাদেব মুক্তি প্রদান করিবেন। প্রতিদিন মনিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন এই দুইটী না করিয়া বৃথা দিনাতিপাত করিলে কাশীবাসীদের সেই দিনেই পিতৃগণ নিরাশ হয়েন এবং কাশীস্থ ব্যক্তিরা ঐ দিনেই কালসর্প কর্ত্তৃক দংশিত হয়। অন্যত্র পাপ করিলে কাশীতে বিনাশ, কাশীতে করিলে অন্তগ্রহে বিনাশ, অন্তগ্রহে পাপ করিলে পিশাচ নামক নরক হয়। ঐ নরকযোগ্য পাপ করিয়া কাশীর বাহিরে তনুত্যাগ করিলে কোটীকল্পেও কাশীতে জন্ম হইবে না। কিন্তু কাশীতে মৃত্যু হইলে ৩০০০ বৎসর পিশাচ যোনিতে প্রণাম পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জন্মিয়া কাশীতে বসতি করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মোক্ষ লাভ করিবে।

প্রয়াগ।—কলিকাতা হইতে প্রয়াগের ভাড়া ৭।৴১০ আনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ ষ্টেশনই প্রয়াগের ষ্টেশন। প্রয়াগের ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা যমুনা সঙ্গম স্থান এক ক্রোশের অধিক, তথায় যাইবার জন্য একা ও পাল্কী গাড়ী পাওয়া যায়। একার ভাড়া উদ্ধ সংখ্যা ।০ আনা, পাল্কী গাড়ীর ভাড়া ১৲।

পূর্ব্ব দিবসে পূর্ব্বদিকস্থিত গোতমাশ্রমের পূর্ব্বে অবস্থান করিয়া, প্রয়াগ গমন দিনে প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে প্রয়াগে প্রবেশ করত শুচি হইয়া প্রথমে বেণীতে গমন পূর্ব্বক সামান্য তীর্থ পদ্ধতি ক্রমে কর্ম্ম করিবে। কিল্বিষ বিমুক্তি ও

মোক্ষ কামনায় পশ্চিম বাহিনী গঙ্গায় এবং গঙ্গাযমুনার মধ্যে স্নান করিবে। অনন্তর সামান্য তীর্থ পদ্ধতির অবশিষ্ট কর্ম্ম সমুদয় এবং বেণীমাধবাদি তীর্থদেবতা পূজা করিয়া গঙ্গাতীরে অর্থাৎ যাহাতে ছিন্নকেশগুলি আপনাহইতে গঙ্গায় পতিত হয় সেই প্রকারে উপবিষ্ট হইয়া মুণ্ডন হইবে। প্রায়াগে স্ত্রীলোকেরাও মুণ্ডন হইবে অর্থাৎ কেশের দুই অঙ্গুল অগ্রভাগমাত্র চ্ছেদন করিবে না। সমর্থ হইলে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে সবৎস গোদান করিবে। স্বর্গপ্রাপ্তি এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় তীর্থোপবাস করিবে। এই সমস্ত সমুদয়ই সামান্য তীর্থ পদ্ধতির সমান।

দ্বিতীয় কার্য্য—প্রাতস্নানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে ঋণমোচন তীর্থে যাইয়া সকল ঋণবিমুক্তি কামনায় স্নান ও তর্পন করিবে। যমুনাতটরূপ মহাদেব স্থানে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বপাপমুক্তি কামনায় মহাদেব সমীপে যমুনাতে স্নান তর্পণ ও যমুনার জল পান করিবে। অশ্বমেধফল প্রাপ্তি কামনায় ভোগবতী তীর্থে স্নান তর্পণ করত ব্রহ্মচর্য্যরত ও জিতক্রোধ হইয়া সামুদ্র কূপে যাইয়া সর্ব্বপাপক্ষয় পূর্ব্বক অশ্বমেধ ফলপ্রাপ্তি জন্য ত্রিরাত্র বাস করিয়া হংসপ্রপতননাম কুণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞ কামনায় স্নান তর্পণ করিবে। অক্ষয় বটে যাইয়া তাহাকে প্রার্থনা পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ পূজা ও নমস্কার করিবে। সর্ব্বকুল পবিত্র কামনায় প্রয়াগ মণ্ডলাবচ্ছিন্ন যমুনায় স্নান ও যমুনার জল পান করিবে। ঐ যমুনায় একমাস স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্তি হয়। মাঘমাসে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান করিলে গজপতি মহারাজত্ব প্রাপ্তি হয়। পূর্ণিমার সন্নিহিত দিনত্রয়ে গঙ্গাযমুনার

সঙ্গমে স্নান করিলে সতীর্থ কৃত ফল প্রাপ্ত হয়। মাঘের শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমীতে স্নান করিলে সহস্র সূর্য্য গ্রহণ কালীন স্নান-ফল প্রাপ্ত হয়।

অযোধ্যা পদ্ধতি।—অযোধ্যা যাইতে হইলে কাশী হইতে যে অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড নামে রেলপথ আছে, তাহা দিয়া যাইতে হয়। কাশীতে ঐ রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে, তাহার নাম "বেনারস সিটি ষ্টেশন।" সেখান হইতে ১৷৹১৫ দিলে অযোধ্যার টিকিট পাওয়া যায়। অযোধ্যা যাইয়া প্রথমত সরযু তীর্থে সামান্য তীর্থ পদ্ধতি লিখিত কর্ম্মগুলি সম্পাদন করত গ্রামমধ্যে হনুমান নিকটে গমন পূর্ব্বক হনুমানকে পূজা করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রামকে প্রার্থনা করত নমস্কার করিবে। কৌশল্যাকে প্রার্থনা ও পূজা করিয়া দশরথ ও সীতাকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিবে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলজন্য কৃত্তিবাস শিবকে পূজা করিবে। পুনর্জ্জন্ম বারণ কামনায় জনক মহর্ষির কূপে স্নান তর্পণ ও ঐ কূপের জল পান করিবে। অন্যান্য সমুদয় সামান্য তীর্থ পদ্ধতির সমান। অযোধ্যায় অবস্থানকালে মৃত্যু হইলে পুনর্জ্জন্ম নিবারণ হয়। শ্রীরাম নবমীতে রাম উদ্দেশে যে কোন কর্ম্ম করিলে কোটী সূর্য্য গ্রহণ কালীন ফল সম ফল হয়, এবং তাহাতে উপবাস, জাগরণ ও পিতৃ তর্পণ করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। রামনবমী পুনর্ব্বসু নক্ষত্র-যুক্ত হইলে সর্ব্বকামদায়িনী এবং ঐ নবমী মধ্যাহ্নব্যাপিনী হইলে মহাপুণ্য প্রদায়িনী হয়।

মথুরা পদ্ধতি।—প্রয়াগ হইতে মথুরার ভাড়া ৬৸৹ আনা। টুণ্ডলা ষ্টেশনে পৌছিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

তাহার পর আচনেরা ষ্টেশনে মথুরার গাড়ীতে আরোহন করিলেই হইল।

মথুরায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে যমুনার বিশ্রান্তি তীর্থে বিষ্ণু-লোক মহিতত্ব কামনায় সামান্য তীর্থ পদ্ধতির নিয়মানুসারে স্নান তর্পণ পিতৃগণে তৃপ্তিজন্য শ্রাদ্ধ করিয়া সামান্য তীর্থ পদ্ধতির কর্ম্মগুলি করিবে। সর্ব্ব তীর্থের ফল প্রাপ্তি কামনায় গতশ্রম নামক দেবতা দর্শন ও পূজা করিবে। ধ্রুবলোক লাভার্থ ধ্রুব-তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। পিতৃতারণ কামনায় শ্রাদ্ধ করত মথুরানাথ সমীপে যাইবার প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বামদিকস্থিতা শ্রীরাধিকাকে সগন্ধ তুলসী ও পুষ্পাদি উপহারে যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। কেশব, ভূতেশ্বর, কংসনাথ, মহা-বিদ্যা, মথুরার অভ্যন্তরস্থ প্রয়াগ অবধি বায়ুতীর্থ পর্য্যন্ত নয়টী তীর্থে ও যমুনা, বিশ্রান্তি, ধ্রুব সমুদয়ে বারটী তীর্থে স্নান দান তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। কংসরাজভবন দেবকী বাসুদেবের কারাগৃহ, কৃষ্ণের জন্মস্থান ও পোতরাকুণ্ড দর্শন করিবে। মথুরা মাহাত্ম্যে জ্যেষ্ঠা কিম্বা মূলা নক্ষত্রযুক্ত শুক্ল দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া যমুনায় স্নান করিয়া অচ্যুত পূজা করিলে অশ্বমেধের ফল ও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করিয়া হরি দর্শনে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। মথুরাবাসী মানব নিশংসয় মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। বিষ্ণুর শয়নকালে পৃথিবীর সমুদয় তীর্থই মথুরায় গমন করে। মথুরায় যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলে ব্রাহ্মণা স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। হরিভক্ত ব্যক্তি যমু-নাতে প্রাণত্যাগ করিলে মর্ত্ত গমন নিবারণ ও বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়, বিশ্রান্তি তীর্থে স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।

এই তীর্থের স্নান ফলটী যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান, সংযমেও দুর্ল্লভ।

বৃন্দাবন পদ্ধতি।—মথুরা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে বৃন্দাবন যাওয়া যায়। প্রত্যেক গাড়ীর ভাড়া এক টাকার অধিক নাই।

বৃন্দাবনে যাইয়া প্রথমতঃ যমুনায় কেশীঘাটে শতকোটী গঙ্গাস্নানসম ফলপ্রাপ্তি কামনায় সামান্য তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে স্নান ও তর্পণ করিয়া দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, উপবাস ও মুণ্ডন করিবে। গোবিন্দ, ভ্রমর, চিড় প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি ঘাটে স্নান ও তর্পণ করিয়া গোবিন্দ স্থানে গমন পূর্ব্বক গোবিন্দ ও রাধিকাকে স্তব করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে। গুপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমন, মদনমোহণ, রাধা দামোদর ও শ্যাম সুন্দরকে নমস্কার ও পূজাদি করিবে। কেশব, মহাদেব, গোকর্ণেশ্বর ও বৃন্দাদেবী প্রভৃতিকে দর্শনাদি করিবে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোবর্দ্ধনের প্রার্থনা করত তত্রস্থ মানগঙ্গা, কৃষ্ণ সরোবর, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি চতুরাশীতি কুণ্ডে যথাশক্তি স্নান তর্পণ করিবে। বৃন্দাবনস্থ ব্রহ্মকুণ্ড, দাবানল কুণ্ড ও গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিবে। অনন্তর যমুনার পরপারে গোকুলে যাইয়া স্নান তর্পণ করিয়া গোপেশ্বর, নন্দ, উপনন্দ, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণ, বলরাম শ্রীরাধিকা ও শ্রীদামাদির দর্শনাদি করিবে। বিল্ববনে মহালক্ষ্মী দর্শন করিবে। গোবিন্দ স্থান হইতে নানা স্থানরূপ দল সমূহে যথাশক্তি ভ্রমন ও দর্শন করিবে।

হরিদ্বার পদ্ধতি।—কাশী হইতে অযোধ্যা রোহিল খণ্ড রেলপথে যাইলে হরিদ্বার যাইতে পারা যায়। ভাড়া কাশী হইতে

৬ ৷৵৹৫ আনা। লকসর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া হরিদ্বার যাইতে হইবে।

হরিদ্বারে গিয়া প্রথমতঃ গঙ্গাদ্বারে যাইয়া তথায় সামান্য তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে কোটীতীর্থ কামনায় স্নান তর্পণ করিয়া তীর্থ পদ্ধতির অবশিষ্ট কর্ম্ম সমুদয় করিবে। তত্রস্থ বেণীমাধব ও গঙ্গাধর প্রভৃতি দেবতাকে দর্শন নমস্কার ও পূজাদি করিবে। গঙ্গাদ্বারটী স্বর্গদ্বার তুল্য। এখানে স্নান করিলে কোটী তীর্থের ফল ও পুণ্ডরীকত্ব প্রাপ্তি এবং কুলোদ্ধার হয়। গঙ্গা সর্ব্বত্রই সুলভ, কিন্তু হরিদ্বারে, প্রয়াগে ও সাগরের সঙ্গমস্থলে দুর্লভ। দৈবযোগে গঙ্গাদ্বারে যদি মনুষ্য পক্ষীকীটাদি প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়। হরিদ্বারে এক রাত্র বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়।

বৈদ্যনাথ পদ্ধতি।—বৈদ্যনাথে গিয়া প্রথমতঃ শিব-গঙ্গাতে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়ান্তে বৈদ্যনাথ নিকটে গমন পূর্ব্বক সহস্র অশ্বমেধ ফল কামনায় দর্শন এবং সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বৈদ্যনাথ প্রীতি জন্য সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে পূজা এবং তত্রস্থ ভগবতীর হৃদয় পীঠাবস্থিত জয়দুর্গার, অরোগাদেবীর ও অন্যান দেবতার পূজা করিবে।

কামাখ্যা পদ্ধতি।—উত্তর বঙ্গ রেলপথে পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত গিয়া, ধুবড়ি যাইবার জন্য গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ধুবড়ী হইতে ষ্টীমারে গোহাটী পৌঁছিলে কামাখ্যা দেবীর পাহাড় প্রায় ৩ মাইল গাড়ীতে যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে ধুবড়ীর ভাড়া ৪ ৷৶৹। ধুবড়ী পৌঁছিয়া গোহাটী যাইবার ষ্টীমার পাওয়া যায়।

কামাখ্যায় গিয়া প্রথমে নিত্য ক্রিয়ান্তে নীলাচলের পূজা করিয়া পুনর্জ্জন্ম নিবারণ কামনায় গৌরী শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদ্বারস্থ সৌভাগ্য কুণ্ডে গমন করিয়া সামান্য তীর্থ পদ্ধতি লিখিত কর্ম্ম সমুদয় করিয়া স্নান ও তর্পণ করিয়া সিদ্ধগণেশ ও কমল নামক বিষ্ণুকে দর্শন করিবে। ব্রহ্মকুণ্ডাবধি দুর্গাকুণ্ড পর্য্যন্ত দশটী কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিবে। মনোভব গুহাতে কুব্জিকা পীঠস্থ সতীর যোনী মণ্ডলস্থ কামাখ্যা দেবীর নিকটে যাইয়া জন্মান্তরিক অনেক পাপনাশার্থ প্রদক্ষিণ, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি কামনায় দর্শন, অভিষ্টপ্রাপ্তি কামনায় ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার ও পুনর্জ্জন্ম নিবারণ কামনায় কামাখ্যা দেবীর যোনী মণ্ডল স্পর্শ করিবে। পরে কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়া সিন্দুর কুম্কুম্ দ্বারা যোনী পীঠ লেপণ করত কালী, তারা, ত্রিপুরা ও গুপ্ত কামাদি অষ্ট যোগিনী দেবতা দিগের যথাশক্তি পূজা করিবে। পূজান্তে স্বীয় ইষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিবে। এই স্থলে যোনী পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া দশবারমাত্র জপ করিলে সমুদয় মন্ত্রই সিদ্ধ হয়। ফলার্থী ব্যক্তি পুরশ্চরণ ও কুমারী পূজা অবশ্য করিবে। অন্য সমুদয় সামান্য তীর্থ পদ্ধতির সমান। টাকরেশ্বরী, দীর্ঘেশ্বরী, প্রচণ্ডিকা, চণ্ডঘণ্ট প্রভৃতি দেবতাকে দর্শন করিবে। ধর্ম্মদ্বারে প্রবেশ ও নির্গমন, স্বর্গদ্বার দর্শন, ভৈরব গুহাতে ও সিদ্ধ গঙ্গাতে স্নান করিবে। কামাখ্যা দর্শন অম্বুবাচী সময়ে প্রশস্ত।

ব্রহ্মপুত্র পদ্ধতি।—ঢাকার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ। ইহার যে কোন স্থানে স্নান করিলে ব্রহ্মপুত্র তীর্থের ফলভোগী হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্নান করিবার প্রথা না থাকায় গন্তব্য পথের বিবরণ লিখিত হইল না।

ব্রহ্মপুত্রের ক্ষেত্রে গিয়া নিত্য ক্রিয়ান্তে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রের তীরে গমন করিয়া ভবঘোর দুঃখ হরণ ও পুনর্জ্জন্ম নিবারণ কামনায় দর্শন, ত্রিজন্মজ পাপ হরণ কামনায় নমস্কার, মুক্তি কামনাতে স্পর্শ, ব্রহ্মহত্যাপাপসম পাপক্ষয় কামনায় ব্রহ্মপুত্র জলদ্বারা মস্তক তিনবার অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক সামান্য তীর্থ পদ্ধতি লিখিত কর্ম্ম সমুদয় করিবে। স্নানের পূর্ব্বাপর সপ্ত পুরু-ষোদ্ধার ও মোক্ষপ্রাপ্তি কামনায় ডুবদেওয়ার পূর্ব্বে এবং মৃত্তিকা স্নানের পর স্নান ও তর্পণ করিয়া ভববন্ধন মুক্তি কামনায় অর্ঘ প্রদান করিবে। চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে স্নানে সর্ব্বতীর্থ ফলসম ফল প্রাপ্তি ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। অনন্তর দানাদি কার্য্যাবসানে ব্রহ্মপুত্রের পূজা করিয়া সর্ব্বপাপ বিমুক্তি ও ব্রহ্মলোক মহিতত্ব কামনায় ব্রহ্মপুত্র সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তবপাঠ ও অশোকাষ্টমীতে অশোককলিকা জলের সহিত পান করিবে।

ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য।—ব্রহ্মপুত্রের কথা শ্রবণে পাপমুক্ত হয়, দর্শনে পুনর্জন্ম নিবারণ হয়। স্পর্শ করিলে মুক্তি, স্নান করিলে মোক্ষলাভ এবং দূরে থাকিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলপান করিলেও যশ লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মপুত্রে বাস করিলে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গাসাগর পৃথিবী সমুদয় তীর্থের ও কাশীবাসের ফললাভ হয়।

গঙ্গাসাগর পদ্ধতি।—পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর দর্শন ও তথায় পূজা ও তর্পণাদিতে বহুপুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। এজন্য সকলে ঐ সময়ে তথায় গমন করিয়া থাকে। অন্যান্য সময়ে সাগরসঙ্গম যাত্রা বড় ক্লেশকর, এজন্য

কেহ মকর সংক্রান্তি ব্যতীত তথায় গমন করেন না। পৌষ সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে যাত্রী লইয়া ২। ৩ খানি ষ্টীমার তথায় যাত্রা করে। ঐ সময়ে কলিকাতা আর্ম্মনি ঘাটে কদম্মতলার ঘাটে তথ্য লইলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায়।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে অথবা অন্য দিনেও গঙ্গা সাগরে যাইয়া সামান্য তীর্থ পদ্ধত্যুক্ত সমুদয় কর্ম্ম করিবে। প্রথমতঃ তথায় উপনীত হইয়াই পদ ধূলি ধৌত না করিয়া শঙ্কেত সাধবের নিকট গমন করিয়া সপ্ত কুলোদ্ধার ও মুক্তি কামনায় তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিবে। অন্যত্র উদ্ধৃত জলদ্বারা পাদ প্রক্ষালন করিয়া নিত্য ক্রিয়ান্তে বরুণকুণ্ডে যাইয়া মহাপাতকাদি ও সর্ব্ব পাতকক্ষয় কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। তারগঙ্গায় স্নান ও তর্পণ করিবে। সর্ব্বজন্মকৃত পাপক্ষয় ও দুস্তর ভবসাগর তারণ কামনায় কপিল মুনিকে দর্শন করিয়া সংসার বিমোচন কামনায় পূজা করিবে। তারগঙ্গার বায়ু কোণস্থ ভগীরথকে পূজা করিয়া দশকুলোদ্ধার কামনায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবে। পরে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে যাইয়া সর্ব্ব পাতক ক্ষয় কামনাতে স্নান তর্পণ করিবে। অনন্তর সমুদ্রে গমন করত পুরুষোত্তম পদ্ধতির মহোদধি কৃত্যস্নানাদি সমুদয় সাগরকৃত্য গুলি রিত্যানুসারে সমাপন করিয়া সামান্য তীর্থ পদ্ধতির অবশিষ্ট কর্ম্ম গুলি সমাপন করিবে। ক্ষীর বর্ণ হরিকে দর্শন পূজা করিয়া মাধবের দর্শন ও পূজা করিবে। শিবকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিবে। পুনর্জ্জন্ম নিবারণ কামনায় অমরেশ্বরকে দর্শন করিয়া পূজা করিবে। কোটী তীর্থে স্নান ও তর্পণ করত কার্ত্তিকেয়

গরুড়, সাগরাদিত্য ও ঋতেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করিবে ষষ্ঠী দেবীকে দর্শন ও পূজা করিয়া ভারত তীর্থে স্নানাদি করিবে। হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম স্থলে স্নান করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবপুরে গমন হয়। মাঘ মাসে একদিন সাগরে স্নান করিলেই প্রয়াগ স্নানের ফল প্রাপ্তি হয়। একাদশীতে সাগরে স্নান করিলে যোগী ব্যক্তি কাশীতে মরিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গার জলমধ্যে তনুত্যাগ হইলে ও কাশীতে গঙ্গা সাগর সঙ্গমে জলে, স্থলে, কিম্বা অন্তরীক্ষে মৃত্যু হইলে নিশ্চয় মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই মৃত ব্যক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সহিত অক্ষয় পদ ভোগ করিবে।

বিবিধ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রিক জ্ঞান।

সজ্জায়তে যেন তদস্ত দোষং,
শুদ্ধং পরং নির্ম্মল মেক রূপং।
সং দৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা,
তজ্‌জ্ঞান মজ্ঞান মতো হন্যদুক্তম্‌।

যদ্দ্বারা সকল প্রকার দোষহীন শুদ্ধ সকলের শ্রেষ্ঠ ও নির্বি-কার পরমেশ্বরকে জানা যায়, দেখা যায়, বা লাভ করা যায়, তাহার নাম জ্ঞান, এতদ্ব্যতীত কিছু তাহা অজ্ঞান পদ বাচ্য।

অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপোযজ্ঞস্তথৈবচ,
তীর্থযাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়া ছিলেন যে, "হে অর্জ্জুন! যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ তত্ত্ব জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহারা অসংখ্য কর্ম্মকাণ্ডের এবং অশৌচ, তপ, যজ্ঞ ও তীর্থ যাত্রাদি বিষয়ের অনুপান করে।

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গো হর্পিতুমীশ্বরে,
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচানার্থা ফলশ্রুতিঃ।

যে সকল বেদোক্ত কার্য্য করিবে অনাসক্তচিত্তে সম্পন্ন করিয়া তাহাদের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য কর্ম্ম হইতে বিরতি লাভ করিতে পারিলে তবে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, নতুবা স্বর্গসুখাদি নানা প্রকার ফল শ্রুতির কথা শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অজ্ঞান লোকদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে আশক্তি উত্তেজনার জন্য।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জ্জুন তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেন ভাবত,
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বা জীবকে যন্ত্রারূঢ়ের মত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত করেন। হে ভারত! সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাঁহার অনুগ্রহে তুমি উৎকৃষ্ট শান্তিরূপ মুক্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনু মন্যে প্রজাপতিং,
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং।

পরমাত্মকে কেহ অগ্নিরূপে, কেহ মনু বা প্রজাপতি রূপে, কেহ তাঁহাকে ইন্দ্ররূপে, কেহ বা প্রাণরূপে এবং কেহ কেহ বা সনাতন ব্রহ্মরূপে তাঁহার উপসনা করিয়া থাকেন।

যথা শিব স্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ,
নানয়োরন্তরং বিদ্যা চ চন্দ্র চন্দ্রিকয়োর্যথা।

চন্দ্র ও তাহার জ্যোতি এতদুভয়ের যেমন পৃথক স্বত্ত্বা

হইতে পারে না, সেইরূপ শিব এবং দেবীর পরস্পর পৃথক সত্ত্বা আছে এমন কখন মনে করিও না।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ রূপমমৃতং,
যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু। তিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি শান্তিস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ অদ্বিতীয়, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য,
ন চক্ষুসা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তো,
য এতদ্বিদুর মৃতাস্তে ভবন্তি।

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান না। তিনি হৃদয়গতে সংশয়রহিত, বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা এইরূপে তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর।

মৃগৈর্গজানাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা,
গজানঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে।

যেরূপ মৃগদ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী এবং গজ দ্বারা গজ ধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থ ঈশ্বর কেবল জ্ঞান দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকেন।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে,
নামরূপং ন যস্যৈকো যোহস্তিত্বে নোপলভ্যতে।

যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই কেবল আছেন এই মাত্ররূপে

যাঁহাকে জানা যায়, বিশ্বের সেই মহান্ আত্মাকে বার বার নমস্কার করি।

ন চক্ষুসা গৃহ্যতে নাপি বাচা,
নর্ন্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মনা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব,
স্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কালং ধ্যায়মানঃ।

চক্ষু, বাক্য বা অপরাপর ইন্দ্রিয়দ্বারা অথবা তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না, কেবল বিশুদ্ধ স্বত্ত্ব ব্যক্তিরা জ্ঞানপ্রসাদে ধ্যানকরতঃ সেই নিষ্কলঙ্ক পুরুষকে দেখিতে পান।

নিত্যমন্তর্বিচারস্য পশ্যতশ্চঞ্চলং জগৎ,
জনকস্যেব কালেন স্বয়মাত্মা প্রসীদতি।

যিনি আপনার মনের মধ্যে সর্ব্বদা বিচার পরায়ণ হয়েন, এবং ইহ জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ীরূপে দর্শন করেন, রাজর্ষি জনকের ন্যায় আত্মা কালেক্রমে তাঁহার প্রতিও আপনা হইতে প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রহেলিকা (হেঁয়ালী)।

পাখি নয় পক্ষ দুটী আছয়ে তাহার,
সাদা কাল দেখিবারে অতি চমৎকার।

ধরিয়া রাখিতে তারে নারে কোন জন,
কোথাদিয়া চলে যায় না হয় দর্শন।

উত্তর—মাস।

ঝড়ের আগেতে ছুটি পা পাখা বিহীন,
দেখিতে না পাই কভু, কল্পনা অধীন।
ভাল মন্দ বিচার করিতে আগে চাই,
বিকৃত হইলে পরে আপনা হারাই।
সকলের আছে কিন্তু ভাল আর মন্দ,
সাবধানে বল যেন নাহি লাগে ধন্দ।

উত্তর—মন।

রাজার কপোত আমি দেখিতে সুন্দর,
দুইপক্ষে উড়ে যাই দেশ দেশান্তর।
শুভাশুভ বার্ত্তা বহি চাকরের মত,
ইহাতে সাধনা করি উপকার কত।
যার কাছে যাই এত ক্লেশেরে সহিয়া,
সেই মোর পক্ষ কাটি দেয় তাড়াইয়া।

উত্তর—রিপ্লাই পোষ্টকার্ড।

অর্থহীন বটে কিন্তু রাজা আমি হই,
পোষাকে ভড়ং খুব বহুব্যয়ী নই।
প্রজা নাই কিন্তু তার অধিপতি হই,
বিলাসী এত যে সদা কুসুমেতে শুই।

কে আমি চিনিতে পার পাঠক সুজন,
পথে ঘাটে ঝোপে ঝাপে সদা দরশন।

উত্তর—প্রজাপতি।

জাতিতে রাক্ষস আমি হিংসা নাহি করি,
শুনিলে নিজের নাম নিজে ভয়ে মরি।
ধার্ম্মিক বলিয়া আমি হয়েছি অমর,
বলদেখি কেবা আমি হে পাঠক বর।

উত্তর—বিভীষণ।

বহুমূল্য বটে আমি টাকাতে না পাও,
সর্ব্বস্থানে আছি যথা তথা তুমি চাও।
সকলের অধিকার সমান আমাতে,
ধনী বা দরিদ্র সবাকার হাতে।
আমার মহিমা যেবা বুঝিবারে পারে;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিতে পারি তারে।
বুঝিতে না পারে যেবা শত্রু হই তার,
জীবন কাড়িয়া লই করহ বিচার।
বলহ পাঠক, আমি কেবা হেন জন,
মোরে না চিনিয়া থাক, ঘোর বিড়ম্বন।

উত্তর—সময়।

হাত পা নাই মম নাই চোখ কাণ,
অশরীরী বটে কিন্তু আছে মোর নাম।
কবির চিন্তায় আমি প্রধান সহায়
আমাকে পাইলে আর কিছুনাহি চায়।

কুসুম ফুটায় আর কোকিলে গাহায়,
আকাশ কাটায় কিম্বা পর্ব্বত চূর্ণায়।
কথা ঘরে ভাঙ্গি আমি নিজে এতক্ষীণ,
কে আমি বলহ দেখি পাঠক প্রবীণ।

উত্তর—নিস্তব্ধতা।

সত্যবটে ছোট আমি হই আকারেতে,
যা দেখাবে তাই কিন্তু আছে উদরেতে।
বনিতা বিলাস আমি প্রিয়জন তরে,
আমার আদর কত বাড়ে তার করে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ কারে নাহি ডরি,
সুখী দীন দুঃখী রাজা প্রজা আদি করি।
আমার কাছেতে কারো নারহে খাতির,
ব্যভারে সমান আমি বুঝিবে সুধীর।
পরিচয় দিনু এই বুঝ দেখি সবে,
কেবা আমি কোথা মোরে দেখিয়াছ কবে?

উত্তর—আর্‌সী।

বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা,
নাচয়ে সারথি তার পসারিয়া গা।
হিয়ালী প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহমতি,
অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি।

উত্তর—ঘুড়ি।

জীয়ন্তেতে মৌনী সে মরিলে ভাল ডাকে,
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে।

অবশ্য আনয়ে নরমঙ্গল বিধানে,
চতুর্ব্বর্ণে চুম্বে তার পবিত্র বদনে।

উত্তর—শঙ্খ।

রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই,
জীবকালে স্থানে স্থানে চরমে এক ঠাঁই।
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।

উত্তর—পাশার বল।

তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে,
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে।
উগরয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান,
সখা সঙ্গে আলিঙ্গন ত্যজয়ে পরান।

উত্তর—অগ্নি।

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় থাকে নিরাহার।
যখন পুরুষ বর হয় বলবান,
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান।

উত্তর—ডিম্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হাসির কথা।

শরৎকাল, কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশ অবনী সুধা মাখিয়া আনন্দে বিভোর, মুখভরা হাসি হাসিতেছে। একজন বৃদ্ধ তাহার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রকে লইয়া লক্ষ্মীপূজার নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইতেছেন। পুষ্করণীর জলে মৎস্যগুলি সাঁতার দিতেছে। আহ্লাদের আবেগে তাহারা মধ্যে মধ্যে একটু অস্থির হইয়া উঠিতেছে। সেই অস্থিরতায় জল স্থির নহে; জলের নড়ন চড়নের বিলক্ষণ শব্দ হইয়া রজনীর নিস্তব্ধতা নষ্ট করিতেছে। বৃদ্ধের পৌত্রটী নিতান্ত সাবালক নয়, বুদ্ধি শুদ্ধি ততটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয়, "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এই জ্ঞানে আপন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা. মাচ দিনের বেলা পুষ্করণীতে থাকে, রাত্রে কোথায় যায়?" পিতা উত্তর করিলেন, "রাত্রে তারা গাছে পালায় থাকে বাবা, আর কোথায় যাবে? তাদের কি ঘর দোর আছে?" পিতার পিতা না হইলে পিতামহ হয় না, সুতরাং তিনি বিদ্যা বুদ্ধিতে পিতার বড় হওয়া চাই। সুমূর্খ বলিলে যেমন মূর্খের চূড়ান্ত বুঝিতে হয়, এই সম্প্রদায়ের পিতা অপেক্ষা পিতামহের তৎপক্ষীয় উৎকর্ষ অনুমান করিতে হইবে। বালকের পিতার কথায় পিতামহ উত্তর করিলেন। "একি কুকুর শিয়াল যে, গাছে পালায় থাক্‌বে?" প্রপিতামহ পিতামহের পিতা সুতরাং তিনি বলিলেন, "তা হ'লে যে উড়ে যেত!"

আত্মদোষক্ষালনের ছল।

কবিরাজ মহাশয় একটী স্ত্রীলোকের তিনটী পুত্রের চিকিৎসা করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনটীকেই লোকান্তরে পাঠাইয়া দেন। স্ত্রীলোকটীর আর একটী মাত্র পুত্র জীবিত। কালে সেও পীড়িত হইল, চিকিৎসা সেই কবিরাজ মহাশয়!

স্ত্রীলোকটী যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া পুত্রের আরোগ্য কামনায় অনেক কান্না কাটি করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিল। কবিরাজ মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেন তেন প্রকারেণ তাহার পুত্রকে সুস্থ করিবেন, নতুবা কিছু হস্তগত হয় না। অদৃষ্টদোষে স্ত্রীলোকটীর এ ছেলেটীও মারা গেল। কবিরাজ মহাশয় পাড়ায় আসিয়াছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে কবিরাজ মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা ও তৎসূত্রে অর্থগ্রহণের কথা উল্লেখ করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন, "বেটি—মড়াঞ্চে, তোর্ কোন্ ছেলেটা বেঁচেছে বল দেখি, যে এটা বাঁচবে? আপনার গর্ভের দোষ স্বীকার না করে কবিরাজের দোষ দিস্!"

স্ত্রীলোকটী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলেন।

কুসংস্কারের প্রশ্রয়।

কোন জেলার জজসাহেবের ধারণা, বেঁটে মানুষ মাত্রেই দুষ্ট, এজন্য তিনি বেঁটে লোকের মোকর্দ্দমা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এক জন বেঁটে সেই জজের নিকট একটী মোকর্দ্দমার নালিশ করিতে যায়। আদালতের সকল উকীলই

জজ-সাহেবের মেজাজ বুঝিতেন, তাঁহারা তাহার ওকালতনামা লইলেন না। শেষে তাহার উকীল জুটিয়া উঠা ভার হইল। বেঁটে পরিশেষে এক খানি দরখাস্ত নিজে লিখিয়া সাহেবের নিকট দাখিল করিবামাত্র তিনি দরখাস্ত খানি ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তখন সেই বেঁটে গললগ্নকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "হুজুর, আমি যাহার নামে নালিশ করিতেছি সে আমা অপেক্ষাও বেঁটে।"

মাতালের চৈতন্য।

খোলাভাটীর কল্যাণে দেশে ভদ্রাভদ্রের মধ্যে মাতালের অপ্রতুলতা নাই। একটী ভদ্রসন্তান "ন মাতা ন পিতা," সংসারে কেবল মাত্র একটী অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভ্রাতা আছে। ভদ্রসন্তান প্রতি দিত প্রাতঃকালে শৌণ্ডিকালয় যান, ভাইটী এর্ দোর্ তার্ দোর্ করিয়া বেড়ায়। দাদা আসিয়া কোন দিন রন্ধন করেন, কোন দিন না করেন, বালক ভ্রাতার দিন এইরূপে সুখে দুঃখে চলিয়া যায়। এক দিন তাহার জেষ্ঠ কিছু অধিক মাত্রায় সুরা-পান করিয়া টলিতে টলিতে বাড়ীতে আসিলেন। বালকটী তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অভিভুত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে তদবস্থায় দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, শোকের তরঙ্গ তাঁহার মনে উচ্চ হইতেও উচ্চতর রূপে উঠিতে লাগিল; ক্রমে কুলকিনারা অতিক্রম করিয়া, তিনি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনুজের জন্য বিলক্ষণ শোক তাপ করিলেন, অবশেষে তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন ঠিক্ ঠাক্ করিয়া শয্যাসহ কনিষ্ঠকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঁধনির জোরে কনিষ্ঠের

নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে কাঁদিতে লাগিল। একটা ডামা ডোল পড়িয়া গেল। পাড়ার লোক উপস্থিত হইয়া মদ্যপায়ী জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল, কনিষ্ঠকে বাঁধা হইতেছে কেন? জ্যেষ্ঠ পূর্ব্ববৎ শোক তাপ করিয়া উত্তর করিলেন, "আমি অভাগা বাঁচিয়া রহিলাম, আর ভাই আমার মারা গেল, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?"

প্রতিবাসী। ও যে কাঁদ্‌চে, বাঁধুনি খুলিয়া দাও।

জ্যেষ্ঠ। ও ছেলে মানুষ, ওত কাঁদিবেই, ওর বোধ কি?

চারি মূর্খ।

স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বড় কাব্যানুরাগী ছিলেন। তিনি কবিদিগকে বড় আদর করিতেন, তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিতেন। যিনি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইতেন, তিনিই তাঁহার নিকট কিছু না কিছু পাইতেন।

একদা চারিটী মূর্খ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির লোভে রাজবাটী যাত্রা করিল। কিন্তু কবিতা না বলিতে পারিলে বিশেষ সমাদর বা অর্থলাভ ঘটিবেনা, এজন্য সকলেই চিন্তিত। অতএব চারি জনে মিলিয়া একটী কবিতাও প্রস্তুত করা চাই, তাহা না হইলে সে যাত্রা কোন ফল ফলিবে না। ভাবিতে ভাবিতে প্রথম ব্যক্তির মস্তকে একটীপংক্তি মিলিল,—

"প্রভাত কালের সূর্য্য যেন তাম্র গাড়ু।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার মিল দিলেন;—

"ভাদ্র মাসের কেশে ফুল বক চরু চরু।"

তৃতীয় ব্যক্তি অনেক চিন্তার পর বলিলেন;—

"চর্ব্ব চরু।"

চতুর্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নীরেট, তাঁহার আর কিছুই জুটিল না। তিনি বড়ই চিন্তাকুল, তাহার মধ্যে আবার একটু ঈর্ষাও জন্মিয়াছে। সকলেই এক এক পুংক্তি জুটাইল, তাঁহা হইতে হইল না, অতএব মনে একটু আত্মলাঞ্ছনাও জন্মিতেছে। আপনি যে নিতান্ত ঈশ্বরবিড়ম্বিত তাহাও এক একবার মনে হইতেছে, এমন সময় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত চন্দ্র রায় সেই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। শোযোক্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলকে আমোদ আহ্লাদ কত্তে দেখ্‌ছি, তুমি ঠাকুর বিমর্ষ কেন?" তখন সেব্যক্তি অদ্যা-পান্ত সকলই বলিল। ভারত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অপর ব্যক্তিরা কিরূপ কবিতা প্রস্তুত করিয়াছেন।

উত্তর। একজন করিয়াছেন, "প্রভাত কালের সূর্য্য যেন তাম্রগাড়ু।" দ্বিতীয়।—"ভাদ্র মাসের কেশে ফুল বক চরু চরু।" তৃতীয়।—"চর্ব্ব চরু।"

ভারত বলিলেন তুমি বলিবে, "আমরা চার বামুন নয়, চার গোরু।" চতুর্থ ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। রাজার নিকট তিনিই অধিক আদৃত ও পরিষ্কৃত হইলেন।

ভাগ্যে জামাই খোট্টাবোঝে।

এক ব্রাহ্মণের একটী মাত্র কন্যা, পুত্র নাই। তাঁহার কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পতি আছে, ব্রহ্মোত্তর জমির খাজানার আয় ও টাকার সুদে সংসারটী বেশ সচ্ছলে চলে, কোন অভাব থাকেনা। কন্যাটী এখন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা। ক্রমে তাহার বয়স হইতেছে, দুই এক বৎসর করিয়া অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ নানা

স্থানে পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কোথাও মনোমত পাত্র মিলিতেছে না। ব্রাহ্মনের ইচ্ছা আপনি যেমন অপুত্রক, তেমনি যাঁহাকে জামাতা করিবেন তিনি তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবেন, বিষয় কর্ম্ম মালি মোকর্দ্দমা বুঝিবেন, তাহা হইলে আর আপনাকে কোন ঝঞ্ঝাটি ভোগ করিতে হইবে না, কন্যাদায় হইতে অব্যাহতিও পাইবেন, আর সেই সঙ্গে একটা সরকার বলিলে হয়, নায়েব বলিলে হয়, অথবা মোকর্দ্দমা আমলার তদ্‌বিরকারক এমনতর একটা লোক বিনাবেতনে পেট্‌ ভাতায় মিলিবে।

নিতান্ত অকর্ম্মন্য, অনাশ্রয় ভিন্ন কেহ এমন অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়েন না; সুতরাং ব্রাহ্মণ অনেক দিন ঘুরিলেন, কিন্তু কন্যার পাত্রের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

শেষে এক ব্যক্তি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া "ঘর জামাই" হইয়া থাকিতে স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে যে বিষয়ে পারদর্শিতার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বর পাত্র "হাঁ" বই না বলেন না।

প্রশ্ন। বাবু, আপনি জমীদারী সেরেস্তার কাগজ পত্র বোঝেন।

উত্তর। আজ্ঞা হাঁ।

প্রশ্ন। আইন আদালত বোধ আছে?

উত্তর। আজ্ঞ হাঁ

প্রশ্ন। তেজারতী বোঝেন?

উত্তর। আজ্ঞা হাঁ।

ব্রাহ্মণ বড়ই সান্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন এতদিনে ভগবান

তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, আর বিলম্ব করা শ্রেয় নহে, যত শীঘ্র হয় কন্যাটী পাত্রস্থ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি দিন ক্ষণ দেখা যুত হউক না হউক কন্যাটী সম্প্রদান করিলেন।

বিবাহের পর কিছু দিন যায়, একবার একটা খাতকের নামে ব্রাহ্মণকে নালিস করিতে হইবে। এবার আর তদ্‌বিরকারক, আদালতের লোকের ততটা খোসামোদ করিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের নিবাস বর্দ্ধমানের সদর ষ্টেসন হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে। ব্রাহ্মণ অগ্রে, জামাতা পশ্চাৎ যাইতেছেন। কতক দূর গিয়া ব্রাহ্মণ একটু অধিক অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন, জামাতা অনেকটা দূরে আছেন, এমন সময় একজন লালপাগড়ীওলা, চৌগফ্‌ফা হিন্দুস্থানী বর্দ্ধমান হইতে জাহানাবাদের পথে আসিতেছে। সে ব্রাহ্মণকে বলিল "ও বাভন জাহানাবাদ কা সড়ক বাতাও।" ব্রাহ্মণ চীৎকার স্বরে জামাতাকে বলিলেন, "জামাই বাবু, এ কি বলে?"

জামাতা। আজ্ঞা—এ জলখাবার চায়।

ব্রাহ্মণ। জলখাবার ত সঙ্গে নাই।

জামাতা। দুই একটা পয়সা দিন।

ব্রাহ্মণ হিন্দুস্থানীকে দুইটী পয়সা দিলেন, তথাপি সে তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন ছাড়িল না। ব্রাহ্মণ পুনরপি জামাতাকে বলিল "বাবু, এ পয়সা পাইওয়া ক্ষান্ত নহে, করি কি?"

জামাই। ধুতি খানা কাচা খানা যা আছে দিন।

ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। কিন্তু তাহা পাইয়াও হিন্দুস্থানী

আপনার কথা ছাড়িতেছে না। ব্রাহ্মণ আবার জামাতার শরণ লইলেন। এবারে জামাতা বলিলেন "সঙ্গে যাহা আছে দিয়া চলিয়া আসুন, না হ'লে বেটা মেড়ুয়া ক্ষান্ত হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহাই করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। সে দিন আর বর্দ্ধমান যাওয়া হইল না, বাটী ফিরিলেন। বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইল। ব্রাহ্মণ আসিবামাত্র ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসিলেন "কই বর্দ্ধমান যাওয়া হ'লো না?" ব্রাহ্মণ তখন ভয়ে প্রায় খাবি খাইতেছিলেন, ইঙ্গিতে সহধর্ম্মিণীকে একটু পানীয় জল আনিতে ববিলেন। জলপানান্তর একটু সুস্থ হইলে যখন ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন "হয়েছে কি?" ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর করিলেন "ভাগ্যে জামাই খোট্টা বোঝে, না হলে আজ ঘোর বিপদ হয়েছিল।"

"ক" অক্ষর গোমাংস।

আষাড় মাস শেষ হইতে চলিল, বৃষ্টির কথায় কাজ কি, আকাশে মেঘবিন্দু নাই। ভারি গরম পড়িয়াছে, কৃষক "হাহা" করিতেছে, ক্ষেত্রে হাল চলিতেছে না, আগামী বৎসরের আশা ভরসায় ছাই পড়িল, কি হইবে, সকলেই মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে। গ্রামে গ্রামে বরুণ পূজা, যাগযজ্ঞ চলিতেছে, বৃষ্টি আর হয় না। একটি গ্রামে একদিন বৈকালে কতক গুলি লোক জুটিয়া পরামর্শ করিল আদি অক্ষর "ক" এরূপ একশত আট গ্রামের নাম লিখিয়া জলে ভাসাইলে বৃষ্টি হয়, তজ্জন্য তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে। একজন দোয়াত কলম লইয়া বসিয়া গেলেন। ঐরূপ গ্রামের নাম যাহার যা মনে আসিতেছে,

সেই তাহা বলিতেছে লেখক লিখিতেছেন। কেহ বলি- তেছেন,—

১। কৃষ্ণবাটী।

২। কালিকাপুর।

৩। কানাইবেড়।

৪। ক্যাঁচকাপুর।

এইরূপ বলা ও লেখা হইতেছে, এমন সময়ে একটী নিরক্ষর ভদ্র সন্তান বলিলেন "লেখ মালপাড়া।"

গল্প।

রাজা ও সন্ন্যাসী।

কোন সময়ে একটী সন্ন্যাসী তুরস্কদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পান্থনিবাস ভ্রমে এক রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া একটী বিস্তৃত হলে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রামজন্য আসন পাড়িয়া উপবেশন করিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর একজন রক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে তোমার দরকার কি?" সন্যাসী বলিলেন, অদ্য রাত্রে এই পান্থনিবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি। রক্ষী রাগান্বিত- ভাবে বলিল, "এ পান্থনিবাস নহে—রাজ বাড়ী।"

দৈবযোগে এই কথোপকথনের সময় রাজা সেই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর এই অসম্ভবনীয় ভ্রম দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে, তুমি

রাজবাটী এবং পান্থনিবাস এ দুইয়ের পার্থক্য স্থির করিতে পার না।

সন্ন্যাসী। মহাশয়, অনুমতি হইলে আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি। এবাড়ী যখন নির্ম্মিত হয় তখন কে ইহাতে বাস করিত?

রাজা। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ।

সন্ন্যাসী। তার পর কে?

রাজা। আমার পিতা।

সন্ন্যাসী। এখন কে বাস করিতেছে?

রাজা। আমি।

সন্ন্যাসী। আপনার পর কে বাস করিবে?

রাজা। আমার পুত্র।

সন্ন্যাসী। মহাশয়, যে বাড়ীর অধিবাসী এত পরিবর্ত্তনশীল তাহা পান্থনিবাস ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

মামুদ ও মন্ত্রী।

সুলতান মামুদ অজস্র নরহত্যা, দেশদগ্ধ প্রভৃতি অত্যাচারে পারস্য রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাশূন্য করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা আমরা জানিনা, কিন্তু এইরূপ প্রবাদ যে, এই মহাত্মার সচীব দৈববলে পক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। রাজ্য মধ্যে মন্ত্রিবরের এতাধিক খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল যে, শুনিতে পাওয়া যায় পক্ষীগণ মুখ ব্যাদান করিবা মাত্র তিনি তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন। মন্ত্রী মহাশয় একদিন সন্ধ্যাকালে সম্রাটের সমভিব্যাহারে মৃগয়া শেষে প্রত্যাগমন

করিতেছেন, এমন সময়ে সম্রাট্ অদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষশাখে দুইটি পেচককে মস্তক সঞ্চালন ও নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখিয়া মন্ত্রীকে তাহাদিগের কথোপকথনের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের কথোপকথন শুনিবার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান থাকিলেন, এবং সম্রাটের নিকট আসিয়া বিনীত বচনে কহিলেন "মহাত্মন! অধীন আমি পেচকদ্বয়ের পরস্পর কথোপকথন শ্রবন করিয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট ব্যক্ত করিতে কোন মতেই সাহসী হইতেছিনা।" সম্রাট বাদসাহ এইরূপ প্রত্যুত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া মন্ত্রীকে অভয়দান করিলেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে মন্ত্রী কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! পেচকদ্বয়ের মধ্যে একের কন্যার সহিত অপরের পুত্রের শুভ সম্বন্ধের প্রস্তাব হইতেছিল। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে বলিতেছিল যে, 'তোমার জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ পঞ্চাশৎ পল্লীর ধ্বংশাবশেষ প্রদান করিতে হইবে, নতুবা আমি এ বিবাহে সম্মতি দিব না।' মহারাজ! কন্যাকর্ত্তা তাহার প্রত্যুত্তরে আপনাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিল—ভ্রাতঃ, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের বাদসাহ সুলতান মামুদকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন; তাঁহার রাজত্বে বাস করিয়া আমাদের উৎসন্ন পল্লীর অভাব হইবে না।"

পরিশিষ্ট।

পানীয় জল বিশুদ্ধ করিবার উপায়।

উপর্য্যুপরি চারিটী কলসী একটী বাঁশের বা কাঠের ফ্রেমের উপর যথাক্রমে স্থাপিত করিতে হয়। প্রথমতঃ জল ফুটাইয়া উপরের কলসীতে ঢালিবে। উহার নীচে যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া জল দ্বিতীয় কলসীতে পড়িবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলসী অঙ্গারচূর্ণ ও বালুকাতে পূর্ণ করিয়া উহাদের তলায় ছিদ্র রাখিবে। সকলের নীচের কলসীর মুখে মোটা কাপড়ের আবরণ রাখিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলসী দিয়া গমনকালে জলের দূষিত অংশ অঙ্গার ও বালুকাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্থ কলসীতে যে জল সঞ্চিত হয় তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ।

কূপের জল বিশুদ্ধ করিবার উপয়।

নানা কারণে কূপের জল দূষিত হয়, তাহা বিশুদ্ধ করা অতীব আবশ্যক। দূষিত জল নানা উৎকট পীড়ার কারণ। কূপের দূষিত জল বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাতে চূণ নিক্ষেপ করিবে।

উত্তম গুড়াকু তামাক প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

খুবকড়া তামাকুকে কুটিয়া মর্ত্তমান কলা, আনারস, পেয়ারা, কুল, কাঁঠাল প্রত্যেকটী তামাকের সমান ভাগে, বা যত তামাক ঐ সকল দ্রব্য সমান ভাগে তত একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী

কলসীর মধ্যে জলসিক্ত স্থানে অন্যূন ২১ দিন প্রোথিত করিয়া রাখিলে ঐ তামাক কাদা অপেক্ষাও তরলাকার ধারণ করে, উহাকে খাম্বিরা কহে। তাহার পর মাঝারী গোচের অর্থাৎ খুব চড়াও নয় আর নিতান্ত নরমও নয় এরূপ তামাক গুড় মাখিয়া ঢেঁকিতে কুটিতে হইবে। এই কোটা তামাকের এক সেরের সহিত পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধপোয়া খাম্বিরা তামাক মিশ্রিত করিয়া পচাপাতা ১ তোলা, দনা ।০ আনা, শৈলজ ।০ আনা, জম্বরু ।০ আনা, জটামাংসী ।০ আনা, শ্বেত চন্দন ।০ আনা উত্তম রূপ চূর্ণ করিয়া একটু শীলা রসের সহিত মাখিয়া সমস্ত একত্রে মর্দ্দন করিলে দিব্য তামাক প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ গন্ধ দ্রব্যের সহিত সামান্য আতর দেন, কিন্তু তাহাতে স্বাদের কিছু মাত্র উৎকর্ষ হয় না কেবল গন্ধ বৃদ্ধি হয়।

কেয়াখয়ের প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

উত্তম পাপড়ি খয়ের ১সেরকে চূর্ণ করিয়া তাহার সঙ্গে যে অপর জিনিষ যথা,—খয়ের কাট, তাহার পাতা ইত্যাদি মিশান থাকে, তাহা বাছিয়া লইয়া জলে ভিজাইতে ও তাহার সহিত ধনের চাউল ১ছটাক, মহুরী ১ছটাক, যমানী ১ছটাক, দারুচিনির কুচা ১ ছটাক, লবঙ্গ কুচা ১ ছটাক, বড় এলাইচের দানা ১ ছটাক, ছোট এলাইচের দানা ১ তোলা মাখিয়া বাতি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর এক একটী মোটা বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দুইটী করিয়া কেয়াফুলের পাতা জড়াইয়া যত দিন না ঐ খয়ের শুকাইয়া কঠিন হয়, তত দিন রাখিতে হইবে। শেষে কেয়াফুলের পাতাও শুকাইয়া খয়েরের

সহিত মিশিয়া যাইবে। তাহা হইলেই উত্তম কেয়াখয়ের প্রস্তুত হইল।

পাঁওরুটী প্রস্তুতের নিয়ম।

উত্তম সুজিকে তাল অথবা খেজুরের তাড়ির সহিত মর্দ্দন করিয়া যতক্ষণ উহা জলে ফেলিয়া দিলে না ভাসে ততক্ষণ ঠাসিতে হইবে। তাহার পরে ঐ সুজিতে ছোট ছোট লেট্টী কাটিয়া কয়লার আগুনে এক খানি তাওয়া বসাইয়া তাহার উপর কলার পাতা গোলাকারে কাটিবে, এবং ঐ পাতা তাওয়ার উপর দিয়া তাহাদের উপর এক একটী লেট্টী রাখিয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে ফুলিয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পাঁওরুটী প্রস্তুত হইল।

ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে কি কি দ্রব্য প্রসিদ্ধ।

ঢাকা—সূচীকার্য্যের সুন্দর কাপড় ও সোনারূপার অলঙ্কারের জন্য; কলিকাতার সিমলা ও ফরাসডাঙ্গা—উৎকৃষ্ট ধুতি ও সাড়ি; বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের—মিঠাই; মানকরে—কদ্‌মা; হুগলী ধন্যা-খালী—খেজুর, মৎস্য ধরিবার বঁড়ষী ও রেশমী ধুপছায়া কাপড়ের ন্যায় সূতার ধুপছায়া কাপড়; বর্দ্ধমানে—সীতাভোগ; হুগলী, খানাকুল কৃষ্ণনগরের—গাড়ু; হুগলী, কুমারগঞ্জে—উত্তম পিতলের বাসন; মুর্শিদাবাদ, বালুচরে—সুন্দর পট্টবস্ত্র; বাঁকুড়া, ইন্দাসে—খাজা; নদীয়া কৃষ্ণনগরে—পুত্তলিকা ও সর ভাজা; হুগলী জনাইয়ে—রসকরা; কলিকাতা, বাগবাজারে—রসগোল্লা; মেদিনীপুর চন্দ্রকোনায়—কাপড়; হুগলী কামারপুকুরে—হুকাঁর নলিচা; মানভুম, গোবিন্দপুরে—তসর কাপড়; উড়িষ্যা, কটকে—সোনারূপার তারে প্রস্তুত মাথার ফুল কাঁটা ইত্যাদি ও জাঁতি

হুগলী খুসীগঞ্জে—উৎকৃষ্ট মুয়া; বারানসীতে—সোনালী কাজ করা সাড়ী ও শাল; ভাগলপুরে—খেশ; উত্তরপশ্চিমের মুরাদাবাদে—কলাইকরা পান ভোজন পাত্র, ফরসী ইত্যাদি; লক্ষ্ণৌতে—আলবালার নল; হুগলী, খল্‌সিনীতে তবলা; মুর্শিদাবাদ, খাগড়ার—সুন্দর কাঁশার পান ও ভোজন পাত্র, পানের ডিবা ইত্যাদি; জব্বলপুর ও বান্দায়—আংটী ও লকেটে বসাইবার উপযুক্ত উত্তম র‍্যাগাট প্রস্তর। বুন্দেলখণ্ড পান্নায় —হীরক ও পান্না নামে সবুজ প্রস্তর; পঞ্জাব, অমৃতসহরে—সুন্দর শাল রুমাল ও জামিয়ার প্রভৃতি পশমী কাপড়; আসাম, গৌহাটীতে—উত্তম মুগা বস্ত্র; কাশ্মীর শ্রীনগরে—পৃথিবীর উৎকৃষ্ট শাল রুমাল প্রভৃতি পশমী কাপড়; পঞ্জাবের রামপুরে—শীতকালে ব্যবহার্য্য সুন্দর পশমী চাদর। গোলকুণ্ডায়—হীরা; বোম্বাই—সোনারূপার অলঙ্কার; উঃ পঃ কানপুরে—জুতা, ঘোড়ার জিন, পোর্টমেণ্টো প্রভৃতি চামড়ার জিনিষ; চুনারে—সুন্দর মাটীর বাসন, জলের কুঁজা, মাটির পুত্তলিকা, ব্র্যাকেট প্রভৃতি; বীরভূম সিউড়ীতে—নানাপ্রকার ফলের ও শতমুলীর মোরব্বা; দাশপুরে—জুতা, ঘোড়ার জীন প্রভৃতি; ময়মনসিংহ রামগোপালপুরে—কাগজের কুমড়া, আঁব প্রভৃতি ফল, নানাবিধ পশু, পক্ষী, বাক্স, ঢোলক, তানপূরা প্রভৃতি অতি চমৎকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইষ্টক প্রস্তুতের নিয়ম।

ইট প্রস্তুত করিতে হইলে উত্তম দেখিয়া স্থান পছন্দ করিতে

হইবে। সেখানকার মাটী দোয়াঁস হওয়া চাই। সেই মাটীকে উত্তমরূপে পাইট করিয়া যখন তাহাতে গুটীলা বা কোন উদ্ভিদের শিকড় প্রভৃতি কিছুই থাকিবেনা, তখন কতক গুলি বালি লইয়া ফর্ম্মায় মাখাইবে এবং যেখানে ইট ফেলিবে তাহার নিচে কতক বালি রাখিয়া ফর্ম্মায় কাদা দিয়া ফর্ম্মাটী উঠাইয়া লইলেই উত্তম ইট প্রস্তুত হইবে।

ইট গুলিকে উত্তমরূপে শুকাইয়া পাঁজা সাজাইবে। পাঁজা নানা প্রকারে সাজাইতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত পদ্ধতিটী সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য লিখিত হইল।

পাঁজা চারিদিকে ১০ হাত, দীর্ঘে ১২ হাত বা প্রস্থে ৮ হাত করা যাইতে পারে। সর্ব্বাগ্রে আধ পোড়ান বা সম্পূর্ণরূপে পোড়া ইটে তলা প্রস্তুত করিতে হয়। তলা প্রস্তুত করিবার সময় দুইখানি ইট দণ্ডায়মান রাখিয়া তাহার উপর এক খানি ইট পাতিয়া বরাবর এই রূপে সারি দিয়া ইট সাজাইতে হইবে। এইরূপ ইট সাজান হইলে তাহাতে একথাক কাট সাজাইয়া তাহার উপর এক থাক ইট সাজাইবে। এইরূপে তিন থাক ইট সাজাইয়া এক থাক কয়লা দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাঁজা শেষ না হয়, ততক্ষণ এইরূপে সাজাইতে থাকিবে। পাঁজা সাজান হইলে পাঁজার নীচে যে ছোট ছোট ঘর গুলি হইয়াছে, তাহাতে আগুণ লাগাইবে যত দিন পর্য্যন্ত না অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় ততদিন পুড়িবে।

সাধারণতঃ এক লক্ষ ইট পোড়াইতে তিন শত মণ কয়লা ও এক শত মণ কাট দেওয়া গিয়া থাকে।

গাথনির মসলা ও প্রণালী।

উত্তমরূপে বনিয়াদ খুলিয়া উত্তম রূপে দুরমুস করিতে হইবে। যদি সেস্থানটী সেতাঁ হয়, তবে এক কোমর অন্দাজ াত করিয়া মেজে প্রস্তুত করিবে। সর্ব্বাগ্রে তাহার একহাত ান্দাজ বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার পর কোক য়লা দিয়া এক থাক খোওয়া দিবে। খোওয়া চাপাইয়া দুর-্স করিতে হইবে। এইরূপ করিয়া যদি মেজে প্রস্তুত করা ায়, তাহা হইলে ঘরের মেজে বড় শুষ্ক ও মজপুত হয়।

সাধারণতঃ সুরকির ৫ ভাগের এক ভাগ চূণ মিশাইয়া ইট াথিলে গাঁথনী বড় মজপুত হয়। খিলান গাঁথিতে হইলে রেকীর ৪ ভাগের এক ভাগ চুণ দিতে হয়।

কেহ কেহ তাহার সহিত অল্প পরিমাণে চিটা গুড় এবং য়েরের জলও দিয়া থাকেন। ঘরের ছাতে বা যেখানে র্ব্বদা জল পড়ে সেখানে সুরকির ৪ ভাগের এক ভাগ চুণ দিয়া াথিলে বড় শক্ত গাঁথুনি হয়।

ঘরের ছাদ প্রস্তুত করিতে হইলে বরগা ও কড়ির উপর দুই খানি করিয়া টালি পাতিবে, তাহার উপর ৪ ইঞ্চি আন্দাজ পুরু হইতে পারে এরূপ খোওয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য অন্তত দ্বিগুণ উচ্চ খোয়া অর্থাৎ ৮ ইঞ্চ পরিমাণে দেওয়া চাই, তাহা না হইলে পিটিবার পর ৪ ইঞ্চ পুরু ছাদ কোন মতেই হইবে না। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, খোয়া দিবার সময় গোলা চুণে খোওয়া গুলি উত্তমরূপে ভিজাইয়া দিবে। তাহার পর গুঁড়া চুণ ছাড়াইয়া যখন দেখিবে যে, খোয়ার উপর

সাদাবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তখন পিটিতে আরম্ভ করিবে। পিটিবার সময় মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইতে হইবে। পিটিতে পিটিতে যখন ছাদের গম্ভীর শব্দ ঘুচিয়া ঠন্ ঠনে শব্দ হইবে, তখন জানিবে ছাদ পেটা হইল। তাহার উপর সুরকি ও চুণ দিয়া মাজিয়া দিতে হইবে। যতদিন না শুষ্ক হয়, তত দিন ছাদে কিছু ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে।

ছাদের খোয়া মাখিবার সময় কেহ কেহ তাহার সঙ্গে মাস কলাহির জল, চিটা গুড় এবং খয়ের জল দিয়া থাকে। ইহাতে ছাদ বড় জমাট ও শক্ত হয়।

সাবান প্রস্তুতের নিয়ম।

সাজিমাটী, নারিকেল তৈল সমান ভাগে এবং কলিচূণ অর্দ্ধেক একত্র করিয়া জলে গুলিতে হইবে। সেই গোলা আগুণে চড়াইলে ফুটিতে ফুটিতে যখন গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ছাঁচে ঢালিলে সাবান প্রস্তুত হইবে।

বিলাতি সাবান।

গ্লিসারিন্ ১ পাউণ্ড, সাজিমাটী ১ আউন্স, লার্ড (বসা) ১ড্রাম, অটডি রোজ ১০ ফোঁটা, সফেদা ১ আউন্স। সর্ব্বাগ্রে সাজিমাটীকে গুঁড়া করিয়া জলে ফেলিয়া রিফাইন করিতে হইবে। তাহা গ্লিসারিনের সহিত আগুণে চাপাইয়া যখন উভয়ে উত্তম রূপে মিশ্রিত হইবে, তখন তাহাতে লার্ড ও সফেদা দিয়া নামাইয়া নাড়িতে থাকিবে। গরম থাকিতে

থাকিতে তাহাতে অটডিরোজ দিয়া ঢালিলেই গোলাপী সাবান প্রস্তুত হইল।

পমেটম্ প্রস্তুত প্রণালী।

ছাঁকা নারিকেল তৈল ১ পোয়া, মোম ১ ছটাক একত্র গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে দারুচিনির আরক ১০ ফোঁটা ও লেবুর আরক ১ ড্রাম তাহার সহিত মিশাইবে। তাহার পর ঢাকা দিয়া ২৪ ঘণ্টা পরে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ।

